শ্রীশ্রীমায়ের কথা

দ্বিতীয় ভাগ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক

স্বামী আত্মবোধানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন,

বাগবাজার, কলিকাতা

মুদ্রাকর

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে

এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স লিমিটেড,

২০এ, গৌরলাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

চতুর্থ সংস্করণ

১৩৬০

তিন টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীমার ইচ্ছায় তাঁহার অমৃতময়ী কথার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগের ন্যায় ইহারও অধিকাংশ উপকরণ তাঁহার সন্ন্যাসী ও গৃহী সন্তানগণের দিনলিপি হইতে সংগৃহীত। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পাঠক ইহাতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মায়ের দিব্যলীলার অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। প্রথম ভাগের ন্যায় এই দ্বিতীয় ভাগখানিও স্বামী অরূপানন্দের সাধু সঙ্কল্প ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীমার সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তকখানিকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছে। এজন্য সমগ্র ভক্ত-সমাজ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবর্ষীয় মহোৎসবের পূর্ণাহুতিস্বরূপ এই গ্রন্থ সকল মুমুক্ষু নরনারীর পরম কল্যাণ সাধন করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব সংস্করণে যাঁহাদের বিবরণ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইয়াছিল, অনিবার্য কারণে তখন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমান সংস্করণে অধিকাংশ বিবরণের নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল।

'উদ্বোধন' ৫৪ম বর্ষের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায় লিখিত 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' এই সংস্করণে সংযোজিত হইল।

গুরু-পূর্ণিমা
১৩৬০

প্রকাশক

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী

শ্রীশ্রীমা বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম শ্যামা দেবী। মা তাঁহার জন্ম-কথা এইরূপ বলিয়াছেন, "আমার জন্মও ত ঐ রকমের (ঠাকুরের মত)। আমার মা শিওড়ে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় হঠাৎ শৌচে যাবার ইচ্ছে হওয়ায় দেবালয়ের কাছে এক গাছতলায় যান। শৌচের কিছুই হল না, কিন্তু বোধ করলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদরমধ্যে ঢোকায়, উদর ভয়ানক ভারী হয়ে উঠল। বসেই আছেন। তখন মা দেখেন যে লাল চেলী পরা একটি পাঁচ ছ বছরের অতি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার ঘরে এলাম মা।' তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। সেই মেয়েই মায়ের উদরে প্রবেশ করে; তা থেকেই আমার জন্ম। বাড়ীতে ফিরে এসে মা এই ঘটনাটি বলেছিলেন।"

মায়ের পিতা তখন কার্য্যোপলক্ষ্যে কলিকাতা গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই সকল কথা শুনিলেন। তদবধি মা ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আর স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। শুনিয়াছি, মাকে তাঁহার পিতা দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। মায়ের মা

একবার যোগেন মাকে বলিয়াছিলেন, "গর্ভাবস্থায় আমার এই রূপ! মাথায় চুল আর ধরে না। সেবার সাধে কত লোক যে কাপ দিয়েছিল তার আর অবধি নেই।"

মায়ের জন্মস্থান এখন যেখানে মন্দির হইয়াছে সেইখানে ছিল। বসত ঘরখানি উত্তরের জমিতে ছিল। পূর্ব্বদিকের জমিতে একখানি দোচালা ঘর ছিল। মধ্যে দেওয়াল, বহির্ভাগ সদর এবং ভিতরের ভাগ অন্দর। দক্ষিণের জমিতে রান্নাঘর, ঢেঁকিশাল প্রভৃতি ছিল। মা বলিয়াছিলেন, "পুরান (জন্মস্থানের) বাড়ীতে বিয়ে হয়। আমার ন বছর বয়সের সময় নূতন বাড়ীতে (এখন যেটি বরদা মামার বাড়ী) আসি। ও বাড়ীতে আর ধরে না।"

মায়ের পিতা দরিদ্র হইলেও অতি নিষ্ঠাবান এবং মাতা বিশেষ ভক্তিমতী ও কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। মা শৈশবে দরিদ্রের সন্তানের মতই লালিত পালিত হইয়াছিলেন। রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে তিনি নিজ মাতাকে সহায়তা করিতেন। আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলায় গলা সমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছি। ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতুম। এক বছর পঙ্গপালে সব ধান কেটেছিল; ক্ষেতে ক্ষেতে সেই ধান কুড়িয়েছি।"

বাল্যকালে ছোট ভাইদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই মায়ের প্রধান কাজ ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাইদের নিয়ে গঙ্গায় নাইতে যেতুম। আমোদের নদীই ছিল যেন আমাদের গঙ্গা। গঙ্গাস্নান করে সেখানে বসে মুড়ি খেয়ে আবার ওদের নিয়ে বাড়ী আসতুম। আমার বরাবরই একটু গঙ্গাবাই ছিল।"

ছোট ভাইদের সঙ্গে মা কখনও কখনও পাঠশালায় যাইতেন। তাহার ফলে তখন অতি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। অবশ্য

পরে তিনি বেশ পড়িবার অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং বাংলা রামায়ণাদি পড়িতেন। কিন্তু পত্রাদি লিখিতে তাঁহাকে কখনও দেখা যাইত না।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মায়ের বিবাহ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার সাত বছর বয়সের সময় ঠাকুর জয়রামবাটী এসেছিলেন। বিয়ের পর জোড়ে যায় না? তখন আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ক বছরে বিয়ে হয়েছে, তখন পাঁচ বছর বলো, সাত বছর বলো না'।" জোড়ে যাওয়াকেই মা পাছে বিবাহ মনে করেন, এই জন্য ঠাকুর ঐ কথা বলিয়া থাকিবেন।

বিবাহের সময় সম্বন্ধে মা বলিতেন, "খেজুরের দিনে আমার বিয়ে হয়, মাস মনে নেই। দশ দিনের মধ্যে যখন কামারপুকুর গেলুম তখন সেখানে খেজুর কুড়িয়েছি। ধর্ম্মদাস লাহা এসে বললে, 'এই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে?' সুধ্যুর (জ্ঞাতিভাই) বাপ কোলে করে আমাকে কামারপুকুর নিয়ে গিয়েছিল।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের জয়রামবাটি যাওয়া সম্বন্ধে মায়ের এইটুকুই মনে ছিল যে, ভাগিনেয় হৃদয় কতকগুলি পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইলেও তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল।

মায়ের সাত বৎসর বয়সেই ঠাকুর দ্বিতীয়বার জয়রামবাটি যান। তখন কেহ না বলিয়া দিলেও মা ঠাকুরের পা ধুইয়া দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া অন্যান্য সকলে হাসিয়াছিল।

মায়ের ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী রাজ মুখুয্যের ভগিনী অঘোরমণি বলেন, "মা খুব সাদাসিদে ছিলেন। তাঁতে সরলতা যেন

মূর্ত্তিমতী ছিল। খেলায় তাঁর সঙ্গে কখনও কারও ঝগড়া হয়নি। মা প্রায়ই কর্ত্তা বা গিন্নী সাজতেন। পুতুল গড়ে খেলা করতেন বটে, কিন্তু কালী ও লক্ষ্মী গড়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করতে ভালবাসতেন। অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া হলে মা এসে মিটিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে ভাব করিয়ে দিতেন।"

অঘোরমণি বলিয়াছিলেন, "একবার জগদ্ধাত্রী পূজোর সময় হলদেপুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল উপস্থিত ছিলেন। মাকে জগদ্ধাত্রীর সামনে ধ্যান করতে দেখে তিনি অবাক হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন; কিন্তু কে জগদ্ধাত্রী, কে মা, কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। তখন ভয়ে পালিয়ে গেলেন।"

মায়ের এগার বৎসর বয়সের সময়, ১২৭১ সালে, ওদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। মায়ের পিতার কিছু ধান্য সঞ্চিত ছিল। গরীব ব্রাহ্মণ, নিজের পোষ্যবর্গ কি খাইবে সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। কড়াইয়ের ডালের খিচুড়ি হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন করাইয়া কয়েকটি ডাবায় ঢালিয়া রাখিতেন। গরম খিচুড়ি খাইতে লোকের কষ্ট হইত বলিয়া মা দুই হাতে পাখার বাতাস করিয়া তাহা ঠাণ্ডা করিয়া দিতেন। ক্ষুধার্ত্ত লোকদের দুর্দ্দশা মা এইরূপে বর্ণনা করিতেন, "আহা, এই খিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্য বসে আছে। একদিন একটি বাগ্‌দী না ডোমের মেয়ে এসেছে। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে গেছে তেলের অভাবে, চোখ উন্মাদের মত। ছুটে এসে গরুর ডাবায় যে কুঁড়ো ভেজান ছিল তাই খেতে আরম্ভ করেছে। এত যে সকলে ডাকছে, 'বাড়ীর ভিতরে এসে খিচুড়ি খা'—তা আর ধৈর্য্য মানছে না। খানিকটা কুঁড়ো খেয়ে তবে কথা তার কানে গেল। এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

সেই বছর দুঃখ পেয়ে তবে লোকে ধান মরাইয়ে রাখতে আরম্ভ করলে।”

তের বৎসর বয়সের সময় মা মাসখানেকের জন্য কামারপুকুর যান। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে। পাঁচ ছয় মাস পরে পুনরায় কামারপুকুরে গিয়া প্রায় দেড় মাস থাকেন। তখনও ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। তারপর ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে লইয়া কামারপুকুর যান এবং শ্রীশ্রীমাকে তথায় আনাইয়া লন। সেবার মা কামারপুকুরে মাস তিনেক ছিলেন।

এই সময়ে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঠাকুর মাকে নানা-প্রকার শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলে মাও জয়রামবাটী ফিরিয়া যান। কিন্তু এই সামান্য তিন মাসের ব্যবহারেই মায়ের মনে ঠাকুরের মহৎ জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছিল।

তারপর মা সর্ব্বদা লোকের মুখে শুনিতে লাগিলেন যে ঠাকুর পাগল হইয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ের সত্যাসত্যতা নির্ণয়ের জন্য তিনি নিজে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। ইহার সাত আট মাস পূর্ব্বে মথুর বাবু দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর মাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজ জননীর সঙ্গে নহবতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করেন। সেই অবধি ঠাকুরের শেষ অসুখের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ পর্য্যন্ত মা প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। নহবতের নীচের তলায় অতি ক্ষুদ্র ঘর খানিতে বহু কষ্টে বাস করায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার অসুখ হইত এবং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দেশে যাইতে হইত। তখন পল্লীগ্রামে চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। কঠিন অসুখ হইলে লোকে দেবস্থানে হত্যা দিত ও মানত করিত। মাও একবার

সিংহবাহিনীর মন্দিরে হত্যা দিয়া কঠিন রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মায়ের এই বিষম শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে ঠাকুর উদাসীন ছিলেন না। অসুখ হইলে চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত ত করিতেনই, এতদ্ভিন্ন তাঁহার শরীর যাহাতে ভাল থাকে তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিতেন। মা বলিয়াছিলেন, "তিনি বলতেন, 'বুনো পাখী খাঁচায় রাত দিন থাকলে বেতে যায়; মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।' দুপুরে কালীবাড়ীর সকলে খাওয়া দাওয়ার পর যখন বিশ্রাম করত, সেই সময় ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে গিয়ে দেখে আসতেন কোন লোকজন আছে কিনা। যদি দেখতেন কোন লোকজন নেই, তখন বলেতেন, 'এই সময় যাও, কেউ নেই।' তিনি ঘরের কাছে একটু দাঁড়াতেন, আমি খিড়কি ফটক দিয়ে রামলালের বাড়ীর দিকে পাঁড়ে গিন্নীদের ওখানে বেড়াতে যেতুম। সমস্ত দিন কথাবার্ত্তা কয়ে, সন্ধ্যার পর যখন আরতি হত, আর সব লোক আরতি-টারতি দেখতে যেত, আমি সেই সময় আসতুম।" গৌর মা বলেন, "এই যে দু জনের মাত্র পনর বিশ হাত দূরে থেকেও, কখনও কখনও ছ মাসেও হয়ত একদিন দেখা নেই, তবু দু জনে ভাবই ছিল কত! দেখেছি, একদিন মায়ের মাথা ধরেছে, ঠাকুর তাই শুনে মহা ব্যস্ত হয়ে বার বার রামলাল দাদাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ওরে রামলাল, মাথা ধরল কেন রে?' আবার একাকী থাকার অবসাদ নিবারণের জন্য যাহাতে মন্দ লোকের সঙ্গে মা না মিশেন, সে বিষয়ে ঠাকুর তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতেন।"

মেয়েরা অলঙ্কার পরিতে ভালবাসেন। এই বিষয়েও মায়ের মনে যাহাতে কোন দুঃখ না থাকে সেইজন্য ঠাকুর হৃদয়কে

দিয়া অলঙ্কার গড়াইয়া মাকে দিয়াছিলেন। মা বলিতেন, "তখন তাঁর অসুখ, তবুও আমার জন্য অত টাকা দিয়ে তাবিজ গড়িয়ে দেওয়ালেন। ঠাট্টা করে বলতেন, 'ওরে, আমার সঙ্গে ওর এই সম্বন্ধ।' এদিকে নিজে ত টাকা ছুঁতে পারতেন না। পঞ্চবটীতে সীতাকে দেখেছিলেন—হাতে ডায়মনকাটা বালা। সীতার সেই বালা দৃষ্টে আমাকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

নহবতে থাকিতে মায়ের বড় কষ্ট হয় জানিয়া শম্ভু বাবু দক্ষিণেশ্বর গ্রামে মায়ের জন্য একখানি কুটির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এখন যেখানে ৺রামলাল দাদার বাড়ী আছে তাহারই পাশের জমিতে মায়ের ঘর ছিল। ঠাকুরের কঠিন আমাশয় হওয়ায় তাঁহার সেবার জন্য মাকে পুনরায় নহবতে আসিয়া থাকিতে হয় এবং কিছুদিন পরে তাঁহার নিজের ঐ অসুখ হয়। রোগ কিছুতেই না সারায়, মা পিত্রালয়ে যান। সেখানেও তাঁহাকে দীর্ঘকাল ভুগিতে হইয়াছিল। সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে হৃদয়ের অসদ্ব্যবহারে, যেদিন আসিয়াছিলেন সেইদিনই তিনি দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। ইহার এক বৎসর পরে, ঠাকুরের খাওয়া দাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে জানিয়া, মা পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তখন হৃদয় নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

১২৯২-৯৩ সালে ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় মা প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু মা ও ভক্তগণের শত চেষ্টা সত্ত্বেও রোগের হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় এবং ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার রাত্রি প্রায় একটার সময় ঠাকুর হঠাৎ মহাসমাধিমগ্ন হন। পরদিন সন্ধ্যায় দেহসৎকারের পর শ্রীশ্রীমা যখন অন্যান্য অলঙ্কার খুলিয়া সর্ব্বশেষে হাতের সোনার বালা খুলিতেছেন, তখন

ঠাকুর তাঁহাকে দেখা দিয়া নিষেধ করেন। বলরাম বাবু মার জন্য সাদা কাপড় আনিয়াছেন। উহা মাকে দিবার জন্য গোলাপ মাকে বলায় তিনি বলিলেন, "বাপরে, এ সাদা থান কাপড় কে তাঁর হাতে দিতে যাবে!" এদিকে গোলাপ মা আসিয়া দেখেন, মা নিজের কাপড়গুলির পাড় ছিঁড়িয়া সরু করিয়া লইয়াছেন। সেই অবধি মা খুব সরু লালপেড়ে কাপড়ই পরিতেন। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে ঠাকুরের অস্থির কলসের সম্মুখে ভোগ নিবেদন করা হয়। ৬ই ভাদ্র বৈকালে মাকে বলরাম বাবুর বাড়ীতে আনয়ন করা হয়। সঙ্গে লক্ষ্মীদিদি। ঠাকুরের অস্থি লইয়া ভক্তগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় ত্যাগী শিষ্যগণ কলস হইতে অস্থিগুলি বাছিয়া লইয়া একটি কৌটায় রাখিয়া দিয়াছিলেন। ঐ কৌটাও শ্রীশ্রীমার সঙ্গে আনা হইল। ঠাকুরের অস্থি লইয়া বিরোধের কথা শুনিয়া মা গোলাপ মাকে বলিয়াছিলেন, "এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন; দেখেছ, গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে!" ১৫ই ভাদ্র সন্ধ্যায় মা বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। সঙ্গে গোলাপ মা, লক্ষ্মীদিদি, মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী, এবং পূজনীয় যোগীন মহারাজ, কালী মহারাজ ও লাটু মহারাজ ছিলেন।

বৃন্দাবন যাইবার পথে মা কাশীতে তিন দিন অবস্থান করেন। বৃন্দাবনে তিনি এক বৎসর কাল ছিলেন। মধ্যে একবার লক্ষ্মীদিদি, যোগেন মা ও শ্রীযুক্ত যোগানন্দ স্বামীর সহিত মা হরিদ্বার গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে ঠাকুরের নখ ও কেশ দেন এবং জয়পুর হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। তথায় কালা বাবুর কুঞ্জে থাকিতেন। বৃন্দাবনে মা, যোগেন মা প্রভৃতি ঠাকুরের অদর্শনে খুব কাঁদিতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া বলেন, "তোমরা অত কাঁদছ কেন? গেছি আর কোথায়? এই এঘর আর ওঘর।"

বৃন্দাবনে অনেক সময় শ্রীশ্রীমায়ের দেহে ঠাকুরের আবেশ হইত। কখনও বা তিনি ভাবাবেশ একাকী চড়া অতিক্রম করিয়া যমুনায় চলিয়া যাইতেন। সঙ্গীরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেন।

বৃন্দাবনে এক বৎসর বাসের পর মা কলিকাতায় আসেন এবং কয়েকদিন বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া কামারপুকুর যান। সেখানেও তিনি প্রায়ই ঠাকুরের দেখা পাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কামারপুকুরে থাকবে। শাক বুনবে; শাক ভাত খাবে, আর হরিনাম করবে।" মাকে এই সময় সেই ভাবেই জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। অনেক সময়ে বাড়ীতে অপর কেহ থাকিত না। এমন দিনও গিয়াছে যে, শুধু দুটি ভাত সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু লবণ আর জোটে নাই। শ্রীযুত যোগীন মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি যাঁহারা পরে মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা তখন ঠাকুরের অদর্শনে তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় তীর্থাদি ভ্রমন করিতেছেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলিতেন, "আমাদের এ ধারণাই তখন ছিল না যে, মার নুনটুকুও জোটেনি।" কামারপুকুরে প্রায় এক বৎসর থাকিবার পর মাকে ভক্তেরা বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রায় ছয় মাস কাল আনিয়া রাখেন (১৮৮৮ খৃঃ)। পরে কার্তিক মাসে সে বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় বলরাম বাবুর বাড়ীতে দুই একদিন থাকিয়া মা পুরী যাত্রা করেন। তখনও রেল হয় নাই। কাযেই চাঁদবালী পর্য্যন্ত জাহাজে,* তথা হইতে কটক পর্য্যন্ত ষ্টীমারে এবং অবশিষ্ট পথ গোযানে যাইতে হইয়াছিল। পুরীতে মা বলরাম বাবুদের "ক্ষেত্রবাসীর"

* আগের জাহাজখানি সাত শত যাত্রী সহ ডুবিয়া গিয়াছিল।

বাড়ীতে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ছিলেন। বলরাম বাবুদের পুরীতে বিশেষ নাম আছে। সেজন্য পাণ্ডা গোবিন্দ শিঙ্গারী শ্রীশ্রীমাকে পাল্কী করিয়া জগন্নাথ দর্শনে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, "না, গোবিন্দ, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলবে, আমি দীন হীন কাঙ্গালিনীর মত তোমার পেছনে পেছনে জগন্নাথ দর্শনে যাব।"

পুরী হইতে ফিরিয়া মা কলিকাতায় মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে তিন চারি সপ্তাহ থাকিয়া আঁটপুর ও তথা হইতে তারকেশ্বর হইয়া কামারপুকুর যান। তথায় প্রায় এক বৎসর থাকিয়া মা দোলের পূর্ব্বে কলিকাতা আসেন ও মাষ্টার মহাশয়ের কম্বুলিয়াটোলার বাড়ীতে মাসখানেক থাকেন। তারপর বলরাম বাবুর শেষ অসুখের সময় তাঁহার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত মা বলরাম বাবুর বাড়ীতেই ছিলেন। পরে বেলুড়ে শ্মশানের নিকট ঘুসুড়ীর বাড়ীতে জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত (১৮৯০ খৃঃ) ছিলেন। সেখানে রক্তামাশয় হওয়ায় বরাহনগরে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া চিকিৎসা করান হয়। তারপর তিনি বলরাম বাবুর বাড়ী আসেন এবং দুর্গাপূজার পর কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যান। পর বৎসর (১৮৯৩ খৃঃ) আষাঢ় মাসে মা বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাটীতে আসেন ও মাঘ কিম্বা ফাল্গুনে কৈলোয়ার যাইয়া দুই মাস থাকেন। তথা হইতে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাদের সহিত মা পুনরায় কাশী ও বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কলুটোলার বাড়ীতে প্রায় একমাস থাকিয়া মা দেশে যান। তথা হইতে ফিরিবার পর বাগবাজারে গঙ্গার ধারের গুদামওয়ালা বাড়ীতে পাঁচ ছয় মাস ছিলেন। এই বাড়ীতে শ্রীযুক্ত

নাগ মহাশয় মাকে দর্শন করেন। পুনরায় দেশে যাইয়া প্রায় দেড় বৎসর পরে মা কলিকাতা আসেন এবং বাগবাজারে বিভিন্ন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিয়া আবার দেশে যান। ১৯০৪ সন হইতে তিনি প্রায় দেড় বৎসর বাগবাজার ষ্ট্রীটের একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে (রামকৃষ্ণ লেনের সামনে) ছিলেন। ১৯০৭ সনে গিরিশ বাবুর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা আসিয়া মা বলরাম বাবুর বাড়ীতে থাকেন। পূজার কয়দিন গিরিশ বাবু শ্রীশ্রীমাকে প্রত্যহ বাটীতে আনিয়া পূজা করেন। অষ্টমীর দিন রাত্রে সন্ধিপূজার সময় মাকে আর সংবাদ দেওয়া হয় নাই। মা কিন্তু ঠিক সেই সময় নিজেই বলরাম বাবুর বাড়ী হইতে হাঁটিয়া গিরিশ বাবুর বাড়ীর পিছনের ফটকে গিয়া বলেন, "দরজা খোল, আমি এসেছি।" সকলে দরজা খুলিয়া দেখিয়া বিস্মিত হন।

দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মা এইবার খুব রোগা হইয়া গিয়াছিলেন। পরে আবার দেশে গিয়া উদ্বোধনের নূতন বাড়ী হইলে মা ১৯০৯ সনে তথায় শুভাগমন করেন। তারপর কোঠার, মান্দ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, রামেশ্বর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া উদ্বোধনে ফিরিয়া আসেন এবং অল্প কয়েক দিন পরে দেশে গিয়া রাধুর বিবাহ দেন। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে উদ্বোধনের বাড়ীতে আসেন। পরবর্ত্তী কার্ত্তিক মাসে কাশী গিয়া মা কিরণ বাবুদের বাড়ীতে তিন মাস থাকেন, এবং কলিকাতা ফিরিয়া অল্প দিন পরেই দেশে যান। পুরাতন বাটীতে (প্রসন্ন মামার বাটীতে) ভক্তদের স্থান সঙ্কুলান হইত না বলিয়া ১৯১৫ সনে জয়রামবাটীতে মায়ের জন্য পৃথক বাড়ী নির্ম্মিত হয়—মাটির কোঠা, খড়ের চাল। অতঃপর মা যখনই দেশে যাইতেন, এই নূতন বাড়ীতেই থাকিতেন।

বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে শ্রীশ্রীমার গভীর নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। বহুক্ষণ পরে একটু হুঁশ হইলেও হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্ঞান অতি কষ্টে আসিয়াছিল। মা কপিল মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "এই সময় লাল জ্যোতি, নীল জ্যোতি, এই সব জ্যোতিতে মন লীন হত। আর দু চার দিন এ ভাব থাকলে দেহ থাকত না।" এই বাড়ীতেই মা একদিন দেখেন যে, ঠাকুর গঙ্গায় গিয়া নামিলেন। অমনি গঙ্গাজলে তাঁহার দেহ গলিয়া গেল। স্বামিজী "জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া সেই জল দুই হাতে চারিদিকে অসংখ্য লোকের মাথায় ছিটাইয়া দিতেছেন, আর তাহারা ঐ জলস্পর্শে সদ্য মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। এত লোক যে কোথাও একটু ফাঁক নাই! এই দৃশ্য মায়ের মনে এতই গাঁথিয়া গিয়াছিল যে, কয়েক দিন কিছুতেই গঙ্গায় নামিতে পারেন নাই। বলিতেন, "এ যে ঠাকুরের দেহ; কি করে আমি এতে পা দিই!" প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর দেবদেবীর দেহ জলে মিশিয়া গিয়াছে মনে করিয়াই হিন্দুগণ সেই "শান্তিজল" সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিয়া থাকেন।

মায়ের দৈনন্দিন জীবন বড় অদ্ভুত ছিল। তিনি রাত্রি প্রায় তিনটার সময় নিদ্রা হইতে উঠিতেন এবং সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি দেখিতেন। উঠিবার সময় ঠাকুরদের নাম করিতেন। তারপর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুর তুলিতেন এবং পরে জপে বসিতেন। সেই যে দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার সময় শেষরাত্রে উঠিয়া শৌচস্নানাদি শেষ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে ঘরে ঢুকিতেন, সেই অভ্যাস তাঁহার আজীবন ছিল। শরীর খুব খারাপ থাকিলেও যথাসময়ে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া বরং পরে আবার একটু শুইতেন। তথাপি ঠিক সময়ে

উঠা চাই। মা বলিতেন, "রাত তিনটে বাজলেই যেখানেই থাকি, কানের কাছে যেন বাঁশীর ফুঁ শুনতে পেতুম।" যখন যেটি করিবার সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ আলস্য ছিল না।

সকালের পূজার জন্য ফুল, বেলপাতা প্রভৃতি গুছান, ফল ছাড়ান ইত্যাদি সব কাজ মা নিজেই করিয়া আটটার সময় আন্দাজ পূজায় বসিতেন। ইদানীং স্ত্রী-ভক্তেরা এই সকল কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিলেও মা নিজে যথাসাধ্য প্রায় রোজই করিতেন। তবে শেষ কয়েক বার উদ্বোধনে যখন ছিলেন, সাধুদের কেহ কেহ পূজা করিতেন। মা নিজে যখন পূজা করিতেন, এক ঘণ্টার মধ্যে পূজা শেষ করিয়া প্রসাদ বিতরণের জন্য শালপাতা সাজাইতেন এবং সকলকে প্রসাদ দিতেন। কখনও কখনও কাহারও পূজায় স্তবাদি পাঠের জন্য বিলম্ব হইলে মা বিরক্ত হইতেন। একদিন বলিয়াছিলেন, "আগে পূজা ও ভোগ সেরে নিয়ে পরে যত পারে স্তব পাঠ করুক না। এ কি, লোক সব জল খেতে পায় না, বেলা হয়ে যায়!" যথাসময়ে প্রয়োজন মত এই সকল কাজ শীঘ্র শীঘ্র করাই মা পছন্দ করিতেন।

মধ্যাহ্নভোজনের পর মা একটু বিশ্রাম করিতে শুইতেন বটে, কিন্তু তখন আবার স্ত্রী-ভক্তেরা প্রায়ই আসিতেন, কারণ তাঁহাদের অনেককেই চারটা, সাড়ে চারটার মধ্যে গৃহে ফিরিতে হইত। এই সময়ে মা শুইয়া শুইয়াই তাঁহাদের সঙ্গে দু একটি কথা বলিতেন, কখনও বা কিছু পরেই উঠিয়া পড়িতেন। সাড়ে তিনটা আন্দাজ উঠিয়া—দুপুরের খাওয়া শেষ হইতেই দুইটা বাজিত—শৌচাদির পর কাপড় কাচিয়া আসিয়া ঠাকুরের বৈকালের ভোগ দিতেন। ক্রমে অন্যান্য স্ত্রী-ভক্তেরা আসিয়া জুটিতেন। মা জপের মালা লইয়া বসিতেন; ঐ সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন,

বা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যে সকল পুরুষ-ভক্ত বৈকালে আসিতেন, তাঁহাদের সাধারণতঃ প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় ডাক পড়িত। মা চাদরে মাথা অবধি ঢাকিয়া নিজের তক্তাপোষের উপর মেঝেতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রীষ্মকাল হইলে ঐ সময়ে আমাদের কেহ, কখনও বা কোন পরিচিত ভক্ত, তাঁহাকে বাতাস করিত। একে একে সকলে প্রণাম করিয়া যাইতেন। স্ত্রী-ভক্তেরা তখন অন্য ঘরে থাকিতেন। এই সময়ে ভক্তদের "কেমন আছেন?" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে মা সাধারণতঃ ঘাড় নাড়িয়া, অথবা আস্তে সামান্য দুই এক কথায় উত্তর দিতেন। আমরা তাহা একটু উচ্চস্বরে বলিতাম। কাহারও বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি সর্বশেষে প্রণাম করিতেন। তখন, পরিচিত হইলে মা নিজেই আস্তে আস্তে কথা বলিতেন, আর অপরিচিত বা বেশী বয়সের ভক্ত হইলে মা অনুচ্চস্বরে যাহা বলিতেন, আমরা তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতাম।

মা সন্ধ্যার পর জপ সমাপন করিয়া ভোগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেজেয় বিশ্রাম করিতেন এবং এই সময়ে কেহ তাঁহার পায়ে বাতের তেল বা আমবাতের জন্য মরিচাদি তেল মালিস করিয়া দিত। সাধারণতঃ নবাসনের বৌ দিতেন, কখনও কখনও অপর একটি স্ত্রী-ভক্ত। রাত্রে ঠাকুরের ভোগ শেষ হইতে দশটা এবং আহারাদি শেষ করিয়া শুইতে এগারটা সাড়ে এগারটা বাজিত।

মায়ের আহার সম্বন্ধেও অনেক বিষয় লক্ষ্য করিবার ছিল। তিনি বেশী মিষ্ট আম অপেক্ষা অম্লমধুর—"টক টক, মিষ্টি মিষ্টি"—আমই অধিক ভালবাসিতেন। বোম্বাই হইতে বরেন বাবু আলফনসো আম পাঠাইতেন; মা তাহা পছন্দ করিতেন। পেয়ারাফুলি ও

ছোট ল্যাংড়া আমও তিনি ভালবাসিতেন। কিন্তু কেহ ভক্তির সহিত খুব টক আম দিলেও তাহা পরম প্রিয় বোধে আহার করিতেন। উদ্বোধনের বাড়ীতে একদিন জনৈক ভক্ত কতকগুলি আম কিনিয়া আনেন। অগ্রভাগ খাইতে নাই বলিয়া, তিনি দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করিয়া না চাখিয়াই আমগুলি লইয়া আসেন। মধ্যাহ্নে ভোগের পর যখন সকলকে সেই আম-প্রসাদ দেওয়া হইল, টক বলিয়া কেহই উহা খাইতে পারিলেন না এবং ভক্তটিকে বোকা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মা কিন্তু একটি আম খাইয়া বলিলেন, "না, এ বেশ টক টক আম।" সাধারণতঃ মা জানিতেন না, কে কোন্ বস্তু দিয়াছে; কিন্তু দেখা যাইত, কোন কোন মিষ্টি ইত্যাদি খারাপ হইলেও উহার দুই একটি খাইতেন। শাকের মধ্যে ছোলাশাক, মূলোশাক প্রভৃতি ভাল-বাসিতেন। একবার দেশ হইতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া খুব অরুচি লইয়া আসেন। তখন তাঁহাকে এই ছোলাশাক খাইতে দেওয়া হইত। শীতকালে মুড়ি, ফুটকড়াই এবং উড়িয়ার দোকানের বেগুনি, ফুলুরি, ঝালবড়া, আলুর চপ ইত্যাদি সকালের পূজায় ঠাকুরকে মাঝে মাঝে ভোগ দেওয়া হইত। এই সব তেলে ভাজা জিনিষ মা পছন্দ করিতেন। মুগের নাড়ু, ঝুরিভাজা ইত্যাদিও তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি রাতাবি সন্দেশ এবং (রাঙ্গা আলুর) রসপুলি পিঠা প্রভৃতিও ভালবাসিতেন। ইদানীং আমরুল শাক মায়ের প্রিয় ছিল। তাঁহার আমাশয়ের ধাত ছিল বলিয়া কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন এই শাক ব্যবস্থা করেন। তাই মঠ হইতে কেহ উদ্বোধনে যাইলে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তাহাকে দিয়া মায়ের জন্য এই শাক পাঠাইতেন। সকালে মা একটু মিছরির পানা খাইতেন। তাঁহার জন্য যে জলখাবার প্রসাদ রাখা

হইত, আগত ভক্তদিগকে কিছু কিছু দিতে দিতে তাহা অনেক সময়ই নিঃশেষ হইয়া যাইত। আর যেদিন তিনি নিজ হাতে প্রসাদ ভাগ করিয়া দিতেন সেদিন মিছরির পানাটুকুও অবশিষ্ট থাকিত না, অথবা অতি অল্পমাত্র থাকিত। ডান হাঁটুর বাতের জন্য মা দই ইত্যাদি নামমাত্র খাইতেন। কলাইএর পাতলা ডাল ও (হাতায় করিয়া) পোস্তপোড়া তাঁহার খুবই প্রিয় ছিল। পেটের অসুখ ও বাতের জন্য শেষাশেষি তিনি একটু করিয়া আফিম খাইতেন ; সেইজন্যে মধ্যাহ্নে ও রাত্রে আধসের করিয়া দুধের ব্যবস্থা ছিল। তিনি মধ্যাহ্নে দুধের অর্দ্ধেক আন্দাজ খাইতেন এবং বাকি দুধে ভাত মাখিয়া ভক্তদের জন্য প্রসাদ রাখিয়া দিতেন ; কারণ পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তগণ প্রত্যহ অন্ন-প্রসাদ চাহিতেন। দুই এক দানা প্রায় সকলেই গ্রহণ করিতেন। যে সব ভক্তেরা বৈকালে আসিতেন, তাঁহাদের জন্যও এই প্রসাদ রাখা হইত। তিনি নিজে খাইবার সময় যে ভাত মাখিতেন তাহাতে ডাল, সুক্ত, ঝোল ইত্যাদি অল্প অল্প করিয়া মাখিতেন এবং উহাতে নেবুর রস মিশাইয়া লইতেন। সে প্রসাদ আমাদের বেশ ভাল লাগিত। কোন কোন দিন তাহাতে বড়ি, চচ্চড়ি ইত্যাদি মিশাইয়া একটি উপাদেয় খাদ্য তৈয়ার করিতেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ উহা খাইয়া প্রশংসা করিতেন। বৈকালে পান ও জল ছাড়া বিশেষ কিছু তাঁহাকে খাইতে দেখি নাই। রাত্রে লুচি, তরকারি ও দুধ দেওয়া হইত। লুচি দুই তিনখানার বেশী খাইতেন না, এবং দুধ প্রায় দেড় পোয়া খাইতেন।

তিনি দাঁতে প্রত্যহ চারিবার করিয়া গুল দিতেন। নারিকেল পাতা ও দোক্তা পোড়াইয়া উহা তৈয়ার করা হইত। মায়ের দেহ

যাইবার কিছুদিন পর, নীরদ মহারাজের মা স্বপ্ন দেখেন যে, মা তাঁহাকে বলিতেছেন, "বউ মা, ওরা আমাকে সবই দেয়, কিন্তু গুলটি দেয় না। তুমি গুল করে ওখানে (উদ্বোধনের বাড়ীতে) শরৎকে পাঠিয়ে দিও।" তিনি তদনুযায়ী গুল তৈয়ারী করিয়া পাঠাইলে সকলে লক্ষ্য করিলেন, বাস্তবিকই মায়ের সেবার এই নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যটি বাদ পড়িয়াছে।

মা যখন জয়রামবাটীতে পুরাতন বাড়ীতে থাকিতেন তখন সকালবেলা প্রায় সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেন। এই সময়ে আমরা গিয়া নানা কথাবার্ত্তা বলিতাম ও শাকসবজীর পাতা বাছিতাম। এমন সস্নেহে সুপ্রসন্ন মূর্ত্তিতে মা এই সময় কথাবার্ত্তা বলিতেন যে, যাঁহারা একদিনও সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সেই জন্য মা যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন ভক্তেরা পত্রে প্রায়ই জানিতে চাহিতেন, মা কতদিনে দেশে যাইবেন। জয়রামবাটীতে মায়ের সঙ্গে মিশিবার ও কথাবার্ত্তা বলিবার যে সুযোগ ছিল, এমন আর কোথাও মিলিত না। ভক্ত সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া, থাকা ইত্যাদির ব্যবস্থা মা নিজেই সযত্নে করিতেন। ভক্তেরাও এখানে আপন মায়ের স্নেহযত্ন অনুভব করিতেন। মা নয়টার সময় স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরপূজা করিতেন, এবং উহা সমাপ্ত হইলে ভক্তদের প্রসাদ দিতেন। সাধারণতঃ মুড়ি, মিষ্টি এবং হালুয়া তৈয়ারী করিয়া দিতেন—কখনও বা ঐ সঙ্গে ফলমূল যাহা ওখানে পাওয়া যাইত বা ভক্তেরা আনিতেন, তাহাও থাকিত।

রাঁধুনীকে জল খাইতে বসাইয়া মা নিজেই ঐ সময়ে রান্না করিতেন। তাঁহার রান্নার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি তরকারিতে নুন, ঝাল ও মশলা সাধারণতঃ একটু কমই দিতেন।

খাওয়ার সময় ছাড়া অন্য যে সময় ভক্তেরা বাড়ীর মধ্যে মাকে দর্শন করিতে যাইতেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে মিষ্টি, জল ও পান খাইতে দিতেন। পান কাহাকেও দু-খিলির কম দিতেন না। এইসব দ্রব্য অতি সামান্য হইলেও এমন সস্নেহে দিতেন যে, সকলেই এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিতেন। আবার কেহ তাঁহার জন্য অতি সামান্য জিনিষ লইয়া যাইলেও তিনি কতই না আনন্দিত হইতেন! জয়রামবাটীর নিকটবর্ত্তী শ্যামবাজারে ভাল পান পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলের গরীব ভক্তেরা কখনও কখনও একগোছ পান লইয়া মাকে দর্শন করিতে আসিতেন। দেখিতাম, মা তাহা পাইয়াই কত খুশি। ভক্তেরা মিষ্টি ইত্যাদি যাহা লইয়া যাইতেন, মা তাহা সযত্নে তাঁহাদের জন্যই রাখিয়া দিতেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ কলিকাতা হইতে কড়াপাকের সন্দেশ পাঠাইলে মা তাহা ভক্তদের জন্য তুলিয়া রাখিয়া যে ভাবে দুবেলা সকলকে দিতেন, তাহা দেখিয়া মনে হইত যেন উহা ভক্তসেবার জন্যই প্রেরিত হইয়াছে। আবার জয়রামবাটীতে পাড়ার অনেক বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া একবার তাহাদের 'দিদি ঠাকরুণকে' প্রণাম করিতে প্রায় রোজই আসিত। মাও যেজন্য যে আসিয়াছে তাহা বুঝিয়া তাহাদের হাত ভরিয়া ফল, মিষ্টি প্রভৃতি যাহা থাকিত প্রসাদ দিতেন। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর প্রেরিত বেদানা এবং পূজনীয় শরৎ মহারাজ যে আম পাঠাইতেন, তাহা ভাগ করিয়া প্রথমে সিংহবাহিনীকে এবং ধর্ম্মঠাকুর ও অন্যান্য দেবতাকে দিতেন; তারপর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদিগকে দিতেন। একবার কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে পুলিপিঠা হইয়াছে। ছুটি পাইলেই বাঁকুড়া হইতে বিভূতি প্রায়ই জয়রামবাটী আসিয়া থাকে; তাই মা তাহার জন্য

পিঠা রাখিয়া দিয়াছেন। দুই দিন গেল, কিন্তু বিভূতি আর আসিতেছে না। তথাপি মা রোজ ঐ পিঠা পুনরায় ভাজিয়া রাখিয়া দিতেছেন। ভাবিতেছেন, "কাল হয়ত আসতে পারে; যদি আসে, মনে হবে, আহা, খেতে পেলে না।" এইভাবে চারিদিন রাখিবার পর বিভূতি গিয়া সেই পিঠা খাইয়াছিল।

মায়ের অপার স্নেহযত্ন যে পাইয়াছে সেই জানে। জ্ঞান যখন জয়রামবাটী থাকিত তখন তাহার একবার খুব পাঁচড়া হইয়াছিল। নিজ হাতে খাইতে পারিত না। এই সময় মা নিজে ভাত মাখিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেন এবং তাহার উচ্ছিষ্ট পাতা পর্য্যন্ত ফেলিতেন।

জয়রামবাটীতে মায়ের গৃহনির্ম্মাণের সময় আমি একদিন সকালে কার্য্যোপলক্ষ্যে পাশের গ্রামে গিয়াছিলাম। জরুরি কাজ থাকায় মধ্যাহ্নে খাইবার সময় আসিয়া পৌঁছিতে পারি নাই। তখন শীতকাল। সূর্য্যাস্তের ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, মা তখনও খান নাই, আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিস্মিত হইয়া মাকে গিয়া বলিলাম, "মা, তোমার শরীর ভাল নয়, আর তুমি এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাসী রয়েছ!" মা বলিলেন, "বাবা, তোমার খাওয়া হয়নি, আমি কি করে খাই?" আমি তাড়াতাড়ি খাইতে বসিলাম। আমার খাওয়া হইলে মা এবং মেয়েদের দুই-এক জন যাহারা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা খাইতে বসিলেন। এরূপ ব্যবহার কয়জন জননী নিজের সন্তানের প্রতিই করিয়া থাকেন! তবে মা অন্তরে সকলকেই এইরূপ স্নেহ করিলেও বাহিরে সর্ব্ববিধ ব্যবহারেই গাম্ভীর্য্য, সঙ্কোচ ও লজ্জাশীলতা রক্ষা করিয়া চলিতেন।

কখনও কখনও মা আমাদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে মুদির দোকান

হইতে জিনিষপত্র কিনিয়া আনিবার জন্য পাঠাইতেন। আমরা হয়ত ভক্তদের দুই-এক জনকে সঙ্গে লইয়া যাইতাম। দেখিয়াছি, তাঁহারা মায়ের সেবার জন্য এতটুকুও করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। ভক্তেরা যখন মায়ের সঙ্গে কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেন, আমরা মায়ের অনুমতি লইয়া তাঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া যাইতাম। মা বলিতেন, "আহা, লোকে কত কষ্ট করে এখানে আসে! গয়া, কাশী যাওয়া বরং সহজ, এখানে আসা তার চেয়েও কষ্টকর।" তাই দূরদেশাগত ভক্তগণকে মা প্রায়ই দুই-এক দিন বিশ্রাম করিতে বলিতেন। আমরা বা আগন্তুক ভক্তেরা নিজেরাই তাঁহার অসুবিধার কথা ভাবিয়া যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিলেও তিনি ছাড়িতেন না। যাঁহারা মায়ের কৃপালাভের জন্য আসিতেন, শরীর নিতান্ত অসুস্থ না থাকিলে মা তাঁহাদের কাহাকেও বড় একটা ফিরাইতেন না। ভাল আধার দেখিলে কখনও কখনও নিজেই যাচিয়া দীক্ষা দিয়াছেন, অথবা প্রার্থনামাত্র তৎক্ষণাৎ কৃপা করিয়াছেন।

একবার মা দেশ হইতে ম্যালেরিয়ায় জীর্ণশীর্ণ হইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। চিকিৎসায় জ্বর থামিয়াছে মাত্র, কিন্তু খুব দুর্ব্বল আছেন। ভক্তদের কাহাকেও দর্শন করিতে দেওয়া হইতেছে না। এই সময় বোম্বাই হইতে একটি পার্শী যুবক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। অতদূর হইতে আসিয়াছে এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ইহা মনে করিয়াই বোধ হয় পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাহাকে দর্শন করিতে অনুমতি দিলেন। যুবকটীর ভ্রাতা কার্য্যোপলক্ষ্যে যখন আফ্রিকায় ছিলেন তখন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পাঠে আকৃষ্ট হইয়া স্বামিজীর কিছু পুস্তক আনাইয়া পড়েন। তিনি বোম্বাই ফিরিলে সেই সকল পুস্তক উক্ত যুবকটি পড়িয়াছে এবং ক্রমশঃ ঐ বিষয়ে আগ্রহ

হওয়ায় কলিকাতা আসিয়াছে। যুবকটি মাকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিল, "মাঈজী, কুছ্ মূলমন্ত্র দীজিয়ে জিস্‌সে খোদা পহচান যায়।" শুনিয়াই মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "দেবো? দিই দিয়ে।" আমি বলিলাম, "সে কি! কাউকে দর্শন পর্য্যন্ত করতে দেওয়া হয় না, সবে অসুখ হতে উঠেছ; শরৎ মহারাজ শুনলে কি বলবেন! এখন নয়, এর পরে হবে।" মা বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি শরৎকে জিজ্ঞাসা করে এস।" আমি তাড়াতাড়ি গিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজকে সব কথা বলায় তিনি বলিলেন, "আমি আর কি বলব? মার যদি একটা পার্শী চেলা করতে ইচ্ছা হয়ে থাকে, করুন। বলে আর কি হবে।" ফিরিয়া গিয়া দেখি, মা ইতোমধ্যেই দীক্ষা দিবার জন্য নিজেই দুইখানি আসন পাতিয়া গঙ্গাজল লইয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। দীক্ষা হইলে আমাকে বলিতেছেন, "বেশ ছেলেটি, যা বললুম ঠিক বুঝে নিলে।" বুঝিলাম, মা কেন বলিতেন, "এসব ঠাকুরই পাঠাচ্ছেন।" এই সকল ভিন্নভাষাভাষীদের দীক্ষার সময় মা যাহা বলিবার বাংলাতেই বলিয়া যাইতেন, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিত। যখন দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন, সেখানেও মা বলিতেন, "লোক এসে বলত, 'মন্ত্রম্' 'উপদেশম্', আর কোন কথা ত বুঝতে পারছি নে!" সেখানেও তিনি ঐরূপে অনেককে দীক্ষা দিয়াছেন। দীক্ষা দিবার সময় তাঁহার মনের অন্তস্তল হইতে যে মন্ত্র উদিত হইত তাহাই দীক্ষা-প্রার্থীর যথার্থ মন্ত্র জানিয়া মা উহাই তাহাকে দিতেন। বলিতেন, "কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়েই মন থেকে ওঠে, 'এই দাও, এই দাও।' আবার কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়ে মনে হয় যেন কিছুই জানিনে, কিছুই মনে আসে না। বসেই আছি, পরে অনেক ভাবতে ভাবতে

তবে দেখতে পাই।" ইহার কারণ মা বলিতেন, "যে ভাল আধার তার বেলায় তক্ষুণি মন থেকে উঠে।"

অনেক সময় মা অল্প বয়সের ছেলেদেরও দীক্ষা দিয়াছেন। আমার মনে আছে, একবার উদ্বোধনে একটি ছেলে, বছর বার বয়সের, বৈকালে ভক্তদের সঙ্গে মাকে প্রণাম করিবার পর কাঁদিতে থাকে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "মায়ের কৃপা চাই।" আমি বলিলাম, "কৃপা কিরে! হবে এখন, চল্।" তবুও কাঁদে। তখন বুঝা গেল, মন্ত্র চায়। ভাবিলাম, কাহারও কাছে শোনা কথা বলিতেছে; অত ছোট ছেলে মন্ত্রের কি বুঝে? পরদিন দেখি সেই ছেলেটি বাহিরের রোয়াকে একা বসিয়া আছে। সেখানে ছেলে বুড়ো অনেকেই আসিয়া বসে, তাই কেহ তাহার খোঁজখবর নেয় নাই। আমি বাজার হইতে ফিরিবার সময় দেখি, সেই ছেলেটি হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে?" সে আনন্দে উত্তর দিল, "আমার দীক্ষা হয়েছে।" শুনিলাম মা রাধুকে বলেন, "দেখবে নীচে রোয়াকে একটী ছেলে বসে আছে, তাকে নিয়ে এস," এবং তাহার দ্বারা ছেলেটিকে ডাকাইয়া মন্ত্র দিয়াছেন; এখন সে বাজারে শ্রীশ্রীমার জন্য ফলমিষ্টি কিনিতে যাইতেছে। মায়ের সঙ্গে দেখা হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, অতটুকু ছেলেকে আবার কি দীক্ষা দিলে? ও কি বোঝে?" মা উত্তর দিলেন, "তা যা হোক, বাপু, ছেলেমানুষ—কাল ত অমন করে পায়ে পড়ে কাঁদলে। কে ভগবানের জন্য কাঁদছে বল দেখি? এ মতি ক জনের হয়?"

মা নম্রতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। এত লোক তাঁহার পদধূলি পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিত, তথাপি তিনি নিজেকে ঠাকুরের একজন কৃপাপ্রাপ্তা চরণাশ্রিতা বলিয়াই মনে করিতেন।

দীক্ষাপ্রদানের পর ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিতেন, "ঐ উনিই গুরু।" যদিও কখনও কখনও খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলিতে বলিতে 'তিনি কে'—এই সব কথা অলক্ষ্যে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িত, কিন্তু ঐ ভাবকে তিনি মনেও স্থান দিতেন না। তাঁহার যাহা কিছু সবই ঠাকুর। জনৈকা প্রাচীনা স্ত্রীভক্ত একদিন মার শেষ অসুখের সময় তাঁহাকে "তুমি জগদম্বা, তুমিই সব" ইত্যাদি বলিয়া যেমন প্রশংসা করিতেছেন, অমনি মা রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যাও, যাও, 'জগদম্বা'! তিনি দয়া করে পায়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে বর্ত্তে গেছি। 'তুমি জগদম্বা! তুমি হেন!'—বেরোও এখান থেকে।" যদিও তিনি তাঁহার সম্বন্ধে কোন ভক্তের আন্তরিক বিশ্বাসকে বিচলিত করিতেন না, তথাপি এইরূপ প্রশংসাবাদ তাঁহার সহ্য হইত না।

তাঁহার নিজের ইচ্ছা বা ন্যায্য বিবেচনার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তিনি প্রথমে উহা মানিয়া লইতেন। পরে ধীরে ধীরে নিজে যেটি ইচ্ছা করিতেন বা ন্যায্য বিবেচনা করিতেন তাহা বলিয়া প্রশ্ন-কারীকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "আচ্ছা, এ রকম হলে কেমন হয়?" এইরূপে ক্রমশঃ তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতেন। কখনও তাহার মুখের উপর "তোমার ওকথা কিছু না" বলিয়া উত্তর দিতেন না। একদিন পূর্ণ বাবুর স্ত্রী দীক্ষার কথা উত্থাপন করিয়া মাকে বলিলেন, "মা, আপনি ত শীঘ্রই দেশে চলে যাচ্ছেন, আর আমরাও সিমলা পাহাড়ে যাব। আবার কবে দেখা হবে। মন্ত্র নেবার ইচ্ছা, কিন্তু আমার জাতাশৌচ হয়েছে।" গোলাপ-মা ও যোগেন-মা নিকটে ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অশৌচে কি দীক্ষা হয়? এখন কি করে নেবে?" মাও তাঁহাদের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "তাই ত, কি করে হবে তাহলে?" সেই সময় বরেন বাবুর পিসীও সেখানে

ছিলেন। একদিন তিনি মাকে একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনি কি জাতাশৌচ মানেন?" মা বলিলেন, "কায়াপ্রাণে ন সম্বন্ধঃ, আবার জাতাশৌচ! কালীপূজার দিন ওকে গঙ্গাস্নান করিয়ে নিয়ে এসো।" পরে পূর্ণ বাবু নিজেই নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাকে মায়ের নিকট লইয়া যান।

মায়ের গৃহ-প্রতিষ্ঠার সময় ললিত বাবু জয়রামবাটী গিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি তথায় একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া মাকে একদিন অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছিলেন, "মা, আপনার নামে ভক্তদের কাছে আবেদন বের করলে এই গরীব লোকদের মহা উপকার হবে।" লোক-কল্যাণের জন্য তাঁহার এই পুনঃ পুনঃ অনুরোধে চক্ষুলজ্জায় মা কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। এই সময় হেমেন্দ্র (৺ব্রহ্মচারী রূপচৈতন্য) উপস্থিত হওয়ায় সে উহাতে ঘোর আপত্তি করিল। মা এতক্ষণে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ললিত বাবু চলিয়া যাইবার পর আমি বাড়ীর মধ্যে যাইলে মা আমাকে হেমেন্দ্রের কথায় বলিতেছেন, "এ দেখছি আমার যোগীনের মত আমায় রক্ষা করলে। ছি! ছি! টাকা চাওয়া!"

যদিও তাঁহার ব্যবহার সর্ব্বদা শিষ্টাচারপূর্ণ ছিল এবং তিনি উহাই পছন্দ করিতেন, তথাপি কলিকাতায় তিনি সকল সময় নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন। একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "এখানে আমাকে সর্ব্বদা হিসাব করে কথাটি বলতে হয়, চলতে হয়। কে কোন্ কথাটিতে অসন্তুষ্ট হবে! তার চেয়ে দেশে আমি থাকি ভাল। আমি তাদের হড় হড় করে যা মুখে এল দু কথা বলে গেলুম, তারাও আমাকে যা হোক দু কথা বলে গেল। তারাও কিছু

মনে করলে না, আমিও কিছু মনে করলুম না, ব্যস্। আর এখানকার লোকেরা কথার একটু এদিক ওদিক হলেই ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল!"

মায়ের সরল, স্নেহপূর্ণ অথচ ধীর গম্ভীর ব্যবহারে সকলে তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে কিন্তু সসম্ভ্রমে কথা বলিত। জয়রামবাটীর কাছে শিরোমণিপুরে বহু মুসলমানের বাস। তাহারা পূর্ব্বে তুঁতের (রেশমকীটের) চাষ করিত। বিদেশী রেশমের প্রতিযোগিতায় তাহাদের ঐ ব্যবসায় ক্রমশঃ নষ্ট হওয়ায় শেষে চুরি-ডাকাতিই তাহাদের জীবিকা হইয়া দাঁড়ায়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা এই তুঁতে ডাকাতদের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। কোন গ্রামের মধ্য দিয়া একটি তুঁতে কোন দিন চলিয়া গেলে গ্রামবাসীরা শীঘ্রই গ্রামে ডাকাতি হইবে মনে করিয়া সশঙ্ক থাকিত। মায়ের শেষ জীবনে যখন ভক্তদের যাতায়াত বাড়িতে থাকে, তখন মা মামাদের বাড়ীতে থাকিলে ভক্তদের অসুবিধা হয় দেখিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমার ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার জন্য নূতন স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। সে বৎসর ওদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় আমরা বহু তুঁতে মজুর নিযুক্ত করিয়াছিলাম। গ্রামবাসীরা প্রথমে উহাতে ভয় পাইলেও শেষে বলিত, "মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্য্যন্ত ভক্ত হয়ে গেল রে!" একদিন মা একটি তুঁতে মুসলমানকে (যে মায়ের বাড়ীর দেওয়াল নির্ম্মাণ করিয়াছিল) বাড়ীর ভিতরে তাঁহার নিজের ঘরের বারান্দায় খাইতে দিয়াছেন। তাঁহার ভাইঝি নলিনী উঠানে দাঁড়াইয়া তাহাকে দূর হইতে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া পরিবেশন করিতেছিল। মা তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অমন করে দিলে মানুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস্ আমি দিচ্ছি।" খাওয়ার শেষে মা উচ্ছিষ্ট স্থানটি নিজেই ধুইয়া দিলেন। নলিনী মাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া, "ও

পিসীমা, তোমার জাত গেল," ইত্যাদি বলিয়া বড়ই আপত্তি করিতে লাগিল। মা তাহাকে এই বলিয়া ধমক দিলেন, "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।" তিনি যে জগতের মা। এইরূপ ব্যবহারেই ত দুর্ব্বল, অধম মানবের প্রাণে বিশ্বাস আসিবে যে, সেও জগন্মাতার আপন সন্তান।

বাস্তবিকই তিনি মন্দকেও ভাল চক্ষে দেখিয়া সকলকে উন্নত করিতেন। মা বলিতেন, "দোষ ত মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে তা জানে ক জনে ?" একদিন একজন তুঁতে মুসলমান কয়েকটি কলা আনিয়া বলিল, "মা, ঠাকুরের জন্য এইগুলি এনেছি, নেবেন কি ?" মা লইবার জন্য হাত পাতিলেন ; বলিলেন, "খুব নেব, বাবা, দাও। ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেব বই কি !" মায়ের সাংসারিক কার্য্যে সাহায্যার্থ নিকটবর্ত্তী গ্রামের জনৈকা স্ত্রীভক্ত কাছেই ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন ?" মা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া মুসলমানটিকে মুড়ি মিষ্টি দিতে বলিলেন। সে চলিয়া যাইলে মা ঐ স্ত্রীভক্তটিকে তিরস্কার করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।" আমরা দেখিতাম, যাহাকে কেহ দেখিতে পারে না, মা ঠিক তাহাকেই আরও আদর যত্ন করিতেন। কেহ কোন মহা গর্হিত কার্য্য করিয়াও যদি তাঁহার নিকট অনুতপ্ত হইয়া যাইত, তিনি তাহাকে অভয় দিতেন। একবার একটি যুবতী এইরূপে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে মা তাহাকে কোল দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যা করেছ করেছ, আর করো না" এবং তাহার পাপরাশি নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, যাহাতে তাহার সুমতি হয়।

একবার জনৈক যুবক ভক্তের কোন অন্যায় আচরণের জন্ম ঠাকুরের কোন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন তাহাকে মায়ের নিকট আসিতে না দেওয়া হয়। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, "আমার ছেলে যদি ধূলোকাদা মাখে, আমাকেই ত ধূলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে!" এই মাতৃসুলভ স্নেহ ও ক্ষমা দ্বারাই তিনি বিপথগামীকে সুপথে আনিতেন।

মায়ের সহনশীলতার সীমা ছিল না। কত লোক নানাপ্রকার পাপতাপের বোঝা লইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিত; শরীরে ভীষণ জ্বালা অনুভব করিলেও মা উহা নীরবে সহ্য করিতেন। একদিন বৈকালে দর্শনার্থীদের প্রণামের পর দেখি, মা বারান্দায় আসিয়া হাঁটু অবধি পা কেবল ধুইতেছেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "আর কাউকে পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করতে দিও না। যত পাপ এসে ঢোকে, আমার পা জ্বলে যায়; পা ধুয়ে ফেলতে হয়। এই-জন্যই ত ব্যাধি। দূর থেকে প্রণাম করতে বলবে।" বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "এসব কথা শরৎকে বলো না। তাহলে প্রণাম করা বন্ধ করে দেবে।"

নিজ পছন্দমত কাজ মানুষ যেরূপ প্রীতির সহিত দুই-চারি দিন করিয়া থাকে, মাকে জীবনব্যাপী দৈনিক কার্য্যগুলিও সেইরূপ প্রীতির সহিত করিতে দেখিতাম। জয়রামবাটীতে নিত্যকার সেই রান্নাবাড়া, খাওয়ান ইত্যাদি একঘেয়ে কাজ, তাহার উপর যখন তখন ভক্ত-সমাগম, আবার তাঁহার সংসারের এক একজন এক এক রকমের ছিল; ইহা সত্ত্বেও তিনি এই সকল কাজ আনন্দের সহিত করিয়া যাইতেন। অন্যে সাহায্য করে ভাল, না করিলেও কিছু মনে করিতেন না। যেন তাঁহারই সকল দায়িত্ব, বাড়ীর অপর সকলে অভ্যাগত!

জয়রামবাটীতে দেখিতাম, সকালবেলা সেই ঘণ্টা তুই ধরিয়া শাক তরকারি কুটা, রান্নার জন্য ভাঁড়ার বাহির করিয়া দেওয়া, পূজার সব যোগাড় করিয়া নিজে পূজা করা, আবার দীক্ষাদান, প্রসাদ ও জলখাবার বাঁটিয়া দেওয়া, অন্ততঃ একশ খিলি পান সাজা, ভক্তগণকে ও বাড়ীর লোকদিগকে খাওয়ান, বৈকালে নিজহাতে লুচি রুটি তরকারি প্রভৃতি করা, তুধ জ্বাল দেওয়া, লণ্ঠন পরিষ্কার করা—সবই যেন নিত্য নূতন প্রীতির সহিত করিয়া যাইতেছেন। ইদানীং স্ত্রীভক্তেরা ও নলিনী প্রভৃতি তাঁহাকে সাহায্য করিতেন বটে, তথাপি অধিকাংশ কাজ তাঁহাকেই করিতে ও দেখিতে হইত। মা বলিতেন, "শরীর এদিকে পড়ে যাচ্ছে, আর কাজও ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে।"

ছোট ছোট খুঁটিনাটি কাজেও মায়ের আচরণ আদর্শস্থানীয় ছিল। উদ্বোধনে আমরা স্নানের পর কাপড় শুকাইতে দিতাম। বৈকালে বর্ষা হইলে সেগুলি ভাল করিয়া শুকাইত না, কোনখানি হয়ত পুনরায় ভিজিত, কোনখানির জল হয়ত ভাল করিয়া নিংড়ান হইত না। দেখিতাম, মা আস্তে আস্তে সেই কাপড়গুলি আবার নিংড়াইয়া দোতলার দক্ষিণের ঘরে লম্বা করিয়া দড়িতে বা জানালার গরাদের সহিত বাঁধিয়া শুকাইতে দিতেছেন। একদিন বৃষ্টির পরে তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "মা, এত লোক রয়েছে, তুমি আবার কেন জল ঘাঁটছ? বৃষ্টিতে বারান্দা সব ভিজে গেছে, পায়ে বাত—আর কি লোক নেই?" মা বলিলেন, "না, বাবা, এই যাচ্ছি, এই সামান্য একটু।" স্বামিজী বলিতেন, "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মানুষকে চিনতে হয়।"

সামান্য সামান্য বিষয়েও মায়ের অদ্ভুত দৃষ্টি ছিল। জয়রামবাটীতে তাঁহার নূতন বাড়ী হওয়ার পর গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ চার টাকা ট্যাক্স ধার্য্য

করিয়া জ্ঞানানন্দের নিকট হইতে উহা আদায় করে। মা তখন কলিকাতায় ছিলেন। পর বৎসর মা দেশে যাইলে চৌকিদার যখন উহা আদায় করিতে আসিল তখন মা বলিলেন, "এত বেশী কেন? কমাবার চেষ্টা কর। আমি না হয় দিলুম। কিন্তু আমি যখন থাকব না তখন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যে থাকবে সে কি করে দেবে? তার খাওয়া-পরাই হয়ত ভিক্ষা করে চালাতে হবে।" আর একবার জ্ঞান যখন জয়রামবাটীতে, তখন সে গোয়ালাকে খাঁটি দুধ দিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিত, "টাকায় আট সের দেবে, তবু খাঁটি চাই।" এইভাবে সে চড়া দরে দুধ কিনিত। একদিন মা উহা শুনিতে পাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন, "ওকি, জ্ঞান, এখানে পয়সায় পোয়া দুধ মেলে, গরীবে খেতে পায়। আর তুমি অমনি করে দর বাড়াচ্ছ! গোয়ালা—সে ত জল দেবেই। দর বাড়ালে তখন ত পয়সা বেশী পাবে বলে আরও জল মেশাতে চাইবে।"

অন্য দিকে কতকগুলি বিষয় মায়ের বড়ই চমৎকার ছিল। কেহ নির্লজ্জ হইয়া নাচুক না কেন, মা সেইস্থান দিয়া চলিয়া যাইলেও তাঁহার দৃষ্টি আদৌ সেদিকে পড়িবে না। যদি দৈবাৎ কখনও পড়িল, তথাপি তাঁহার তৎকালীন উদাসীন দৃষ্টি ও মুখের ভাব হইতে স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি উহার কিছুই লক্ষ্য করেন নাই, বা উহা বিসদৃশ বলিয়া মনে করেন নাই। যেন বালিকার দৃষ্টি—ভালমন্দের বোধই নাই।

লোককে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তাহার দোষগুণ দেখার অভ্যাস মায়ের কখনই ছিল না। একবার চাহিয়া দেখিলেন, এইমাত্র। দৃষ্টিমাত্র লোকের অন্তর-বাহির জানিবার শক্তি যাঁহার ছিল, অন্যায় করিয়াও তাঁহার কাছে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়াইতাম। জানিতাম যে,

তাঁহার দৃষ্টি ঐদিকে পড়িবে না, অথবা যতক্ষণ না বলিব, তিনি জানিতে পারিবেন না। আর বলিলে ত ক্ষমা আছেই। যিনি যত বেশী শক্তি হজম করিতে পারেন, তিনি তত অধিক শক্তিমান। নিবেদিতা ঠিকই লিখিয়াছেন, "স্ত্রীভক্তেরা মায়ের সঙ্গে বসিয়া যখন কথাবার্ত্তা বলিতেন, তাঁহারা কিছুতেই মনে করিতে পারিতেন না যে, ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ বা তাঁহার উপর মায়ের দাবী তাঁহাদের চেয়ে বেশী ছিল। মনে হইত যেন তিনি তাঁহাদের মতই ঠাকুরের আশ্রিত ও কৃপাপ্রার্থীদের একজন।"

যদিও তাঁহার নিকট ত্যাগী ও গৃহস্থ সমান আদর পাইয়াছে, তথাপি ত্যাগীরা সমধিক প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন, "বাবা, ত্যাগীদের না হলে কাদের নিয়ে থাকব?" একবার বেলুড় মঠে ঠাকুরের উৎসবে মা গিয়াছেন। মধ্যাহ্নে তাঁহার আহারের পর আমি জাগ্ হইতে জল ঢালিয়া দিতেছি, মা দাঁড়াইয়া আঁচাইতেছেন। আঁচাইবার পর মা সাধারণতঃ পা ধুইয়া থাকেন; আমি সেইজন্য পায় জল ঢালিয়া দিতেছি এবং হাঁটুর বাতের জন্য মায়ের নীচু হইতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া নিজেই হাত দিয়া পায়ের পাতার উপরের জলটা একটু মুছিয়া দিতেছি। অমনি মা মহা সঙ্কুচিতা হইয়া বলিলেন, "না, না, বাবা, তুমি! তোমরা দেবের আরাধ্য ধন।" এই বলিয়া নিজেই হাত দিয়া পা মুছিলেন। আমি ত তখন কাছা দিয়া কাপড় পরি, আর তাঁহার পায়ে জল ঢালিয়া দিবারও যোগ্য নহি।

মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা আসিলে রাধু প্রভৃতিকে মা প্রায়ই বলিতেন, "দাদাদের প্রণাম কর।" একদিন উদ্বোধনের বাড়ীতে কোন প্রাচীনা স্ত্রীভক্ত জনৈক সাধুর সঙ্গে কোন ব্যাপারে কথা কাটা-কাটি হওয়ায় এই বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, "ও এখানে

থাকলে আমি কিছুতেই আসব না।" অনেকে তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না। মায়ের কানে সব ঘটনা পৌঁছিতেই মা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ও কে? গৃহস্থ! যায় এখান থেকে, যাক না। সাধু আমার জন্য সব ত্যাগ করে এখানে রয়েছে।" অথচ যাঁহাকে মা এইরূপ তিরস্কার করিলেন, ঠাকুরের স্ত্রীভক্তদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। জনৈক ত্যাগী ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, সন্ন্যাসীই হোক, আর গৃহস্থই হোক, ঠাকুরের যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা সবই ত সমান—কারণ সকলেই মুক্ত হবে?" মা বলিলেন, "সে কি! ত্যাগী আর গৃহস্থ কি সমান? ওদের কামনা বাসনা কত কি রয়েছে, আর এরা তাঁর জন্য সব ছেড়ে চলে এসেছে। এদের আর তিনি ভিন্ন কি আছে? সাধুদের সঙ্গে কি ওদের তুলনা হয়?"

যুবক ভক্তেরা অনেক সময় মাকে জিজ্ঞাসা করিত, "বিবাহ করিব কি না?" তিনি মন বুঝিয়া কাহাকেও বলিতেন, "সংসারীদের কত কষ্ট! তোমরা হাঁপ ছেড়ে ঘুমিয়ে বাঁচবে।" কাহাকেও বা বলিতেন, "আমি ও সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে পারব না। বিয়ে করে যদি অশান্তি হয়, তখন বলবে, 'মা, আপনি বিয়ে করতে মত দিয়েছিলেন'।" আবার জনৈক ভক্ত যখন বলিল, "না, আমি বিয়ে করব না," তখন মা হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "সে কি গো? সংসারে সবই দুটি দুটি। এই দেখ না, চোখ দুটি, কান দুটি, হাত দুটি, পা দুটি—তেমন পুরুষ ও প্রকৃতি।" বাস্তবিক সে ভক্তটি পরে বিবাহ করিয়াছিল। আবার কেহ হয়তো লিখিয়াছে, "মা, আমার বিয়ে করতে ইচ্ছা নেই, বাড়ীতে বাপ মা জোর করে বিয়ে দিতে চায়।" মা শুনিয়াই বলিলেন, "দেখ, দেখ, কি অত্যাচার!" একবার একটি

ভক্ত মাকে গিয়া বলিল, "মা, আমি এতকাল বিয়ে না করে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম। এখন দেখছি পেরে উঠব না" ইত্যাদি। মা তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি? ঠাকুরের কত গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন। তোমার কোন ভয় নেই—তুমি বিয়ে করবে।" এই বলিয়া তাহাকে খুব আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতেই মা খুব খুশি হইয়াছিলেন। নিবৃত্তির দিকে যাহাদের একটুও স্পৃহা হইয়াছে, তাহাদের বিবাহ না করাই ভাল—এইরূপ উপদেশ মা প্রায়ই দিতেন। মেয়েদের মধ্যেও যাহাদের বিবাহে তেমন ইচ্ছা নাই, মা-তাহাদিগকে নিবৃত্তির উপদেশই দিতেন। একবার জনৈক ভক্তের কন্যা বিবাহে রাজি না হওয়ায় তাহার মাতা শ্রীশ্রীমাকে সব নিবেদন করিলেন, যাহাতে তিনি মেয়েটিকে বিবাহের আদেশ দেন। তদুত্তরে মা বলিলেন, "সারা-জীবন পরের দাসত্ব করা, পরের মন যোগান, এ কি কম কষ্টের কথা!" তারপর এই মর্মে বলিলেন যে, যদিও অবিবাহিত জীবনে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তথাপি যাহার বিবাহে ইচ্ছা নাই তাহাকে বিবাহ দিয়া স্থায়ী ভোগে লিপ্ত করা কিছুতেই উচিত নহে।

১৩২৬ সালের পৌষ মাসে মা জয়রামবাটীতে ছিলেন। জন্ম-তিথির দিন বৈকালে তাঁহার সামান্য জ্বর হয়। মাঝে মাঝে ভাল থাকিলেও এই জ্বরে ক্রমশঃ ভুগিতে ভুগিতে মা খুব দুর্বল হইয়া পড়েন। এই অসুস্থতার মধ্যেও অনেক ভক্ত তথায় দীক্ষা লইতে গিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছেন। হয়তো একবার জ্বর হইয়া গেল; জ্বর ছাড়িতেই—অন্নপথ্য পাইবার পূর্বেও মা দীক্ষা দিয়াছেন, কারণ ভক্তেরা কত আশা করিয়া তাঁহার নিকট যাইতেন। কলিকাতা আসিবার দুই-এক দিন পূর্বে মা সিংহবাহিনীকে প্রণাম

করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখন এত দুর্ব্বল হইয়াছেন যে ঐটুকু গিয়া ফিরিয়া আসিতেই অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করেন। বলিয়াছিলেন, "কাল ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল!" কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই নিজের জ্বর বা ঐরূপ অত্যধিক দুর্ব্বলতার কথা প্রকাশ করিতেন না, পাছে ভক্তদের দর্শনাদির ব্যাঘাত হয়, অথবা তাঁহার জন্য অপরে ভাবিত হয়।

তাঁহার এইরূপ অসুখের সংবাদ পাইয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইলেন। ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগে মা কলিকাতা পৌঁছিলেন। তখন তাঁহার শরীর অতি শীর্ণ; খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজের চিকিৎসায় কিছুদিন তাঁহার জ্বর বন্ধ থাকে। শরীর তখন অনেকটা ভাল মনে হইতেছিল। একদিন ভক্তেরা অনেকে প্রণামও করেন।

কবিরাজি ঔষধের মধ্যে একটি তিক্ত পাচন ছিল। সকালে মা তাহা খাইতেন। খুব তিক্ত বলিয়া অনেকক্ষণ ঐজন্য অস্বস্তি বোধ করিতেন, এমন কি দ্বিপ্রহরে আহারের সময়ও যেন মুখে সেই তিক্ত স্বাদ বোধ হইত; তাই ভাত খাইতে পারিতেন না। ঔষধ-বদলানর কথায় কবিরাজ বলিলেন যে ঐ রোগের তিক্ত ছাড়া তাঁহার ঔষধ নাই। তখন কবিরাজির পরিবর্তে ডাক্তারি চিকিৎসা আরম্ভ হয় এবং ডাক্তার বিপিন ঘোষকে দেখান হয়। জ্বরও পুনরায় দেখা দিল। বিপিন বাবু প্রায় দেড় মাস চিকিৎসা করেন।

তারপর ডাক্তার প্রাণধন বসুকে দেখান হয়। এই সময় ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য্য ও ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও এক এক দিন আনা হয়। নীলরতন বাবু কালাজ্বর বলিয়া নির্দেশ করেন। প্রাণধন বাবু খুব যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

দুই-তিন দিন আসিবার পর বলিলেন, "আমাকেও আপনাদের মায়ের একজন সেবক মনে করবেন।" মা তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন; তাঁহার জন্য আম, লিচু প্রভৃতি পাঠাইয়া দিতে বলিতেন। রোগের উপশম না হওয়ায় পুনরায় কবিরাজি চিকিৎসা আরম্ভ হয় এবং শ্রীযুত শ্যামাদাস বিশেষ অসুস্থ থাকায় কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন দেখিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুত কালীভূষণ সেন ও শ্রীযুত রাম কবিরাজকেও আনা হইত।

কিছুতেই কিছু হইল না। রোগ দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। প্রত্যহ তিন-চার বার করিয়া জ্বর উঠিত। পিত্তপ্রধান জ্বর, শরীরে অসহ্য জ্বালা হইত। মা বলিতেন, "পানাপুকুরের জলে গা ডুবিয়ে থাকব।" বরফে হাত রাখিয়া আমরা সেই হাত মায়ের শরীরে বুলাইয়া দিতাম। জ্বরবৃদ্ধির সময় প্রায়ই হুঁশ থাকিত না। তখন গ্রীষ্মকাল। একদিন দ্বিপ্রহরে বহুদূর গিয়া তবে বরফ পাওয়া গেল। আসিয়া দেখিলাম অসহ্য গাত্রদাহ। বরফ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া তাহার উপর মায়ের হাত রাখিয়া দিতেই মা আরাম পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও রাসবেহারী, তুমি এ কোথায় পেলে!" গাত্রদাহের জন্য, যাহাদের গা ঠাণ্ডা তাহারা কাছে গেলেই মা তাহাদের গায়ে হাত রাখিতেন। ভুগিয়া ভুগিয়া তিনি যেন ছেলেমানুষের মত হইয়া গিয়াছিলেন। একদিন সকালবেলা আমাকে ডাকাইলেন। আমি যাইবামাত্র বলিলেন, "আমাকে কোলে করে বস।" এই দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতে থাকিতে রোগের যন্ত্রণা শরীরে যেন আর সহ্য হইতেছে না। সরলা কাছে ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, "মাকে একটু কোলে করে বস। তোমরা মেয়েছেলে।" তিনি চুপ করিয়া থাকায় শেষে বালিশ উঁচু করিয়া

তাহাই ঠেসান দিয়া মাকে বসাইয়া গায়ে ও মুখে একটু হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা করিলাম।

এইরূপ অসুখের মধ্যেও, সকালবেলা কবিরাজের নিকট যাইবার পূর্ব্বে রোগের বিবরণ লইতে যখন মায়ের কাছে যাইতাম, তিনি বলিতে ভুলিতেন না, "খেয়ে যাও, বেলা হবে।" কবিরাজেরা দেখিয়া যাইবার পর প্রায়ই বলিতেন, "বুড়োর (৺দুর্গাপ্রসাদ সেনের) নাতিকে (কবিরাজ কালীভূষণকে) জল খেতে দাও, সন্দেশ দাও, আম দাও। রাম কবিরাজকে দাও, বুড়ো কবিরাজকে (শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ সেনকে) দাও।" ডাক্তার কাঞ্জিলাল, দুর্গাপদ, শ্যামাপদ প্রভৃতি যে কেহ আসিতেন, মা সকলেরই কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন আরামবাগ হইতে প্রভাকর বাবু ও মণীন্দ্র বাবু আসিয়াছেন। খুব ক্ষীণস্বরে থামিয়া থামিয়া মা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাল আছ, বাবা? বাঁচব কি? কিছু খেতে পারি না, বড় দুর্বল। বরদা (শ্রীশ্রীমার ভাই) (মারা) গিয়েছে।" দেশেরও খবর লইতেছেন, "জল হয়েছে কি?" মণীন্দ্র বাবু বলিলেন, "না মা।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে প্রসাদ পাবে ত?" মণীন্দ্র বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" রমণী নামক একটি স্ত্রীলোক দ্বারা তিনি শ্রীশ্রীমায়ের জন্য কচি তাল পাঠাইয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকটি মণীন্দ্র বাবুর প্রেরিত জিনিষপত্র লইয়া কয়েকবার জয়রামবাটীও গিয়াছিল। মা তাহার কথায় বলিলেন, "রমণী কখন এসেছিল জানি না; জ্বরে হুঁশ ছিল না। তাকে বলো, সে যেন মনে দুঃখ না করে।" কাশী হইতে শান্তানন্দ স্বামী প্রভৃতি যিনি যখন আসিয়াছেন সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "লাটু কেমন আছে?" মা অসুখে পড়িয়া শুনিয়াছিলেন, পূজনীয়

লাটু মহারাজের খুব অসুখ। কাশী হইতে ইঁহারা যখন আসেন তখন লাটু মহারাজের শরীর গিয়াছে। এ দুঃসংবাদ তাঁহাকে শুনান হয় নাই। বোধ হয় মা অন্তরে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাই বারবার তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন।

নবাসনের বউ এবং সরলা মার খুব সেবা করিয়াছিলেন। যতক্ষণ কিছুমাত্র সামর্থ্য ছিল, মা কাহাকেও সেবা করিতে দিতে এতই সঙ্কুচিত হইতেন যে তাঁহার সেবা করার সুযোগই হইত না। এই শেষ অসুখের সময় একদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় মায়ের পথ্য হইয়া গিয়াছে, তক্তাপোষের উপর আড়ভাবে শুইয়া আছেন। একটু ঘুম পাড়াইবার জন্য হাওয়া করিতেছিলাম। চার-পাঁচ মিনিট পরেই বলিলেন, "আর না, তোমার হাত ব্যথা করছে।" আমি বলিলাম, "না, মা, এ হাতপাখা, আমার একটুও হাত ব্যথা করছে না। করলে আমি আপনিই থামব।" একটু চক্ষু বুজিয়া থাকিয়াই আবার বলিলেন, "না, বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে। থাক্, আমি অমনি ঘুমুচ্ছি।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই আবার বলিলেন, "বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে ভেবে আমার ঘুম আসছে না। তুমি পাখা বন্ধ কর, তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই।" অগত্যা আমি পাখা বন্ধ করিলাম। মা'ও চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। বোধ হয় দশ মিনিটও হাওয়া করা হইল না।

ক্রমশঃ অসুখ খুব বাড়িতে লাগিল। ঘরের তক্তাপোষ সরাইয়া দিয়া মেঝেতেই বিছানা করা হইল। এ রোগ যে সারিবে না, মা তাহা জানিতেন বলিয়াই মনে হয়। পূর্ববারের অসুখের পর বলিয়াছিলেন, "আবার ত সেই রকম ভুগতে হবে।" জীবের কল্যাণের জন্য যে রাধুর মায়া অবলম্বন করিয়া তিনি ঠাকুরের

অদর্শনের পরও এই দীর্ঘকাল বর্তমান ছিলেন, সেই রাধুর সম্পর্কও তিনি ছিন্ন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "কুটোছেঁড়া করে দিয়েছি।" একদিন অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়াছিলাম, "মা, তুমি ত ইচ্ছা করলেই থাকতে পার।" তাহাতে শুধু বলিলেন, "মরতে কার সাধ ? " তাঁহার নিজের ইচ্ছা বলিয়া কিছু ছিল না। বলিতেন, "ঠাকুর যখন নিয়ে যাবেন, যাব।"

ক্রমে রক্তহীনতায় হাতে পায়ে শোথ দেখা দিল। উঠিবার শক্তি না থাকায় বিছানাতেই শৌচাদি করান হইত। শ্রীমতী সুধীরা ও নিবেদিতা স্কুলের মেয়েরা পালা করিয়া থাকিয়া সব সময়ে পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। ভাল ব্রাহ্মণের দ্বারা যথাবিহিত শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদিও করান হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন দুই মাস পূর্ব হইতেই বলিয়াছিলেন, "আপনাদের ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ দিতে পারেন, কারণ এ রোগে আর আশা নাই।" দেহ যাইবার পাঁচ দিন মাত্র বাকি আছে। জনৈক স্ত্রী-ভক্ত (অন্নপূর্ণার মা) দেখিতে আসিয়াছেন। ভিতরে যাইতে নিষেধ বলিয়া তিনি ঠাকুরঘরের দুয়ারেই বসিয়াছিলেন। হঠাৎ পাশ ফেরায় মা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া হাতে ইশারা করিয়া কাছে ডাকিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "মা, আমাদের কি হবে ?" চিরকরুণাময়ী অভয় দিয়া ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি ? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কি ?" একটু পরে আবার ক্ষীণকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "তবে একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, মা ; জগৎ তোমার।"

যাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া মা স্বয়ং তাহাদের পাপভার গ্রহণপূর্বক এই দুঃসহ রোগযাতনা ভোগ করিলেন, তাহাদের প্রতি ইহাই তাঁহার শেষ বাণী। ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, রাত্রি দেড়টার সময় ভক্তসন্তানগণকে কাঁদাইয়া তিনি মহাসমাধিযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মিলিত হইলেন। পরদিন বেলুড় মঠে তাঁহার দিব্যদেহের যথারীতি সৎকার করা হইল। শ্রীশ্রীমায়ের স্থূলদেহ লোকচক্ষুর অন্তরাল হইলেও সূক্ষ্মশরীরে তিনি প্রতি ভক্তের হৃদয়মন্দিরে চিরবিরাজমানা রহিয়াছেন।

স্বামী অরূপানন্দ

শ্রীশ্রীমার কোষ্ঠী

(শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ-কৃত)

শুভমস্তু, শকাব্দাঃ ১৭৭৪।৮।৭।২৮।৩০

জাতাহঃ			পরাহঃ		
দিবা ২৬।২৩			দিবা ২৬।২২		
রাত্রি ৩৩।৩৭			রাত্রি ৩৩।৩৮		
৫	১১	৩	৬	১২	৪
২২	১৯	৩৯	২৩	২০	৩৫
৫০	৫৮	২৫	৪৮	১১	৪
০	০	৮	৮	২	৯

শ ত রা ৪ লং অং ১৯।৩০	০	০ ০
০		উঃ শু ২৩
চং ১২ মং ১১ ০	০	র ১৯ অঃ বৃ ১৯ কে ১৮ উঃ বৃ ১৮ হোরা ২০
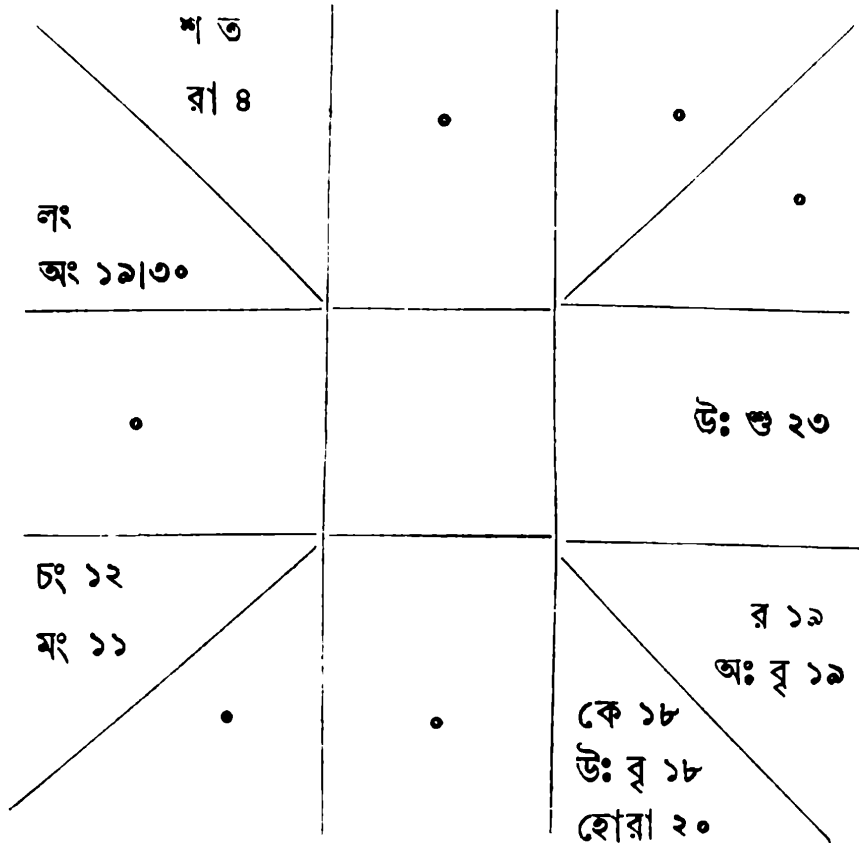
এতচ্ছকীয়সৌরপৌষস্যাষ্টমদিবসে, গুরুবাসরে, কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তম্যাস্তিথৌ, উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রস্য প্রথমচরণে, আয়ুষ্মদ্‌যোগে, ববকরণে, এবং পঞ্চাঙ্গসংশুদ্ধে রাত্রিনবমপলাধিকদ্বিতীয়দণ্ডসময়ে, অয়নাংশোদ্ভবশুভমিথুনলগ্নে (লগ্নস্ফুটরাশ্যাদয়ঃ ২।১৯।৩০।০), বুধস্য ক্ষেত্রে, রবের্হোরায়াং, শুক্রস্য দ্রেক্কাণে, শুক্রস্য সপ্তাংশে, গুরোর্নবাংশে, শনৈশ্চরস্য দ্বাদশাংশে, গুরোস্ত্রিংশাংশে, এবং সপ্তবর্গপরিশোধিতে বৃহস্পতের্যামার্দ্ধে, রবের্দণ্ডে উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিতসিংহরাশিস্থিতে চন্দ্রে, অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়মহোদয়স্য শুভা প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সারদামণিদেবী সমজনি।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

জয়রামবাটীতে প্রথম দর্শন। ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭।

শিবচতুর্দ্দশীর পূর্ব তৃতীয়া, সকাল প্রায় সাড়ে আটটা।

বরদা মামা আসিয়া সংবাদ দিলেন, "মা ডাকছেন।"

বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি মা তাঁহার ঘরের ভিতরে দুয়ারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। প্রণাম করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে এসেছ ?"

আমি জেলার নাম বলিলাম।

মা—এখন বুঝি ঠাকুরের কথাটথা নিয়েই আছ ?

আমি ঐকথার কোন উত্তর দিলাম না। যেন পূর্ব্বপরিচিতের মত কথাবার্ত্তা। সেই সস্নেহ দৃষ্টি আমার এখনও মনে পড়িতেছে।

মা—তুমি কায়স্থ ? (আমার সব শরীর কিন্তু শীতকাল বলিয়া র‍্যাপারে ঢাকা।)

আমি—হাঁ।

মা—তোমরা কটি ভাই ?

আমি—চার ভাই।

মা—বস, জল খাও।

এই বলিয়া নিজেই বারান্দায় আসন পাতিয়া দিয়া রাত্রের প্রসাদী লুচি ও গুড় একটা বাটিতে করিয়া আনিয়া দিলেন।

পূর্ব্বদিন তারকেশ্বর হইতে হাঁটিয়া গিয়াছি। সন্ধ্যায় দেশড়া (জয়রামবাটীর উত্তর পাশের গ্রাম) পৌঁছি। সঙ্গে দেশড়ার একটি ছেলে (গোবিন্দ রায়ের বড় ছেলে)। তাহার সঙ্গে হরিপাল ষ্টেশনে আলাপ হয়। রাত্রিতে তাহাদের বাড়ীতে ছিলাম।

মা এই সব শুনিলেন এবং আমার খাওয়ার পর বলিলেন, "স্নান করো না। অনেক পথ হেঁটে এসেছ।" পান দিলেন।

মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগ হইতেই আমাকে ডাকাইলেন এবং প্রথমেই খাইতে দিলেন। নিজেই শালপাতায় ভাত তরকারী সব বাড়িয়া দিয়া গেলেন। আমি মায়ের ঘরের বারান্দায় বসিয়া খাইতেছি। খাওয়ার সময় মা বলিলেন, "পেট ভরে খেও, জান?" খাওয়ার পর পান দিলেন।

বৈকালে তিন-চারিটার সময় বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি মা ময়দা মাখিতেছেন। তাঁহার ঘরের বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পূর্ব্বমুখে পা মেলিয়া বসিয়াছেন। পাশেই ছোট উনুন, বৈকালে লুচি তরকারী ইত্যাদি সেখানেই

রান্না হয়। আমাকে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও ?"

আমি—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মা—কি কথা ? বস।

এই বলিয়া বসিতে আসন দিলেন।

আমি—মা, এই যে ঠাকুরকে সকলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে, তুমি কি বল ?

মা—হাঁ, তিনি আমার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

'আমার' বলায় আমি বলিলাম, "তা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই স্বামী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। আমি সে ভাবে জিজ্ঞাসা করছি না।"

মা—হাঁ, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বামিভাবেও, এমনি ভাবেও।

তখন আমার মনে হইল, তিনি পূর্ণব্রহ্ম হইলে মা জগদম্বা স্বয়ং—যেমন সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন। আমিও এই বিশ্বাস লইয়াই মাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে যে তোমাকে এই দেখছি যেন সাধারণ স্ত্রীলোকের মত বসে বসে রুটী বেলছ, এসব কি ? মায়া, না কি ?"

মা—মায়া বই কি ! মায়া না হলে আমার এ দশা কেন ? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।

বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "ভগবান নরলীলা করতে ভালবাসেন কি-না। শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে ছিলেন। রাম দশরথের বেটা।"

আমি—তোমার কি আপনার স্বরূপ মনে পড়ে না?

মা—হাঁ, এক একবার মনে পড়ে; তখন ভাবি, এ কি করছি, এ কি করছি! আবার এই সব বাড়ীঘর, ছেলে-পিলে (হাত চিৎ করিয়া সামনের সব দেখাইয়া) মনে আসে ও ভুলে যাই।

আমি প্রায় রোজই সন্ধ্যার পর মায়ের ঘরে গিয়া বসিতাম, মা খাটে শুইয়া থাকিয়া কথাবার্তা বলিতেন। রাধু (মায়ের ভাইঝি) মায়ের পাশে ঘুমাইয়া থাকিত। ঘরে পিলসুজের উপর প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিত। কোন কোন দিন ঝিকে মায়ের পায়ে বাতের তেল মালিশ করিতে দেখিতাম।

কথাপ্রসঙ্গে মা বলিতেছেন, "যখন আমার কোন ভক্তকে মনে পড়ে, আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখন হয় সে নিজে আসে, নয় তার চিঠিপত্র আসে।

"এই যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে এসেছ। হয়ত জগন্মাতা * ভেবে এসেছ।"

---

* শ্রীশ্রীমা নিজের সম্বন্ধে কদাচিৎ এই ভাবের কথা বলিতেন। পরে শিবু-দাদার মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর একবার মা কামারপুকুর

আমি—তুমি কি সকলেরই মা ?

মা—হাঁ।

আমি—এই সব ইতর জীবজন্তরও ?

মা—হাঁ, ওদেরও।

আমি—তবে ওরা এত কষ্ট পাচ্ছে কেন ?

মা—ওদের এসব জন্ম এই-ই (অর্থাৎ ইতর জীবজন্তর এই সকল জন্মে এই প্রকারই হইয়া থাকে)।

মাকু (মায়ের আর এক ভাইঝি) ও রাধু পাঠশালে যাইত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা আসিলে মা আগে তাহাদের খাওয়াইতেন। একদিন গিয়া দেখি মা তাহাদের খাওয়াইতেছেন। আমি বলিলাম, "কি হচ্ছে ?"—তখন একটু একটু পশ্চিম বঙ্গের কথা বলিতে শিখিয়াছি।

হইতে জয়রামবাটী আসিতেছিলেন। সঙ্গে শিবুদাদা (তখন ছেলে মানুষ) কাপড়ের পুঁট্‌লী লইয়া। জয়রামবাটীর প্রায় কাছে মাঠের মধ্যে আসিয়া শিবুদাদার হঠাৎ কিরূপ মনে হওয়ায় দাঁড়াইয়া পড়েন। মা কিছুদূর আসিয়া পিছনে কাহারও পায়ের শব্দ শুনিতে না পাইয়া ফিরিয়া দেখেন, শিবুদাদা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মা বলিলেন, "ও কিরে, শিবু, এগিয়ে আয়।" শিবুদাদা বলিলেন, "একটি কথা বলতে পার, তাহলে আসতে পারি।" মা— "কি কথা ?" শিবুদাদা— "তুমি কে, বলতে পার ?" মা—"আমি কে ? আমি তোর খুড়ী।" শিবুদাদা— "তবে যাও, এই ত বাড়ীর কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।" (এদিকে বেলা শেষ হইয়াছে।) মা—"দেখ দেখি, আমি আবার কে রে ? আমি মানুষ, তোর খুড়ী।" শিবুদাদা—"বেশ ত, তুমি যাও না।" শিবুদাদাকে না যাইতে দেখিয়া মা শেষে বলিলেন, "লোকে বলে কালী।" শিবুদাদা—"কালী ত ? ঠিক ?" মা—"হাঁ।" শিবুদাদা—"তবে চল।" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জয়রামবাটী যাইলেন।

মা হাসিয়া আমার 'হচ্ছে' কথাটির উচ্চারণ নকল করিয়া বলিলেন, "বালিকাভোজন হচ্ছে।"

সন্ধ্যার পর মায়ের ঘরে কথাবার্ত্তা হইতেছে।

মা—এই যে তোমরা এসেছ; আপনার না হলে আসবে কেন?

আমি—আমি কি তোমার আপনার?

মা—হাঁ, আপনার বই কি, "যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার" (যে যাহার আপনার জন সে তাহার সহিত যুগে যুগে আসে)।

কিছুক্ষণ কথার পর বলিতেছেন, "আবার সূক্ষ্ম শরীরে দেখা হবে।" বুঝিলাম, দেহান্তে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে।

আমি—মা, আমি গত আশ্বিন মাসে এখানে আসব বলে হাওড়া ষ্টেশনে এক রাত্রি শুয়েই কাটালাম। পর দিনও বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ষ্টেশনে। টিকিট আর কাটতে পারছি না। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য ধর্ম্মঘট করায় কেরানীরা আসে নাই, কাজকর্ম্ম বন্ধ। মিনিট কয়েক থাকতে একটি মেম-কেরানী এল। তখন টিকিটের জন্য লাঠালাঠি। পূজার সময় কি না! টিকিট কিনতে না পেরে বাসায় ফিরে যাই। শেষে বাড়ীর চিঠি পাই, এক ভাইয়ের খুব অসুখ। তাই বাড়ী ফিরে গেলাম, সেবার আসা হল না।

মা—একটা যোগাযোগ হওয়া চাই, তবে দেখা হয়।

আমি—সকলে তোমায় 'আপনি' বলেন, আমি কিন্তু বলতে পারলাম না, আমার মুখে এল না।

মা—তা ভাল। এ খুব আপনা-আপনি ভাব।

আমি কথায় কথায় বলিলাম, "মা, তুমি যাদের মন্ত্র দিয়েছ তাদের ভার ত তুমি নিয়েছ। তবে আমাদের কথা বললে 'ঠাকুরের কাছে বলব' এ কথা বল কেন? আমাদের ভার তুমি নিতে পার না?" (আমার তখনও মন্ত্রের আবশ্যকতা বোধ হয় নাই, তাই ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম)।

মা—তোমার ত ভার নিয়েছি।

আমি—মা, আশীর্ব্বাদ কর যেন শুদ্ধ মন আর অনুরাগ হয়। মা, আমি একটি ছেলের সঙ্গে পড়েছি, তাকে যা ভালবাসতাম, তার সিকি ভালবাসাও যদি ঠাকুরের প্রতি হত, তা হলেও সন্তুষ্ট হতাম।

মা—আহা, তাই ত; আচ্ছা, ঠাকুরের কাছে বলব।

আমি—কেবল 'ঠাকুরের কাছে বলব' বলছ কেন? তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন? তুমি আশীর্ব্বাদ করলেই হবে।

মা—বাবা, তোমার পূর্ণজ্ঞান আমার আশীর্ব্বাদে যদি হয়, আমি হাড় ভেঙ্গে আশীর্ব্বাদ করব।

মানুষের কি সাধ্য যে আপনি এ মায়ার হাত থেকে

তরতে পারে ? তাই ত ঠাকুর এত সাধনা করলেন, সব ফল জীবোদ্ধারে দিয়ে গেলেন।

আমি—তাঁকে না দেখলে কি করে ভালবাসা যায় ?

মা—তাই ত, হাওয়ার সঙ্গে কে ভাব করতে পারে ?

আমি—মা, কবে ঠাকুরের দেখা পাব ?

মা—পাবে পাবে, সময় হলেই ঠাকুরের দেখা পাবে।

অন্য একদিন সন্ধ্যার পর মা শুইয়া আছেন। কামিনী ঝি মায়ের পায়ে (হাঁটুতে) বাতের তেল মালিশ করিতেছে।

মা বলিলেন, "দেহ একটি, দেহী একটি। দেহী সব শরীর জুড়ে রয়েছেন, তাই পায়ে ব্যথা। যদি এখান (হাঁটু) থেকে মন তুলে নিই, তা হলে আর বেদনা নেই।"

আমি মন্ত্রদীক্ষার কথা তুলিয়া বলিলাম, "আচ্ছা মা, মন্ত্র নেবার কি দরকার ? মন্ত্রজপ না করে কেউ যদি 'মা কালী, মা কালী' বলে ডাকে, তাতে হয় না ?"

মা—মন্ত্রের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়। ভগবানের মন্ত্র জপ করে মানুষ পবিত্র হয়। ইহা বলিয়া একটি গল্প বলিলেন—

নারদ বৈকুণ্ঠে গিছলেন। বসে ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কথা কইলেন। নারদ যখন চলে গেলেন ঠাকুর লক্ষ্মীকে বললেন, 'ওখানে গোবর দাও।' লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলেন,

'কেন ঠাকুর ? নারদ যে পরম ভক্ত, তবে কেন এরূপ বলছ ।' ঠাকুর বললেন, 'নারদের এখনও মন্ত্র নেওয়া হয় নি । মন্ত্র না নিলে দেহ শুদ্ধ হয় না ।'

অন্ততঃ দেহশুদ্ধির জন্যও মন্ত্র দরকার । বৈষ্ণবেরা মন্ত্র দিয়ে বলে, "এখন মন তোর ।" তাই ত—

"মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কানে ।
জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে ॥"

মনেতেই সব । মন শুদ্ধ না হলে কিছুই হয় না ।

"গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, এ তিনের দয়া হল ।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল ॥"

একের কিনা মনের । নিজ মনের কৃপা হওয়া চাই ।

আমি—মা, আমার কিন্তু জপতপে প্রবৃত্তি নেই ।

মা—হয়ত তোমার পূর্ব্ব জন্মে ও সব করা আছে ।

বাঙ্গলায় তখন খুব স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে । তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, এ দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা কি দূর হবে না ?"

মা—ঠাকুর ত এসেছিলেনই তার জন্যে ।

মায়ের মাতার কথা উঠিল । মা বলিতেছেন, "মা ছিলেন—কোন ভক্ত এলে 'নাতিন এসেছে, নাতিন এসেছে' বলে কত খুসী হতেন, কত যত্ন করতেন । এ সংসারটি ছিল যেন তাঁর গায়ের রক্ত । কত করে এটি

ঠিকঠাক রাখতেন। আমার মায়ের নাম ছিল শ্যামা।" (দিদিমা পূর্ব্ব বৎসর—১৯০৬ সনের গোড়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন)।

ঠাকুরকে দর্শনের কথা বলিলেন—

"যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল আমিও চলে যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকী আছে।' শেষে দেখলুম, তাই ত অনেক কাজ বাকী।

"তিনি বলতেন, 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল্ করছে। তুমি তাদের দেখবে।'

"তিনি শত বৎসর সূক্ষ্ম শরীরে ভক্তহৃদয়ে বাস করবেন বলেছেন। আর তাঁর অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবে।

"যখন ঠাকুর চলে গেলেন, প্রথম প্রথম ভয় হত। পরণে লাল কাপড় (সরু লালপেড়ে কাপড়), হাতে বালা—লোকে কি বলবে। তখন কামারপুকুরে রয়েছি। তারপর ঠাকুরের দেখা পেতে লাগলুম। তখন সে সব ভয় ক্রমে দূর হল। একদিন ঠাকুর এসে বললেন, 'খিচুড়ী খাওয়াও।' খিচুড়ী রেঁধে রঘুবীরকে ভোগ দিলুম। মারওয়াড়ী (অর্থাৎ হিন্দুস্থানী) কিনা, তাই খিচুড়ী। তারপর বসে ভাবে ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগলুম।

"হরিশ এই সময় কামারপুকুরে এসে কিছুদিন ছিল। একদিন আমি পাশের বাড়ী থেকে আসছি। এসে বাড়ীর ভিতর যেই ঢুকছি, অমনি হরিশ আমার পিছু পিছু ছুটছে। হরিশ তখন ক্ষেপা। পরিবার পাগল করে দিয়েছিল। তখন বাড়ীতে আর কেউ নেই। আমি কোথায় যাই। তাড়াতাড়ি ধানের হামারের (তখন ঠাকুরের জন্মস্থানের উপর ধানের গোলা ছিল) চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। সাতবার ঘুরে আর আমি পারলুম না। তখন নিজ মূর্ত্তি এসে পড়ল। আমি নিজ মূর্ত্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে, গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙ্গুল লাল হয়ে গিছল। তারপর নিরঞ্জন এলে তাকে বললুম, 'ওকে পাঠিয়ে দাও'।"

যোগীন মহারাজের কথা উঠিল। মা বলিলেন, "যোগীনের মত আমাকে কেউ ভালবাসত না। আমার যোগীনকে কেউ যদি আট আনার পয়সা দিত, সে রেখে দিত ; বলত, 'মা তীর্থে টীর্থে যাবেন, তখন খরচ করবেন।' সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে থাকত। মেয়েদের কাছে থাকত বলে ওরা (ছেলেরা) সকলে তাকে ঠাট্টা করত।

"যোগীন আমাকে বলত, 'মা, তুমি আমাকে যোগা, যোগা বলে ডাকবে।' যোগীন যখন দেহ রাখলে, সে

বললে, 'মা, আমায় নিতে এসেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ঠাকুর'।"

আমি মাকে বললাম, "কোন্ কোন্ ভক্ত কে কে, আমাকে বলতে হবে।"

মা—কাউকে না বলতে পার ?

আমি—তা, তুমি দেখবে যাতে কাউকে না বলি।

বলিয়াই ভাবিলাম, হয়ত কাহাকেও বলিয়া ফেলিব, কথা রক্ষা হইবে না। তাই তখনই বলিলাম, "তবে থাক্।"

মা—যোগীনকে অর্জ্জুন বলতেন। নরেনকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন। ঈশ্বরকোটীর পূর্ণ। শরৎ আর যোগীন এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।

এইরূপ দুই-এক জনের কথা আপনা হইতেই বলিলেন।

নিজের কথা বলিতেছেন—"বলরাম বাবু বলতেন, 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী'।" বলিয়াই আবার বলিলেন, "দয়া যার শরীরে নেই, সে কি মানুষ ? সে ত পশু। আমি কখনও কখনও দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই, ভুলে যাই যে আমি কে।"

কথাবার্ত্তার শেষে মা বলিলেন, "বাবা, তোমার সঙ্গে আমার যেমন খোলাখুলি কথা হয়েছে এমন আর

কারও সঙ্গে হয়নি।" পরে মা বলিলেন, "আমি যখন কলকাতায় যাব তখন তুমি আসবে, আমার কাছে থাকবে।"

যদিও আমার ভিতরে ভিতরে সাধু হইবার খুব ইচ্ছা, তথাপি আমি তখনও বাড়ীতে থাকি। মনে ভাবিলাম, 'হয়ত ভবিষ্যতে মায়ের ইচ্ছায় আমার তাঁহার কাছে থাকা এবং সাধু হওয়া সম্ভব হইবে।'

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশুকে চেন? কাঞ্জিলাল, কৃষ্ণলাল?"

আমি বলিলাম, "না, আমি চিনি না।"

আমি যখন জয়রামবাটী যাই তখন ছোট মামী (রাধুর মা) পাগল হইয়াছেন। রাধুর গহনাগুলি লইয়া তিনি বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। তাঁহার বাপ গহনাগুলি কাড়িয়া লইয়াছেন; তজ্জন্য আরও ক্ষেপিয়াছেন। পাগলী মামী সিংহবাহিনীর মন্দিরে "মা, গয়না দাও, মা, গয়না দাও" বলিয়া কাঁদিতেছেন। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। ঘরে মা আর আমি। কথাবার্ত্তা হইতেছে। হঠাৎ মা বলিলেন, "যাই, যাই, বাবা, ওর আমি ছাড়া কেউ নেই। পাগলী সিংহবাহিনীর কাছে গয়নার জন্য কাঁদছে।" এই বলিয়া মা চলিয়া গেলেন। আমি কিন্তু কান্না আদৌ শুনিতে পাই নাই এবং অতদূর হইতে শোনাও সম্ভব নয়।

কিন্তু তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে। সিংহবাহিনীর মন্দিরে গিয়া ক্ষেপীকে লইয়া আসিলেন।

পাগলী বলিতেছেন, "ঠাকুরঝি, তুমিই আমার গয়না আটক করে রেখেছ। তুমিই দিচ্ছ না।" মা বলিলেন, "আমার হলে আমি কাকবিষ্ঠাবৎ এই দণ্ডে ফেলে দিতুম।" ক্ষেপীর কথায় আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গিরিশ বাবু বলতেন, এটা মায়ের সঙ্গের পাগলী।"

আমার প্রথম প্রথম 'মা' বলিতে একটু লজ্জা বোধ হইত, কারণ গর্ভধারিণী মা অল্প বয়সেই চলিয়া গিয়াছেন। একদিন সকালবেলা আমাকে দিয়া এক জ্ঞাতি-ভাইকে সংবাদ পাঠাইতেছেন। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলবে বল দেখি?" আমি বলিলাম, "তিনি আপনাকে এই এই বলতে বললেন।" শুনিয়া মা বলিলেন, "বলবে, মা বললেন।" 'মা' শব্দটী জোর দিয়া উচ্চারণ করিলেন।

একদিন বেলা আটটা-নয়টার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। উঠানে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া অনন্যদৃষ্টিতে মাকে দেখিতেছিল। মা আসিতে আসিতে হঠাৎ ছেলেটির দিকে ফিরিয়া আসিয়া সস্নেহে তাহার চিবুকে হাত দিয়া সহাস্যে আমাকে বলিলেন, "এটি আমার গণেশ।" বোধ হইল, ছেলেটি কোন ভক্ত বা আত্মীয় হইবে।

একদিন সকালে মায়ের ঘরের বারান্দায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' পাঠ হইতেছিল। আমি পড়িতেছিলাম এবং মা ও আরও দুই-এক জন শুনিতেছিলেন। বিবাহের অংশটি পড়া হইতেছিল। সেখানে মাকে 'জগন্মাতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া খুব প্রশংসা ছিল; মা উহার খানিকটা শুনিয়াই উঠিয়া গেলেন। ইহারই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহাকে মাঘ মাসের 'উদ্বোধন' হইতে পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। মা একমনে শুনিতেছিলেন। ইহাতে মাষ্টার মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' কিয়দংশ বাহির হইয়াছে। আর কেহ তথায় ছিল না। এক স্থানে পড়িতেছিলাম—

"গিরিশ—একটি সাধ।

ঠাকুর—কি?

গিরিশ—অহেতুকী ভক্তি।

ঠাকুর—অহেতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটীর হয়, জীবকোটীর হয় না।"

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, জীবকোটীর হয় না, ঈশ্বরকোটীর হয়, এর মানে কি?"

মা—ঈশ্বরকোটী পূর্ণকাম কিনা, তাই অহেতুক। কামনা থাকতে অহেতুক ভক্তি হয় না।

আমি—মা, তোমার এই সব বিশেষ ভক্তরা ও ভাইরা—এঁরা কি সমান?

আমার মনের ভাব এই যে, ভাই হইয়া যখন জন্মিয়াছেন, তখন ইহারাও উচ্চ আধার ও অন্তরঙ্গ হইবেন, যেমন মঠের মহারাজরা।

মা তদুত্তরে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যেন কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! শুধু ভাই হইলে কি হইবে? অন্তরঙ্গ পৃথক্ বস্তু।

একদিন সকালে ধানভানা হইতেছিল; মা উহাতে সাহায্য করিতেছিলেন। প্রায় রোজই ঐরূপ করিতেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মা, তোমার এত খাটুনি কেন?" মা বলিলেন, "বাবা, আদর্শ হিসাবে যা করতে হয় তার ঢের বাড়া (বেশী) করেছি।"

একদিন রাত্রে সকলে ঘুমাইতেছেন। নলিনীর (মায়ের আর একটি ভাইঝি) স্বামী গরুর গাড়ী লইয়া উপস্থিত; নলিনীকে লইয়া যাইবে। সে শ্বশুরবাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং ফিরিয়া যাইতে চাহে না; স্বামীর আগমন-সংবাদ পাইয়াই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়াছে। আত্মহত্যা করিতে চাহে। অনেক সাধাসাধির পর, তাহাকে এবার শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে না, মা এইরূপ কথা দেওয়ায় সে দরজা খুলিল। এইরূপ গোলমালে রাত্রি কাটিল। মা নলিনীর ঘরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। প্রভাত হইলে তিনি তাঁহার সম্মুখের লণ্ঠনটি নিবাইলেন;

বলিতে লাগিলেন, "গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ।"

পরে নলিনীর কথায় মা আমাকে বলিলেন, "ওর পিসীর (শ্রীশ্রীমার) বাতাস লেগেছে, বাবা, তাই যেতে চায় না।"

একদিন সকালে মা আমাকে বাড়ীর একজন পুরাতন চাকর সঙ্গে দিয়া পাগলীর বাপকে বুঝাইয়া লইয়া আসিতে, কিম্বা গহনা ফিরাইয়া দিতে রাজী হইলে উহা আনিতে, তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। আমরা গিয়া অনেক অনুনয় করায় তিনি পরদিন আসিলেন, কিন্তু গহনা আনেন নাই। মা তাঁহাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, পায়ে হাত দিয়া পর্য্যন্ত অনুরোধ করিলেন, যাহাতে তিনি গহনাগুলি ফেরৎ দেন এবং বলিলেন, "আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।" কিন্তু তথাপি সেই লোভী ব্রাহ্মণের মন গলিল না, তিনি নানা বাজে ওজর করিতে লাগিলেন।

শিবরাত্রির পূর্ব্ব দিবস আমি রওয়ানা হইব স্থির করিলাম। কারণ মঠে ঠাকুরের উৎসব দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। মাকেও তাহাই বলিয়াছিলাম। মধ্যাহ্নে ভোজনের পর মাকে প্রণাম করিতে গেলাম—রওয়ানা হইব। মা বলিলেন, "এই শশীর সঙ্গে যাবে।" শশী স্ত্রীলোক, ইহা দেখিয়া আমি একটু ভাবিতেছি। তখন মা

বলিলেন, "ও যে আমাদের শশী গো। আমার সঙ্গে থাকত দক্ষিণেশ্বরে।" শশীকে বলিলেন, "একে আমাদের ঘরে (যে ঘরে মা ও ঠাকুর কামারপুকুরে থাকিতেন) থাকতে দেবে। রামলালের মাসীকে বলে দেবে।" তখন আর কেহ ঠাকুরের বাটীতে ছিলেন না।

আমাকে বলিলেন, "কামারপুকুরে এক-আধ দিন থেকে শেষে মঠে যাবে। ঠাকুরের জন্মস্থান হয়ে যেতে হয়।" আমার কিন্তু কামারপুকুরে যাইবার কল্পনা ছিল না। আমি শুধু মাকে দেখিতেই গিয়াছিলাম। তাঁহার জন্যই ব্যাকুল হইয়া বাড়ী হইতে ছুটিয়াছিলাম; সঙ্গে কাপড়, ছাতাটি পর্য্যন্ত আনিতে ভুল হইয়াছিল। কিছু দূর আসিয়া মনে পড়িলেও আর ফিরি নাই, পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে।

আমার সঙ্গে কাপড় ছিল না, মা একখানি কাপড় পরিতে দিয়াছিলেন। বলিলেন, "ওখানা সঙ্গে নিয়ে যাও।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে টাকা আছে? গাড়ীভাড়া এসব লাগবে, টাকা নিয়ে যাও।" আমি বলিলাম, "আমার কাছে টাকা আছে, নিতে হবে না।" বলিলেন, "গিয়ে পত্র লিখবে।"

মা বলিতেছেন, "আমার ছেলেটিকে কিছুই খাওয়াতে পারলুম না, মাছ ধরাতে পারি নি।" কারণ তখন পাগলী ও নলিনীকে লইয়া বড় অশান্তি চলিতেছিল। আমি

মাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইলাম। মা সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিলেন ; পরে যতক্ষণ দেখা গেল চাহিয়া রহিলেন। মনের আবেগে কামারপুকুর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পথ আমার আর চোখের জল থামিল না।

কামারপুকুরে পৌঁছিলাম। শশী মাসীমাকে আমার পরিচয় দিল। মায়ের ঘরে মায়ের ছবি দেখিয়া প্রাণ আরও ব্যাকুল হইল। যেন বিশ্বহিতধ্যানে মগ্না মাতৃমূর্ত্তি!

রাত্রে মায়ের ঘরে শুইলাম। মাসীমা লেপ বিছানাদি দিলেন। পরদিন (শিবরাত্রির দিন) কামারপুকুরের বুড়ো শিব দর্শন করিলাম। বৈকালে মাষ্টার মহাশয় ও প্রবোধ বাবু কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, মাষ্টার মহাশয়ের (তখন চিনিতাম না) ঠাকুরের বাড়ী দেখিয়াই চক্ষে জল। গাড়ী বাড়ীর দরজায় থামিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি নাম?" তিনি বলিলেন, "আমার নাম মাষ্টার।" মাষ্টার বলাতেই চিনিলাম। 'কথামৃত' পড়া ছিল। মাষ্টার মহাশয় মায়ের জন্য মিঠাই আনিয়াছিলেন। উহা বাহিরবাড়ীর ঘরে রাখা হইল। মাষ্টার মহাশয় আমাকে বলিলেন, "দেখুন ত বাড়ীর মধ্যে গঙ্গাজল আছে কি-না।" আমি গঙ্গাজল আনিয়া দিলাম। তিনি কাপড় কম্বল প্রভৃতিতে গঙ্গাজলের ছিটা দিলেন। মায়ের জন্য খাবার লইয়া যাইতেছেন, তাই।

তাঁহারা কামারপুকুরে রঘুবীরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জয়রামবাটী রওয়ানা হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে ভূতির খালের ওপারে মাণিক রাজার আমবাগান পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে তুইজন ভারী। তখনও আমার ইচ্ছা, শীঘ্র মঠে যাইয়া উৎসব দেখিব। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ললিত বাবু—সামলা মাথায়, পেণ্টুলুন চাপকান পরা—কামারপুকুরে পৌঁছিলেন। আমি তখন খাইতেছিলাম। তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিলাম। সন্ধ্যা হইল। শশী বলিল, "তুমি ললিত বাবুর সঙ্গে যাও। ওঁদের সঙ্গেই মঠে যাবে। একা কোথা যাবে? সঙ্গে তেমন টাকা-পয়সা নেই, পথও চেন না।" আমি সম্মত হইলাম। ললিত বাবু গ্রামের তুইজন চৌকিদার ডাকাইয়া সঙ্গে লইলেন। জয়রামবাটী যাইতে মাঠে রাস্তা ভুল হইল। চৌকীদারেরা তখন রাস্তা ঠিক করিবার জন্য 'অম্বিকে' (জয়রামবাটীর চৌকিদারের নাম) বলিয়া একসঙ্গে হাঁক মারিল। জয়রামবাটীর একজন লোক কামারপুকুরের দিকে গিয়াছিল, তখনও ফিরে নাই। তাই জয়রামবাটীর লোকেরা মাঠে তাহার উপর ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া লাঠি-ঠেঙ্গা লইয়া চৌকিদার সমেত মাঠের দিকে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের সহিত আমরা জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। বাড়ীর মধ্যে গিয়া মাকে বলিলাম, "মা, এসেছি।" মা

খুব খুসী হইয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, এদের সঙ্গে যাবে।"

শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষ্যে ঘাটালের উকিল শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়াছেন। ভক্তদের কেহ কেহ উপবাস করিয়াছেন। পরদিন মধ্যাহ্নে তাঁহারা মায়ের প্রসাদ চাহিলে মা রাধুকে দিয়া একটি শালপাতায় করিয়া প্রসাদ পাঠাই-লেন। সকলে খাইতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি খাচ্ছেন?" তাঁহারা বলিলেন, "মায়ের প্রসাদ।" তখন আমিও একটু খাইলাম। মাকে গিয়া বলিলাম, "মা, এঁরা সব তোমার প্রসাদ খাচ্ছেন, তা আমাকে এত দিন দাও নাই কেন?" মা বলিলেন, "বাবা, তুমি ত চাওনি, আমি কি করে বলি?" কি নিরহঙ্কার ভাব!

পর দিবস মধ্যাহ্নে পালকী চড়িয়া ললিত বাবু রাধুর গহনা আনিতে গেলেন। তিনি কলিকাতা পুলিসের একজন খুব বড় কর্ম্মচারীর চিঠি লইয়া সরকারী লোক সাজিয়া গিয়াছিলেন। মা মাষ্টার মহাশয়কে সঙ্গে পাঠাইলেন, ললিত বাবুর ছোকরা বয়স, ব্রাহ্মণ গহনা না দিলে পাছে তাঁহার কোন অপমান করেন। কিছু বেলা থাকিতে তাঁহারা গহনা সমেত ছোট মামীর বাপকেই লইয়া উপস্থিত হইলেন।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় বাড়ীর ভিতর হইতে সংবাদ

আসিল, মায়ের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, মাথা ঘুরিতেছে। তৎক্ষণাৎ মাষ্টার মহাশয় ও আমরা কেহ কেহ বাড়ীর মধ্যে গেলাম। সকলে ঔষধ খুঁজিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় আমি গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, এমন কেন হল?" মা এতক্ষণ কাহাকেও কারণ বলেন নাই। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "ওরা ত সব চলে গেল গহনা আনতে। আমি সমস্ত দিন ভেবে ভেবে অস্থির, পাছে ব্রাহ্মণের কোনরূপ অপমান হয়। এই ভাবনায় বায়ু প্রবল হয়ে এমন হয়েছে।" আমি আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া মাষ্টার মহাশয়কে সব কথা বলিলাম। ভাবিলাম, যে ব্রাহ্মণ এত ঝঞ্ঝাট ঘটাইল, কত কষ্ট দিল, তাহার জন্য এত ভাবনা!

তৃতীয় দিন বৈকালে আমরা রওয়ানা হইলাম। মা ললিত বাবুকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "ছেলেটি খুব ভক্ত। একে সঙ্গে করে নিও।" আমরা একে একে মাকে প্রণাম করিলাম। মায়ের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল—কাঁদিতেছেন। সামনের ফটকের দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা দেশড়া হইয়া বিষ্ণুপুরের রাস্তায় আসিলাম। বিষ্ণুপুরে মাষ্টার মহাশয়, প্রবোধ বাবু প্রভৃতি লালবাঁধে মৃণ্ময়ী দেবী দেখিতে গেলেন। আমি ও ললিত বাবু ট্রেণে উঠিয়াছি। দেখি মাষ্টার মহাশয় প্রবোধ বাবুকে পাঠাইয়াছেন; তিনি

বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয় বলছেন, মৃণ্ময়ী দেখে যাবেন।" আমরা চিন্ময়ী দেখিয়া আসিয়াছি, আর মৃণ্ময়ী-দর্শনে সাধ হইল না। মঠে আসিয়া উৎসবাদি দর্শন করিয়া দেশে ফিরিলাম।

১৯০৭ সালে দুর্গাপূজার পর মাকে দর্শন করিতে কলিকাতায় আসি। একটি ভক্তের পত্রের উত্তরে মা জানাইয়াছিলেন, "আমি পূজা উপলক্ষ্যে গিরিশ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া এখন বলরামবাবুর বাড়ীতে আছি" ইত্যাদি। আমি সকালবেলা বলরামবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা কোথায়?" তিনি মস্তকে হাত দিয়া দেখাইলেন, মা মাথায়। যাহা হউক, আমি কিছুক্ষণ একা হলঘরে বসিয়া থাকিয়া ভগবানকে (শান্তিরাম বাবুর পুত্র) আমার নাম বলিয়া দিয়া মাকে সংবাদ পাঠাইলাম। মা তাহাকে বলিলেন, "নিয়ে এস।" আমি বাড়ীর ভিতরে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম। মা দেশে ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগিয়া আসিয়াছেন। চেহারা শীর্ণ ও মলিন। পূর্ব্বে জয়রামবাটীতে যেরূপ দেখিয়াছিলাম তদপেক্ষা অনেক রুগ্ন। মা বড় মামীর দেহত্যাগের কথা বলিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বলিলেন, "কাল শরৎ চক্রবর্ত্তী এসেছিল। এখানে এসে আমাকে গান শুনালে। আহা,

তার কি ভাব! কি গান! তুমি আসলে না?" আমি যে সেই বেলাই কলিকাতায় আসিয়াছি মা তখনও বুঝিতে পারেন নাই। একটু পরে গৌর বাবু আসিয়া বলিলেন, "গাড়ী এসেছে।" মা গঙ্গাস্নান করিতে যাইবেন। আমি বাহিরে আসিলাম। মধ্যাহ্নে ওখানেই প্রসাদ পাইলাম। আমার একটু জ্বরভাব হওয়ায় বৈকালেই বরিশালে ফিরিব স্থির করিলাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজ তখন এই বাড়ীতে থাকেন। তিনি কুইনাইনের বড়ি দিলেন। সন্ধ্যার সময় মাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মা, আমি আজকেই যাব। রাত্রে গাড়ী, শরীর ভাল নয়।" কলিকাতায় আমার থাকিবারও কোন সুবিধা ছিল না। মা বলিতে লাগিলেন, "আহা, আজই চলে যাবে? আজ এলে, আবার আজকেই যেতে হবে?"

যাইবার সময় মাকে বলিলাম, "মা, যা ভাল হয় করো।"

ইহার পরের বারে মাকে বাগবাজারে তাঁহার নূতন বাটীতে দর্শন করি। পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিলে মা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন। উহা সকল সময় পছন্দমত মিলিত না বলিয়া মার যখন ইচ্ছা আসিতে এবং থাকিতে অসুবিধা হইত। তাই এই নূতন বাড়ী পূজনীয় শরৎ মহারাজের বহু চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। আমি কলিকাতা পৌঁছিয়া সেই

দিনই বৈকালে অনেক খোঁজ করিয়া এই বাড়ীতে আসি এবং দেখি কাঞ্জিলাল ডাক্তার রোয়াকে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "মায়ের বসন্ত হয়েছিল, এখনও আরোগ্যস্নান হয় নি। সম্প্রতি ভাল আছেন। পনের দিন পরে দেখা হতে পারে।" আমি এ সংবাদ জানিতাম না। শেষে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন, "কাল সকালে এসে দেখা করো এবং এখানে প্রসাদ পেও।"

পরদিন সকালে আসিয়া দেখা করিলাম। মা তাঁহার হাতের ও মুখের বসন্তের দাগগুলি দেখাইতে লাগিলেন। অসুখের কথা সব বলিয়া বলিলেন, "বসন্তের দাগগুলি এখন আর তেমন নাই।" মায়ের গায়ে বসন্তের দাগ পরে মোটেই ছিল না।

এইবারেই পূজনীয় শরৎ মহারাজের কথায় এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদে আমার মঠে থাকা হয়। মাকে বলায় বলিলেন, "আরে, এর সাধুর হাওয়া লেগেছে। আচ্ছা বেশ, মঠে থাকগে, ঠাকুরে ভক্তি হ'ক, আমি খুব আশীর্ব্বাদ করছি।"

মঠ হইতে মাঝে মাঝে দুধ লইয়া যাইতাম এবং মাকে দেখিতে আসিতাম। এক সময় কিছুদিন না যাওয়ায়, মা

একজনকে (তিনিও দুধ লইয়া যাইতেন) আমার কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কই, সে—অনেক দিন আসে না কেন?"

ইহার পর একদিন দুধ লইয়া গিয়াছি। মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি, মা পাশের ঘরে পান সাজিতেছেন। কাছে নলিনী, সেও পান সাজিতেছিল। আমি যাওয়াতে নলিনী সরিয়া যাইতেছিল। মা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "যেও না, যেও না, ও ছেলেমানুষ, তুমি এই-খানেই বস" এবং আমাকে বলিলেন, "বস।" কথায় কথায় মাকুর শ্বশুরবাড়ীর কথা উঠিল। মা বলিলেন, "তাদের খুব আদর-যত্ন না করলে একটুতেই ফোঁস্ করে। তোমরা আমার ছেলে, তোমাদের আমি যা দিই, যা বলি, তাতে কিছু হয় না, ত্রুটি হলেও তোমরা কিছু মনে করবে না, কিন্তু তাদের ভাল জিনিষ, ভাল সব না দিলে, একটু ত্রুটি হলে অমনি অসন্তুষ্ট হবে।" কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "মা, শুদ্ধ মন আর অনুরাগ কিসে হয়?"

মা— হবে, হবে; যখন ঠাকুরের শরণাগত হয়েছ, সব হবে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে।

আমি— না, সে তুমি তাঁকে বলবে।

মা— আমি ত বলছি, ঠাকুর, আমার এর মনটি ভাল করে দাও, শুদ্ধ করে দাও।

আমি—হাঁ, তুমি বলবে, তা হলেই আমার হবে।

ইহার কয়েক মাস পরে ঘাটালে বন্যাক্লিষ্টদের সেবাকার্য্য হইতে তিন দিনের ছুটী লইয়া ৺জগদ্ধাত্রীপূজার সময় জয়রামবাটী যাই। মা তাহার কিছু পূর্ব্বে দেশে আসিয়াছেন। আমার সঙ্গে অতুল। সে এইবার শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করে। আমরা কামারপুকুর হইয়া এবং ৺রঘুবীরের প্রসাদ পাইয়া গিয়াছিলাম। যাইতেই আশু মহারাজ বলিলেন, "এসেছ ? বেশ করেছ ; মা কেবল বলছেন, 'ভক্তেরা কেউ এল না' ; চল, প্রসাদ পেতে বস।" আমরা গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে এলে ?" বলিলাম, "ঘাটাল থেকে।" মা বলিলেন, "বস, প্রসাদ পাও।" সকলে তখন প্রসাদ পাইতে বসিতেছেন। খাইবার সময় মা আমাদিগকে খুব করিয়া মাছ দেওয়াইলেন।

পরদিন সকাল আটটা-নয়টার সময় মায়ের উঠানে তরকারী কোটা হইতেছিল। কুসুম প্রভৃতি ভক্ত মেয়েরা তরকারী কুটিতেছিলেন। ভানু পিসী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়া শুনিলাম, ভানু পিসী বলিতেছেন, "কুসুম দিদি, তোমরা ত ভর্ত্তি হয়ে আছ, তাই মুখে কথাটি নেই।" কুসুম বলিলেন, "কুসুম অত শত জানে না।" মা পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, শুনিয়া বলিলেন,

"ভর্ত্তি হলে কি হবে? ভর্ত্তি হলে ত উপচে পড়বে। স্বভাব বদলালে ত হয়।"

তার পরদিন সকালেই আমরা রওয়ানা হইব। ভোরে বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি মা ভিজা কাপড়ে উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন। কাপড় ছাড়িলে মাকে প্রণাম করিয়া আমি বিদায় লইলাম। বলিলাম, "আবার আসব।" অতুল স্কুলের ছেলের মত বলিল, "মনে রাখবেন।"

ঘাটালের সেবাকার্য্য শেষ করিয়া ১লা পৌষ আমি পুনরায় জয়রামবাটী রাওয়ানা হইলাম। অতুল বহুদূর অবধি সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দিয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পৌঁছিয়া দেখি মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় পা মেলিয়া বসিয়া হাঁটুতে (বাতের জন্য) ঔষধ দিতেছেন। আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আবার কি ওষুধ দিচ্ছ?" মা বলিলেন, "এ একজন বলেছিল এই পাতা বেঁটে দিতে। সমস্ত দিন খাও নি?" চেহারা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন। আমি 'না' বলায় বলিলেন, "পথে মিষ্টি-টিষ্টি কিছু খেলে না কেন? রামজীবনপুরে দোকান আছে।"

উপেন মহারাজ ঘাটাল হইতে মঠে যাইবার খরচ বাবত একটাকা দিয়াছিলেন। সেই টাকাটি মঠে ফিরিবার সময় প্রয়োজন হইবে ভাবিয়া ব্যয় করি নাই। কিন্তু

মাকে আর এই কথা বলিলাম না। মা বলিলেন, "বস, আমি ভাত দিই, গরম ভাত হয়েছে।" আবার বলিতেছেন, "যার জগৎ সে দেখবে, তোমাদের ওসবে দরকার নেই।" (আমার খাওয়া হয় নাই দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল।) মা তাড়াতাড়ি ভাত, ডাল, তরকারী এবং আরও কি কি নিজেই আনিয়া দিলেন। খাওয়ার পর পান দিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতেছে।

মা—তোমাকে দিয়ে ঠাকুর অনেক কাজ করিয়ে নেবেন। এই ত ঘাটালে তোমরা এসেছিলে, কত লোককে দিলে, কত লোকের উপকার হল। কাজ শেষ হলে সময়ে আপনার ধন তিনি আপনার কোলে টেনে নেবেন।

আমি—কেন ঠাকুরের দেখা পাই না?

মা—পাবে, পাবে, সময় হইলেই পাবে। ললিত (চাটুয্যে) আমার এমন কথা কখনও বলত না, "কেন ঠাকুরের দেখা পাই না?" তার ভাব—তিনি আপনার জন, যখন হোক, দেখা পাবই।

আমি—মা, দেখো আমার যাতে ভাল হয়। যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়।

মা—হবে, হবে। শুদ্ধা ভক্তি হবে।

একখানি কম্বল দিয়া বলিলেন, "এই কম্বল নাও,

রাত্রে গায়ে দেবার জন্য।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কার কম্বল?” মা বলিলেন, “আমারই, আমি ব্যবহার করি।”

৩রা পৌষ, জয়রামবাটী

মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় দ্বারের সম্মুখে বসিয়া পান সাজিতেছিলেন। বেলা প্রায় নয়টা। আমাকে মুড়ি খাইতে দিয়াছেন। খাইবার পর কথা হইতেছে।

আমি—মা, এবার আমাকে বেশী দিন রেখো না।

মা—থাকতে ইচ্ছা না হয় আমার সঙ্গে যাবে। সময় হলে (দেহান্তে) সকলে (সব ভক্তরা) যাবে।

আমি—ঠিক মনে যেন থাকে।

মা—সে ত বললুম, তোমাকে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

আমি—এবার আমাকে নিয়ে যাও, পরবারে ঠাকুর যখন আসবেন তখন সঙ্গে আসব।

মা হাসিয়া বলিলেন, “আমি ত আর আসছি না।”

আমি—তুমি আস আর না আস, আমি আসব, আমার আসতে ইচ্ছা আছে।

মা—তুমি তখন হয়তো আর আসতে চাইবে না। এ জগতে কি আর আছে? কোন্ জিনিষটা ভাল, বল না? তাই ঠাকুর সজনে খাড়া (ডাঁটা), পলতা শাক,

এই সব ছাড়া আর কিছু খেলেন না। মুখে সন্দেশ দিতে যেতুম, বলতেন, "ওতে কি আর আছে? সন্দেশও যা, মাটিও তা।"

আমি—তা তুমি ঠাকুরের কথা কেন বলছ? তাঁর কি তুলনা?

মা—তাই ত, অমন আর একটি কি আর আছে? থাকলে ত হ'ত।

এই সময় বরদা মামা মাকে চিঠি পড়িয়া শুনাইতে আসিলেন। এই চিঠির মধ্যে আমার সেজ ভাই-এর এক চিঠি ছিল। তাহাতে আমাকে বাড়ী পাঠাইতে মাকে অনুরোধ করিয়াছেন। চিঠিখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও ভাষা ও ভাব বেশ ছিল। শুনিয়া মা বলিলেন, "আহা, কেমন লিখেছে!" আমাকে বলিতেছেন, "কেন, সংসারে থাকবে, ঘরকন্না করবে, টাকা করবে!" আমাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, "মা, ওগুলো আর বলো না।"

মা—তা এত লোক সংসার করছে, তুমি নয় না করলে।

আমি তখন কাঁদিতেছি। দেখিয়াই সকরুণ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "কেঁদো না, কেঁদো না, বাছা, তোমরাই ভগবান। ভগবানের জন্য কে সব ত্যাগ করতে পেরেছে? ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়।

তাঁর নিজের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়। ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং বেরোয়? না, সদসদ্‌-বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়। ভাবে লাভ—এ ছাড়া কে ভগবান দেখেছে, কার সঙ্গে ভগবান কথা কয়েছেন? ভাবে দর্শন, ভাবে কথাবার্ত্তা, সব ভাবে হয়।"

আমি—না, মা, এ ছাড়াও কিছু আছে—প্রত্যক্ষ লাভ।

মা—সে এক নরেন পেয়েছিল; তাঁর (ঠাকুরের) হাতে মুক্তির চাবি ছিল।

আর কি, জপ ধ্যান করা, আর ঠাকুরকে ডাকা, এই ত? বলিয়াই আবার সহাস্যে বলিতেছেন, "আর 'ঠাকুর ঠাকুরে'ই বা আছে কি? তিনি ত চিরদিনই আপন জন।"

আমি—মা, দেখো যেন আমার ঠিক ঠিক হয়। অমনটি, 'আপনার'।

মা—তা কি আর বারবার বলতে আছে? (দৃঢ়তার সহিত) হবে, হবে।

৪ঠা পৌষ, জয়রামবাটী

রাত্রে মায়ের ঘরে কথা হইতেছে। মা তক্তাপোষে শুইয়া আছেন। বেদান্তের কথা উঠিয়াছে। আমি

বলিলাম, "নামরূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। জড় পদার্থ বলে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। তাই শেষে বলে, ঈশ্বর-টীশ্বর কিছুই নেই।" (আমার মনের ভাব—ঠাকুর, মা, এসবও মিথ্যা।)

মা শুনিয়াই আমার কথার ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। অমনি বলিতেছেন, "নরেন বলেছিল, 'মা, যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে ত অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?' তুমি জ্ঞানচচ্চড়ি ছেড়ে দাও। তাঁকে কে জানতে পেরেছে? শুক, ব্যাস, শিব হদ্দ ডেও পিঁপড়ে।"

. আমি—মা, জানবার ইচ্ছা আছে, কিছু কিছু বুঝতেও পারি। কি করে বিচার বন্ধ হবে?

মা—ঠিক ঠিক পূর্ণজ্ঞান না হলে বিচার যায় না।

আবার সৃষ্টির কথা উঠিল।

আমি—আচ্ছা, এই যে সব অসংখ্য প্রাণী—ছোট, বড়, সব কি এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে না কি?

মা—চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে চোখটি, মুখটি, নাকটি—এমনি একটু একটু করে পুতুলটি তয়ের করে, ভগবান কি অমনি একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন? না, তাঁর একটা শক্তি আছে। তাঁর 'হাঁ'তে জগতের সব হচ্ছে, 'না'তে

লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয় নি।

মায়ের ঘরে ডেও পিঁপড়ে খাবারের গন্ধে আশেপাশে ঘুরিতেছিল। হঠাৎ তাহার একটি চক্ষে পড়ায় অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "তবে এই পিঁপড়েটা এত পাছে পড়ল কেন? ওর ত মানুষ হতেই অনেক দেরী।" মা বলিলেন, "হাঁ, অনেক দেরী।" পরে এই সৃষ্টি-প্রসঙ্গেই বলিলেন, "কল্পান্তে সব যেন ঘুম থেকে ওঠে।"

ইহার পরে আমি জপতপের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মা বলিলেন, "জপতপের দ্বারা কর্ম্মপাশ কেটে যায়। কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না। জপ-টপ কি জান? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কেটে যায়।"

ললিত বাবুর (চাটুজ্যে) কথা উঠিল। কয়েক মাস যাবৎ তাঁহার খুব ব্যারাম—সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। মা তাঁহাকে খুব ভালবাসেন এবং তাঁহার জন্য বিশেষ চিন্তিত আছেন। বলিতেছেন, "ললিত আমাকে কত টাকা দিত। তার গাড়ীতে করে বেড়াতে নিয়ে যেত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবায় ও (কামারপুকুরে) রঘুবীরের সেবায় অনেক টাকা দেয়। আমার ললিতের লাখ টাকার প্রাণ। অনেকে টাকা থেকেও কৃপণ।" পরে বলিলেন, "যার

আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো।" (যার অর্থাদি আছে সে ভক্ত-ভগবানের সেবা করুক। আর যার নেই সে ভগবানের নামজপ করুক। এই উভয় উপায়েই ভগবানের কৃপালাভ করা যায়।)

আবার কথায় কথায় প্রেমভক্তির কথা উঠিল।

মা—বৃন্দাবনে রাখালরা কি কৃষ্ণকে জপধ্যান করে পেয়েছিল? না, তারা 'আয় রে, খা রে, নে রে'—এই করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল।

আমি— তাঁর ভালবাসা না পেলে তাঁর জন্য প্রাণ কেন ব্যাকুল হবে?

মা—তাই ত, সেটি তাঁর কৃপা।

১৫ই পৌষ, জয়রামবাটী

সকালে আটটা-নয়টার সময় আমি গিয়া দেখি মা ঘরে বসিয়া পান সাজিতেছেন। আমি কাছে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলাম।

আমি—মা, এত দেখি শুনি, তবু আপনার মা বলে ভাবতে পারলাম না।

মা—বাবা, আপনার না হলে এত আসবে কেন? যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার। আপন মা, সময়ে জানবে

কিছুক্ষণ পরে আমি আমার মা-বাপ ও ভাইদের কথায় বলিলাম, "বাপ-মা মানুষ করেছেন, এখন (দেহান্তে) তাঁরা কোথায় কি ভাবে আছেন জানি না। মা, ভাইদের যাতে সুমতি হয়, তাই আশীর্ব্বাদ কর।" মা বলিলেন, "সবাই কি তাঁকে চায়? এই বাড়ীতেই এত লোক আছে, সবাই কি (আমাকে) চায়?" একটু পরে আমাকে বলিতেছেন, "বিয়ে করো না, সংসার করো না। বিয়ে না করলে আর কি? যেখানে থাক সেইখানেই স্বাধীন। বিয়ে করাই হচ্ছে মহাপাপ।"

আমি—মা, আমার ভয় হয়।

মা—না, কোন ভয় নেই, ঠাকুরের ইচ্ছা।

আমি—মন নিয়ে কথা। মন ভাল থাকলে যেখানেই থাকি না কেন। মা, তুমি দেখো, আমার মন যেন ভাল থাকে।

মা—তাই হবে।

১৮ই পৌষ

আজ মায়ের জন্মতিথি। প্রবোধ বাবু কয়েক দিন হইল আসিয়াছেন। গতকল্য তিনি মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ঠাকুরকে ভোগ দিবার জন্য মামাদের পাঁচটি টাকা দিয়াছেন। মা আমাকে বলিলেন, "তোমরা ত আর বিশেষ কিছু করছ না। আমি একখানা নূতন কাপড় পরব, ঠাকুরকে একটু

মিষ্টান্নাদি করে ভোগ দেওয়া হবে, আমি প্রসাদ পাব, এই আর কি।”

পূজার পর মা তাঁহার ঘরে চৌকির উপর দক্ষিণ পাশে দুয়ারের নিকট পা ঝুলাইয়া বসিয়াছেন। এক-খানি নূতন কাপড় পরিয়াছেন। প্রবোধ বাবু গিয়া মায়ের পায়ে ফুল দিলেন। আমি দুয়ারের পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি। মা আমাকে বলিলেন, “কই, তুমি দেবে না? নাও, এই ফুল নাও।” আমি ফুল লইয়া পায়ে দিলাম। মধ্যাহ্নে খুব প্রসাদ পাওয়া গেল। প্রবোধ বাবুর আফিস, তাই তিনি কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। আমার আমাশয় হওয়াতে যাওয়া হইল না।

২১শে পৌষ

কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন—“ভগবানকে কে বাঁধতে পেরেছে বল না। তিনি নিজে ধরা দিয়েছিলেন বলে ত যশোদা তাঁকে বাঁধতে পেরেছিল, গোপগোপীরা তাঁকে পেয়েছিল।

“বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না, বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়। তাই ত মঠে এত জিনিষ আসে। বাসনাটি সূক্ষ্ম বীজ—যেমন বিন্দুপরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই। বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই,

যেন এক খোল থেকে নিয়ে আর এক খোলে ঢুকিয়ে দিলে। একেবারে বাসনাশূন্য হয় তু-একটি। তবে বাসনায় দেহান্তর হলেও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে হারায় না।

"বৃন্দাবনের গোবিন্দের এক কামদার (পূজারী) ঠাকুরের ভোগ নিয়ে তার উপপত্নীকে খাওয়াত। এই পাপে দেহান্তে তার প্রেতযোনি হয়। কিন্তু সে ঠাকুরের সেবা করেছিল, এই সুকৃতির ফলে একদিন সে সশরীরে সকলকে দেখা দেয়। সুকৃতিটুকু ছিল বলে দেখা দিতে পারল এবং সবাইকে তার অধোগতির কারণ বললে। তাদের বললে, 'তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য ঠাকুরের মহোৎসব-কীর্ত্তনাদি কর। তা হলেই আমার উদ্ধার হবে।' "

আমি—মহোৎসব-কীর্ত্তনে কি উদ্ধার হয়?

মা—হাঁ, বৈষ্ণবদের ওতেই হয়। তাদের শ্রাদ্ধাদি করে না।

"যখন পুরীতে জগন্নাথদর্শন করি, এত লোকে জগন্নাথ-দর্শন করছে দেখে আনন্দে কাঁদলুম। ভাবলুম—আহা, বেশ, এত লোক মুক্ত হবে! শেষে দেখি যে না, যারা বাসনাশূন্য সেই এক-আধটিই মুক্ত হবে। যোগেনকে বলায় সেও তাই বললে, 'না মা, যারা বাসনাশূন্য তারাই মুক্ত হবে।' " *

* যোগেন-মা বলেন, "একাদন জগন্নাথের মান্দরের ভিতর লক্ষ্মীর মন্দিরে মা ও

একদিন সকালবেলা মায়ের বারান্দায় মুড়ি খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, মঠে থাকলে কি সন্ন্যাস নিতে হবে ?" মা বললেন, "তা হবে।"

আমি—মা, বড় অভিমান আসে সন্ন্যাসে।

মা—হাঁ, বড় অভিমান—আমায় প্রণাম করলে না, মান্য করলে না, হেন করলে না! তার চেয়ে বরং (নিজের সাদা কাপড় লক্ষ্য করিয়া) এই আছি বেশ (অর্থাৎ অন্তরে ত্যাগ)। বৃন্দাবনে গৌর শিরোমণি* বুড়ো বয়সে সন্ন্যাস নিলেন, যখন ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কমে গেছে। রূপের অভিমান, গুণের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, সাধুর অভিমান কি যায়, বাছা।

আমাকে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন, "বাড়ী গিয়ে ওদের (ভাইদের) একবার বলে আসবে 'চাকরী-বাকরী আমি করতে পারব না। মা ত নেই যে দাসত্ব করব। আমি ওসব পারব না। তোমরা ঘরকন্না কর, বেশ থাক'।"

আমি পাশাপাশি বসে ধ্যান করছি। আমি মনে মনে ভাবছি, আহা, এত সব লোক রথে জগন্নাথ দেখছে, সব ত মুক্ত হবে। তখন শুনি কে যেন বলছে, "না, যারা বাসনাশূন্য, তারাই মুক্ত হবে।" আমি মাকে যখন এই কথা বললুম, মা বললেন, "ও যোগেন, আমার মনেও তখন এই চিন্তা উঠেছিল, আর আমিও এই উত্তর শুনতে পেলুম।"

* একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সাধু ; ইনি কালা বাবুর কুঞ্জে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন।

সাধুজীবনের খাওয়া-পরার কঠোরতার কথা উঠিল। মা বলিলেন, "মঠে ছেলেরা সব কষ্ট করছে—না খাওয়া, না দাওয়া, না কিছু। ওসব আমার ভাল লাগে না। যোগীনের (যোগানন্দ স্বামী) কঠোর করে করে শেষটা অত ভুগে ভুগে দেহ গেল।"

রাত্রে মায়ের সঙ্গে কথা হইতেছে। আমি বলিলাম, "মা, ভগবানের কৃপা হলে যখন তখন হয়, সময়ের অপেক্ষা রাখে না।" উত্তরে মা বলিলেন, "তা বটে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসে যে আমটি হয় তা যেমন মিষ্টি, অন্য মাসে কি তেমনটি হয়? মানুষ অকালে ফলাবার চেষ্টা করছে। দেখ না এখন আশ্বিন মাসে কাঁটাল হয়, আম হয়। কিন্তু কালের মত কি (মিষ্টি) হয়? ঈশ্বরলাভের পথেও অমনি। এজন্মে হয়তো জপতপ করলে, পর জন্মে হয়ত ভাব একটু ঘনীভূত হল, তার পর জন্মে হয়ত আর একটু হল—এই ভাবে আর কি।"

হঠাৎ কিছু করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে বলিলেন, "ভগবান বালকস্বভাব। কেউ চায় না, তাকে দেবে; আবার কেউ চায়, তাকে দেবে না—সব খেয়াল!"

আর একদিন সকালবেলা মা বারান্দায় পান সাজিতেছেন। আমি বলিলাম, "কালে তোমার জন্য লোকে কত সাধন করবে।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "বল কি! সকলে বলবে, আমার মায়ের এমনি বাত ছিল, এমনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত।"

আমি—তা তুমি বলগে।

মা—উটি ভাল। তাই ত ঠাকুর বলতেন—তখন কাশীপুরে ব্যারাম—"যারা লাভের আশায় এসেছিল তারা সব চলে গেল, বললে, 'উনি অবতার, ওঁর আবার ব্যারাম কি? ও সব মায়া!' কিন্তু যারা আমার আপনার জন, তাদের আমার এ কষ্ট দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে।" আমার জ্বর হয়েছে, বিকারে প্রলাপ বকছি। কুসুম গিয়ে বললে, "গোলাপ দিদি, দেখ এসে, মা প্রলাপ বকছেন।" গোলাপ বললে, "মা ও রকম বলে থাকেন।" "না, দেখ এসে, সত্যসত্যই।" "না, ও কিছু না।" শেষে কুসুম গিয়ে আশুকে ডাকলে। সকলে এসে দেখে সত্যই বিকার।

উদ্বোধন

মন্ত্র লইবার পূর্ব্বদিন গিয়া মাকে বলিলাম, "মা, আমি মন্ত্র নেব।" মা বলিলেন, "তুমি মন্ত্র নাও নি এখনও?" আমি 'না' বলায় বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি

মন্ত্র নিয়েছ।” দীক্ষার পর বলিলেন, “ভগবানের মন্ত্রজপ করে দেহ-মন শুদ্ধ হোক।”

আমি—আঙ্গুলে মন্ত্রজপ করবার কি দরকার? এমনি জপ করলেই ত হয়।

মা—ভগবান আঙ্গুল দিয়েছেন, মন্ত্রজপ করে এর সার্থকতা করবে।

২৫-৯-১০, উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

সকালবেলা মায়ের সহিত কথা হইতেছে।

আমি—মা, যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তবে জগতে এত দুঃখকষ্ট কেন? তিনি কি দেখছেন না? তাঁর কি এসব দূর করবার শক্তি নেই?

মা—সৃষ্টিই সুখদুঃখময়। দুঃখ না থাকলে সুখ কি বোঝা যায়? আর সকলের সুখ হওয়া সম্ভব কি করে? সীতা বলেছিলেন রামকে, ‘তুমি সকলের দুঃখকষ্ট দূর করে দাও না কেন? রাজ্যে যত প্রজা লোকজন আছে সকলকে সুখে রাখ। তুমি ত ইচ্ছা করলেই পার।’ রাম বললেন, ‘সকলের সুখ একসঙ্গে কি হয়?’

“ ‘না, তুমি ইচ্ছা করলেই হয়, যার যা অভাব হয় রাজভাণ্ডার হতে দিয়ে দাও।’

“ ‘আচ্ছা, তোমার কথামতই হবে।’

"তখন লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বললেন, 'যাও, রাজ্যমধ্যে সকলকে জানাও, যার যা অভাব থাকে চাইলেই রাজকোষ হতে পাবে।' সকলে সংবাদ পেয়ে এসে দুঃখ জানালে। রাজকোষ অবারিত। বেশ সকলে সুখে দিন কাটাতে লাগল। রামের এমনি মায়া যে শীঘ্রই যে দালানে রাম-সীতা থাকতেন তার ছাদ ফেটে জল পড়তে আরম্ভ হল। মেরামতের চেষ্টায় লোকজন ডাকতে পাঠালেন। কোথায় লোকজন? কুলী-মজুর কি আর আছে? রাজ্যমধ্যে কুলী-মজুরের অভাবে প্রজাদের ঘরদরজা, কাজকর্ম্ম সব নষ্ট হতে চলেছে—প্রজারা জানালে। তখন নিরুপায় হয়ে সীতা রামকে বললেন, 'আর ভিজে ভিজে কষ্ট সহ্য হয় না; যেমনটী ছিল তুমি তেমনটি করে দাও, তাহলে কুলী-মজুর সব মিলবে। সকলের একসঙ্গে সুখ হওয়া সম্ভব নয়।' রাম বললেন, 'তথাস্তু।' তখন দেখতে দেখতে সব পূর্ব্বের মত হল। কুলী মজুর মিস্ত্রী সব মিলল। সীতা বললেন, 'ঠাকুর, এ সৃষ্টি তোমারই অদ্ভুত খেলা!'

"চিরদিন কেউ দুঃখী থাকবে না, সব জন্ম কারও দুঃখে যাবে না। যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল, তেমন যোগাযোগ হয়।"

আমি—সবই কর্ম্ম থেকে হয়?

মা—কর্ম্ম না ত কি? দেখছ না, এই যে মেথর বিষ্ঠার ভার বইছে!

আমি—এ ভালমন্দ কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রথম কোথা থেকে আসে? এ জন্মে বলবে তার পূর্ব্বজন্ম থেকে, সে জন্মে আবার তার পূর্ব্বজন্ম থেকে; আদি কোথা?

মা—ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার সাধ্য নেই, তৃণটিও নড়ে না। যখন জীবের সুসময় আসে, তখন ধ্যানচিন্তা আসে; কুসময়ে কুপ্রবৃত্তি, কুযোগাযোগ হয়। তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনি কালে সব আসে, তিনিই তার ভিতর দিয়ে কার্য্য করেন। নরেনের কি সাধ্য? তিনি তার ভিতর দিয়ে সব করলেন বলে ত নরেন সব করতে পেরেছিল?

"ঠাকুর যেটি করবেন তাঁর তা ঠিক করা আছে। তবে ঠিক ঠিক যদি কেউ ওঁর উপর ভার দেয়, উনি তা ঠিক করে দেবেন।

"সব সয়ে যেতে হয়। কারণ কর্ম্মানুসারে সব যোগাযোগ হয়। আবার কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের খণ্ডন হয়।"

আমি—কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের খণ্ডন হয়?

মা—তা হবে না? তুমি একটি সৎকার্য্য করলে, তাতে তোমার পাপটুকু কেটে গেল। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তায় পাপ কাটে।

মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি ছেলের উপর নাকি মৃতাত্মাদের

আবেশ হয়। 'উদ্বোধনের' কেহ কেহ পূর্ব্বদিন উহা দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, প্রেতদেহে কতদিন থাকতে হয়?"

মা—উন্নত পুরুষ ছাড়া আর সকলকে এক বছর প্রেত-যোনিতে থাকতে হয়। তারপর গয়ায় পিণ্ডদান, মহোৎসব—তাদের উদ্দেশে এসব করলে প্রেতযোনি মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে যায়। অথবা অন্যান্য লোকে গিয়ে সুখটুখ ভোগ করে। আবার কালে বাসনা অনুসারে জন্ম হয়। কারও বা সেখান থেকেই মুক্তি হয়। তবে ইহ-জন্মের কিছু সুকৃতি থাকলে প্রেতদেহেও চৈতন্য একেবারে হারায় না।

মা বৃন্দাবনের সেই বৈষ্ণব ভূতের (গোবিন্দজীর পূজারীর) কথা বলিলেন।

আমি—গয়ায় পিণ্ড দিলেই কি ভগবানের কাছে যায়?

মা—হাঁ, যায়।*

আমি—তবে আর সাধন-ভজনের কি দরকার?

---

* এই প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ১৯১২ সালে মা যখন কাশীতে যান, ফিরিবার সময় আমি গয়ায় পিতৃপুরুষদের পিণ্ড দিবার জন্য তাঁহার দুই-এক দিন পূর্ব্বে রওয়ানা হই। যাত্রা করিবার সময় মাকে বলিয়াছিলাম, "দেখো যেন তাদের সদ্‌গতি হয়।" আমি যেদিন গয়ায় পিণ্ড দিই, সেদিন রাত্রে ভূদেব (মায়ের ভাইপো সঙ্গে কাশী গিয়াছিল) স্বপ্ন দেখে যে, মা পঞ্চপাত্র লইয়া জপ করিতে বসিয়াছেন, আর অনেক লোক আসিয়া বলিতেছে, "আমাকে উদ্ধার করুন, আমাকে উদ্ধার করুন।" মা তাহাদের গায়ে শান্তিজল (পঞ্চপাত্র হইতে) ছিটাইয়া দিতেছেন

মা—তাঁর কাছ থেকে যে আবার বাসনা কর্ম্মানুসারে পৃথিবীতে এসে জন্মায়। এখান থেকে কেউ বা মুক্তিলাভ করে, কেউ বা নীচ যোনি সব ভোগ করে। চক্রের মত সৃষ্টি চলছে। যে জন্মে মন বাসনাশূন্য হয়, সেইটি শেষ জন্ম।

আমি—এই যে ভগবানের কাছে যায় বললে, কেউ কি এসে নিয়ে যায়, না আপনিই যায়?

মা—না, আপনিই যায়, সূক্ষ্ম শরীর হাওয়ার শরীর কি না।

আমি—যাদের গয়ায় পিণ্ডাদি না হয়, তাদের কি গতি হয়?

মা—যতদিন না বংশে কোন ভাগ্যবান জন্মে গয়ায় পিণ্ড দেয়, কি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করে, ততকাল প্রেতদেহে থাকতে হয়।

আমি—এই যে ভূত প্রেত, এসব কি শিবের চেলা ভূত? না যারা মরে গেছে তারা?

আর বলিতেছেন, "যা উদ্ধার হয়ে যা।" তাহারা সকলে আনন্দে চলিয়া যাইতেছে। শেষে একটা লোক আসিয়াছে। মা বলিলেন, "আমি আর পারব না।" অনেক মিনতি করাতে তাহাকেও কৃপা করিলেন। পরদিন ভূদেব মার কাছে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়াছিল। মা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এই রা— গয়ায় পিণ্ড দিতে গেছে, তাই এত লোক উদ্ধার হয়েছে!" বাস্তবিকই, গয়ায় পিতৃপুরুষদের পিণ্ড দিবার পর মনের আবেগে যাঁহার নাম মনে পড়িয়াছে, তাঁহারই নামে পিণ্ড দিয়াছিলাম—সকলেই উদ্ধার হউক।

মা—না, মৃত যারা তারা; শিবের চেলা ভূত, সে সব আছে আলাদা।

“ভারী সাবধানে চলতে হয়। প্রত্যেক কর্ম্মেই ফল ফলে। কাউকে কষ্ট দেওয়া, কটু বলা ভাল নয়।”

আমি—মা, নিমগাছেও আম ফলে না, আর আম গাছেও নিম ফলে না। যার যেমনটি হবার, তার তেমনটি হয়।

মা—ঠিক ব'লেছ, বাবা, কালে ঈশ্বর-টীশ্বর কিছু থাকে না। জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর-ঠুকুর সবই মায়া—কালে আসছে, যাচ্ছে।

উদ্বোধন—ঠাকুরঘর

সকালবেলা মায়ের সঙ্গে কথা হইতেছে।

মা—যখন ঠাকুর চলে গেলেন, একা একা বসে ভাবতুম—তখন কামারপুকুরে রয়েছি—ছেলে নেই, কিছু নেই, কি হবে? একদিন ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, ‘ভাবছ কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এই সব রত্ন ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে ‘মা, মা’ বলে ডাকবে।’

“বৃন্দাবন যখন যাই, পথে রেলে যেতে যেতে দেখি কি ঠাকুর জানালা (রেলগাড়ীর) দিয়ে মুখ বাড়িয়ে

বলছেন, 'কবচটি যে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, দেখো যেন না হারায়।'

"তাঁর ইষ্টকবচটি আমার হাতে ছিল। আমি পূজা করতুম। তারপর উটি মঠে দিলুম। এখন মঠে পূজা হয়।"

আমি—ও কবচটি এবার ঠাকুরের তিথিপূজার দিন হারিয়েছিল। ফুল বেলপাতার সঙ্গে গঙ্গায় ফেলে দেয়। কারও খেয়াল ছিল না। ভাঁটায় গঙ্গার জল কমে গেলে রামবাবুর ছেলে ঋষি ওখানে খেলতে খেলতে গিয়ে ওটি পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসে।

মা—তাঁর ইষ্টকবচ, সাবধানে রাখতে হয়।

বেলুড় মঠের কথা উঠিল।

মা—আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপার ঐ জায়গাটিতে—যেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান—তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন। (তখন মঠ হয় নাই।) মঠের নূতন জমি কেনা হলে পর নরেন একদিন আমাকে নিয়ে জমির চতুঃসীমা ঘুরে ঘুরে দেখালে, বললে, 'মা, তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।'

"বোধগয়ায় মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই—দেখে কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে

বলতুম, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হত!' তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হল।

"একদিন নরেন এসে বললে, 'মা, এই ১০৮ বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম্ম কখনও বিফলে যাবে না। ও হবেই একদিন।' "

রাত্রে খাইবার পর উপরে পান আনিতে গিয়া শুনি, মা বলিতেছেন, "নরেন বলছিল, 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।' আমি বললুম (হাসিয়া বলিতেছেন), 'দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না!' নরেন বললে, 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে ত অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?' "

ইহা বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। 'মা, মা'—শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই ত সোজা কথাটা!"

উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

মা পূজার জন্য ফুল বেলপাতা বাছিতেছিলেন। তাঁহার একখানি ফটো নূতন ছাপা হইয়া আসিয়াছে, তাহাই মাকে

দেখাইতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, এ ফটো কি ঠিক?"

মা—হাঁ, এটি ঠিক। তবে পূর্ব্বে আরও মোটা ছিলুম। যখন ছবি উঠায় তখন যোগীনের (যোগানন্দ স্বামীর) খুব অসুখ। তার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে গিছল। মন ভাল নয়, যোগীনের অসুখ বাড়ছে ত কাঁদছি, আবার যোগীন ভাল থাকছে ত ভাল থাকছি। সারা মেম (Sara Bull) এসে এইটি উঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, 'মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করব।' তাই শেষে এই ছবি উঠায়।

আমি—মা, তোমার কাছে এই যে ঠাকুরের ফটো রয়েছে এখানি বেশ। দেখলে বুঝা যায়। আচ্ছা, এখানি কি ঠিক?

মা—এটি খুব ঠিক ঠিক। ওখানি এক ব্রাহ্মণের ছিল। প্রথম কখানি যেমন উঠান হয়। একখানি সে ব্রাহ্মণটি নিয়েছিল। আগে এখানি খুব কাল (deep) ছিল—ঠিক যেন কালীমূর্ত্তিটি, তাই ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়েছিল। সে ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বর থেকে কোথায় যাবার সময় ওখানি আমার কাছে রেখে যায়। আমি এখানি অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার ছবির সঙ্গে রেখে দিয়েছিলুম—পূজা করতুম।

নবতের নীচের ঘরে থাকতুম। একদিন ঠাকুর গিয়েছেন। ছবি দেখে বলছেন, 'ওগো, তোমাদের আবার এসব কি?' আমরা (বোধ হয় মা ও লক্ষ্মী দিদি) ও পাশে সিঁড়ির নীচে রাঁধছি। তারপর দেখলুম, বিল্বপত্র আর কি কি, যা পূজার জন্য ছিল, একবার না দুবার ঐ ছবিতে দিলেন—পূজা করলেন। সেই ছবিই এই। সে ব্রাহ্মণ আর ফিরে এল না। এখানি আমারই রইল।

আমি—মা, ঠাকুরের সমাধি-অবস্থায় ঠাকুরের মুখ কখন ম্লান দেখেছ কি?

মা—কই, আমি ত কখন দেখি নি। সমাধির অবস্থায় মুখে হাসিই দেখেছি।

আমি—ভাবসমাধিতে মুখে হাসি থাকতে পারে। কিন্তু বসা ছবির সম্বন্ধে ঠাকুরও বলেছেন, 'এ অতি উচ্চ অবস্থার ছবি'। এতেও কি হাসি থাকে?

মা—আমি ত সব সমাধির অবস্থায়ই হাসিমুখ দেখেছি।

আমি—রং কি রকম ছিল?

মা—তাঁর গায়ের রং যেন হরিতালের মত ছিল—সোনার ইষ্ট-কবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম, দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে। কালীবাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরের একজনদের জামাই

এসেছিল—খুব গৌরবর্ণ। ঠাকুর আমায় বলছেন, 'আমরা দুজনে পাশাপাশি পঞ্চবটীতে বেড়াব, তুমি দেখবে কার রং ফরসা।' তাঁরা বেড়াতে লাগলেন, দেখলুম ঠাকুরের চেয়ে তার রং একটু ফরসা—উনিশ-বিশ হবে।

"যখনই কালীবাড়ীতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে দেখত, বলত, 'ঐ তিনি যাচ্ছেন।' বেশ মোটাসোটা ছিলেন। মথুর বাবু একখানা বড় পিঁড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন তখন তাতেও বসতে কুলাত না। ছোট তেলধুতিটি পরে যখন থস্ থস্ করে গঙ্গায় নাইতে যেতেন, লোকে অবাক হয়ে দেখত।

"কামারপুকুরে যখন যেতেন, ঘরের বার হলেই মেয়ে-মদ্দ হাঁ করে চেয়ে থাকত। একদিন ভূতির খালের দিকে বেরিয়েছেন, চারদিকে মেয়েগুলো—যারা জল আনতে গেছে—হাঁ করে দেখছে আর বলছে, 'ঐ ঠাকুর যাচ্ছেন।'

"ঠাকুর হৃদয়কে বলছেন, 'ও হৃদু, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে—দে, দে, নইলে আমি এখুনি ন্যাংটা হব।' হৃদয় বললে, 'না, মামা, এখানে ন্যাংটা হয়ো না, এখানে ন্যাংটা হয়োনা, লোকে কি বলবে?' ন্যাংটা হলে মেয়েগুলো পালাবে কিনা। হৃদয় তাড়াতাড়ি গায়ের চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দিলে।

"তাঁকে কখনও নিরানন্দ দেখি নি। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি, আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি, সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। কখনও বাপু নিরানন্দ দেখি নি। আহা! কামারপুকুরে সকালে উঠেই বলতেন, 'আজ এই শাক খাব, এইটি রেঁধো।' শুনতে পেয়ে আমরা (মা ও লক্ষ্মীদিদির মা) সব যোগাড় করে রাঁধতুম। কয়েক দিন পরে বলছেন, 'আঃ, আমার একি হল? সকাল থেকে উঠেই কি খাব, কি খাব! রাম রাম!' আমাকে বলছেন, 'আর আমার কিছু খাবার সাধ নেই, তোমরা যা রাঁধ, যা দেবে, তাই খাব।' শরীর সারতে দেশে যেতেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকতে খুব পেটের অসুখে ভুগতেন কিনা। বলতেন, 'রাম রাম! পেটটা কেবল মলেই ভর্ত্তি, কেবল মলই বেরুচ্ছে।' এই সবে তারপর শরীরে ঘেন্না ধরে গেল, আর শরীরের যত্ন করতেন না।

"একদিন ভূতির খালের দিক থেকে আসছেন, বৃষ্টি হয়ে গেছে; একটা মাগুরমাছ পুকুর থেকে রাস্তায় উঠেছে, ঠাকুরের পায়ে ঠেকেছে। ঠাকুর সেটাকে পায়ে করে ঠেলে ঠেলে এনে পুকুরে ছেড়ে দিলেন, বললেন, 'পালা, পালা, হৃদে দেখতে পেলে এখুনি তোকে মেরে ফেলবে।' এসে হৃদয়কে বলছেন, 'হৃদু, এই এত বড় একটা মাগুর মাছ, হলদে রং, রাস্তায় উঠেছিল, পুকুরে ছেড়ে দিলুম।'

হৃদয় বললে, 'ও মামা, তুমি করলে কি গো, ও মামা, তুমি করলে কি গো ! আঃ, এত বড় মাছটা ছেড়ে দিলে ! আনলে বেশ ঝোল হত ।'

"এখন ত কত ভক্ত, চারদিকে হৈ হৈ । তাঁর অসুখের সময় একজন ভেগে গেল বিশ টাকার জন্য—চাঁদা ধরেছিল । এখন ত আর ঠাকুরের সেবা কঠিন নয়, ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে নিজেরাই খায় । ঠাকুরকে বসিয়ে রাখ, বসেই আছেন ; শুইয়ে রাখ, শুয়েই আছেন—ছবি ত !

"বলরাম বাবুকে দেখেছিলেন, মা কালীর পাশে হাতজোড় করে রয়েছেন, মাথায় পাগড়ি । বলরাম সেই বরাবরই হাতজোড় করে ছিল, কখনও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত না । ঠাকুর তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলতেন, 'ও বলরাম, এই পাটা চুলকাচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও না ।' বলরাম অমনি নরেন, কি রাখাল-টাখাল যে কেউ কাছে থাকত তাকেই টেনে এনে বলত, 'এই ঠাকুরের পাটায় একটু হাত বুলিয়ে দাও ত, চুলকাচ্ছে ।' "

আমি—মহারাজকে আমি ঠাকুরের রংএর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম । তিনি বলেন, 'এই আমাদের গায়ের রংএর মতই ছিল ।'

মা—সে তারা যখন দেখেছে । তখন তাঁর সে শরীরও

ছিল না, সে রংও ছিল না। এই আমারই দেখ না, এখন কেমন রং হয়েছে—কেমন শরীর হয়েছে। আগে আমার কি এই রকম রং ছিল? আগে খুব সুন্দর ছিলুম। আমি প্রথমে বেশী মোটা ছিলুম না। শেষে (ঠাকুরের শরীরত্যাগের 'পর) মোটা হয়েছিলুম। দক্ষিণেশ্বরে যখন ছিলুম তখন ত বার হতুম না। খাজাঞ্চী বলতেন, 'তিনি আছেন শুনেছি, কিন্তু কখনও দেখতে পাই নি।'

"কখনও কখনও দুমাসেও হয়ত একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্ত্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল। তিনি বলতেন, 'বুনো পাখী খাঁচায় রাতদিন রাখলে বেতে যায়; মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।' রাত চারটেয় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। (নহবতের) নীচের একটুখানি ঘর, তা আবার জিনিষপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল্ করছে—ঠাকুরের জন্য সিঙ্গি মাছের ঝোল হত কিনা! তবু আর কোন কষ্ট জানি নি, কেবল যা শৌচে যাবার কষ্ট। দিনের বেলায় দরকার হলে রাত্রে যেতে

পারতুম—গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে। কেবল বলতুম, 'হরি হরি, একবার শৌচে যেতে পারতুম!' (মা একটু পেট-রোগা ছিলেন।)

"তখন কত কীর্ত্তন, কত ভাব! এই যে গৌরদাসী, এরই বা কত ভাব হত! কেবল 'নিত্যগোপাল, নিত্য-গোপাল' করত। 'নিত্য কোথায়? নিত্য কোথায়?' আমি বলতুম, 'কে জানে তোর নিত্য কোথায়? দেখ্‌গে, গঙ্গার ধারে-টারে ভাব হয়ে রয়েছে।' …"

পূজার সময় হইয়াছে, মা পূজা করিতে বসিবেন। আমি নীচে আসিলাম। পূজা হইয়া যাইবার পর উপরে প্রসাদ আনিতে গিয়াছি। মা ঠাকুরঘরে দক্ষিণমুখে পা ছড়াইয়া বসিয়া শালপাতায় প্রসাদ ভাগ করিয়া রাখিতেছেন। দক্ষিণধারের বারান্দায় বসিয়া আমি দেখাইয়া দেখাইয়া বলিতেছি, "আমাকে এটা দাও, ঐটা দাও।" তারপর আর একটা জিনিষ চাহিয়াছি। সেটি মায়ের হাতের কাছে ছিল না। পায়ের বাতের জন্য তাঁহার উঠিয়া আসিতে কষ্ট হইবে ভাবিয়া আমি নিজেই উহা হাত বাড়াইয়া লইতে গেলাম। সেই সময় মায়ের পায়ে আমার হাতের কনুইয়ের উপরের অংশটা ঠেকিয়া গেল। মা অমনি "আহা" বলিয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। আমি বলিলাম, "সে কি, কি আর হয়েছে?"

মা শুধু নমস্কারে তৃপ্ত না হইয়া বলিলেন, "এস, এস, একটা চুমু খাই।" অগত্যা আমি মুখ বাড়াইয়া দিলাম। তিনি হস্ত দ্বারা চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমু খাইলেন, তবে তাঁহার মন শান্ত হইল।

এমনই ভাবে তিনি ভক্তগণকে ভক্ত-ভগবান-জ্ঞানে নমস্কার, আবার আপন সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করিতেন।

২৯-১০-১০, উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

সকালে মায়ের তক্তাপোষের দক্ষিণপাশে বসিয়া কথা হইতেছে। ঠাকুরের কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন, "পুরীতে প্রথম দিন গিয়েই সকালবেলা একটা ঘিয়ের টিনে ঠেসান দিয়ে ঠাকুরের ছবি রেখে পূজা করে তাড়াতাড়ি জগন্নাথ দেখতে গিয়েছিলাম। ঘর দোর সব বন্ধ। এসে দেখি ঠাকুরের ছবি টিনের নীচে। সব্বাই এসে দেখলে। সকলে মনে করলে চোর ঢুকেছে। কিন্তু ঘরের কোথাও জিনিষপত্রের একটুও নড়চড় হয় নি। শেষে দেখি বড় লাল পিঁপড়ে ধরেছে টিনে—ঘিয়ের টিন কিনা—সেই পিঁপড়ে ঠাকুরের ছবিতে ধরেছিল, তাই ঠাকুর নেমে বসেছেন।"

আমি—ছবিতে কি ঠাকুর আছেন ?

মা—আছেন না? ছায়া কায়া সমান।* ছবি ত তাঁর ছায়া।

আমি—সব ছবিতেই তিনি আছেন?

মা—হাঁ, ডাকতে ডাকতে ছবিতে তাঁর আবির্ভাব হয়। স্থানটি একটি পীঠ হয়। যেমন এই জায়গায় (উদ্বোধনের উত্তরদিকের মাঠ দেখাইয়া) কেউ তাঁর পূজা দিলে। ঐটি তাঁর একটি স্থান হল।

আমি—তা, ও সব স্থানের সঙ্গে ঐ সব ভাল স্মৃতি জড়িত আছে বলে অমন মনে হয়।

মা—তা নয়, ও স্থানটিতে তাঁর দৃষ্টি থাকে।

আমি—আচ্ছা, ঠাকুরকে যে-সব ভোগ দাও তা কি ঠাকুর খান?

মা—হাঁ, খান।

আমি—কই, কোন চিহ্ন দেখি না কেন?

মা—তাঁর চোখ থেকে একটি জ্যোতিঃ বার হয়ে সব জিনিষ চুষে দেখে। তাঁর অমৃত-স্পর্শে সেটি আবার পরিপূর্ণ হয়, তাই কমে না।

---

* এইজন্যই বোধ হয় বলে, গুরুজনদের ছায়া ডিঙ্গাইতে নাই। জয়রামবাটীতে একদিন স্নান করিয়া আসিতেছি। মাও বাঁড়ুজ্যে পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিতেছেন। রৌদ্রে মায়ের ছায়া যে পাশে পড়িয়াছে, আমি সেই পাশ দিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছি দেখিয়া মা থামিয়া আমাকে বলিতেছেন, "ওপাশ দিয়ে এগিয়ে যাও।" আমি প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। মাকে বার দুই থামিতে দেখিয়া তখন খেয়াল হইল।

"ভগবান বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে আসেন যেথায় ভক্ত ডাকে। কোজাগর পূর্ণিমার দিন লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ থেকে পৃথিবীতে আসেন। যেখানে যেখানে তাঁর দৃষ্টি থাকে, যান, পূজা গ্রহণ করেন। আমার শাশুড়ী কামারপুকুরে দেখেছিলেন, চোদ্দ-পনর বছরের মেয়ে, গৌরবর্ণ, কানে শঙ্খের কুণ্ডল, হাতে হীরার বালা (ডায়মনকাটা বালা)। বকুলতলায় (ঠাকুরের বাড়ীর সামনে) দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন। শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁগা, কে তুমি?' লক্ষ্মী বললেন, 'এই আমি এইখানেই আসছি।' শাশুড়ী বললেন, 'আমার ছেলেকে (শ্রীযুত রামকুমারকে) দেখেছ? পূজো করতে গেছে, রাত হয়েছে, এখনও এল না।' লক্ষ্মী বললেন, 'হাঁ গো, সে আসছে, চালকলা বেঁধেছে, এই যে আমিও সেইখান থেকেই তোমাদের বাড়ী আসছি।' আমার শাশুড়ী বললেন, 'না মা, বাড়ীতে কেউ নেই, এখন এস না।' এইরূপে বারবার প্রত্যাখ্যান করায় 'আচ্ছা, আমার অমনিই দৃষ্টি থাকবে' বলে দেবী অন্তর্দ্ধান হলেন। দেখছ না ওদের অবস্থা কখনও তেমন ভাল হল না, মোটা ভাত-কাপড় চলে যাচ্ছে।

"আমার শাশুড়ী দেখেছিলেন, লক্ষ্মী লাহাদের বাড়ীর দিক থেকে তাদের ধানের মরাইগুলির ওখান ঘুরে এসেছিলেন। আমার ভাসুর এসে সব শুনে বললেন,

'মা, তুমি বুঝতে পার নি, স্বয়ং লক্ষ্মী এসেছিলেন কোজাগর পূর্ণিমা কিনা আজ।' তিনি গণনা জানতেন, খড়ি পেতে দেখেছিলেন।

"তাঁর খাবার কি দরকার? তিনি ভক্তের সন্তোষের জন্য আসেন, খান। প্রসাদ খেলে চিত্তশুদ্ধি হয়। এমনি অন্ন খেলে চিত্ত মলিন হয়।" *

আমি—সত্যই কি ঠাকুর খান?

মা—হাঁ, আমি কি দেখি না যে ঠাকুর খেলেন কি না? ঠাকুর খেতে বসেন, খান।

আমি—তুমি দেখ?

মা—হাঁ, কারুরটা দেখি তিনি খেলেন, কারুরটা হয়ত দৃষ্টিমাত্র করলেন। তা তোমারও কি সব জিনিষ সব সময় খেতে ভাল লাগে, না সকলের জিনিষ খেতে পার? অমনি। যার যেমন ভাব ভক্তি। ভক্তিটিই প্রধান।

আমি—ভক্তি কি করে হবে? আপন ছেলেও যদি অন্যে পালন করে ত মাকে মা বলে জানে না।

---

* জনৈক ভক্ত মার নিকট হইতে গৈরিক বস্ত্র লইয়াছিল। সে কয়েক বৎসর অসুখে ভোগে। ঐ সময় পরিবর্ত্তনের জন্য নানা স্থানে ছিল। পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের আশ্রমের পরিবর্ত্তে বাড়ীতে গিয়া থাকে এবং একদিন জয়রামবাটী গিয়া মাকে গৈরিক বস্ত্র ফিরাইয়া দেয়। এই উপলক্ষ্যে মা বলিয়াছিলেন, "আহা! এর বিষয়ীর অন্ন খেয়ে বুদ্ধি মলিন হয়ে গেছে।"

মা—হাঁ, তাই ত। তাঁর কৃপা চাই। কৃপার পাত্র হওয়া চাই।

আমি—কৃপার আবার পাত্রাপাত্র কি? কৃপা সকলের উপর সমান।

মা—নদীর কূলে বসে ডাকতে হয়, সময়ে তিনি পার করবেন।

আমি—সময়ে ত সবই হয়; তাতে তাঁর কৃপা কি?

মা—তাঁ মাছটি ধরতে হলে ছিপটি ফেলে বসতে হয় না?

আমি—তিনি আপনার জন হলে আবার বসে থাকা কেন?

মা—তা বটে। তা অসময়েও হয়। আজকাল লোকে অসময়েও আম কাঁটাল ফলাচ্ছে। ভাদ্র মাসেও কত আম হচ্ছে।

আমি—আমাদের কি দৌড় ঐ পর্য্যন্ত, যে যা চায়, তাকে তাই দিয়ে তিনি বিদায় করে দিলেন? না এ ছাড়া আপনার মত করে তাঁকে পাওয়া যায়? তিনি আমার আপনার কি না?

মা—হাঁ, তিনি আপনার। চিরসম্বন্ধ। তিনি সকলের আপনার, যেমন ভাব তেমনি লাভ।

আমি—ভাব ত স্বপ্নবৎ, যেমন ভাবতে ভাবতে শেষে তাই স্বপ্ন দেখছে।

মা—স্বপ্ন বই কি! জগৎই স্বপ্নবৎ। এটাও (এই জাগ্রৎ অবস্থা) একটা স্বপ্ন।

আমি—না, এতটা স্বপ্ন নয়। তা হলে পলকে ভাঙ্গত। এ যে অনেক জন্ম ধরে রয়েছে!

মা—তা হোক। স্বপ্ন বই আর কিছু নয়। এই যে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছ, এখন তা নেই। (বাস্তবিকই গত রাত্রে আমি একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।) চাষা স্বপ্ন দেখেছিল—রাজা হয়েছে, আট ছেলের বাপ হয়েছে। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে বলেছিল, 'সেই আট ছেলের জন্য কাঁদব, না এই এক ছেলের জন্য কাঁদব?'

এইরূপ তর্কের পর শেষে বলিলাম, "মা, ওসব যা বলি, ওর জন্য আমি মাথা ঘামাই না। আমি জানতে চাই আমার কেউ আপনার আছে কি না?"

মা—আছে বই কি, নিশ্চয় আছে।

আমি—ঠিক?

মা—হাঁ।

আমি—আপনার জন হলে তার দেখা পেতে ডাকতে হবে কেন? আপনার জন যে, সে না ডাকলেও দেখা দেয়। বাপ মা যেমন করেন, তিনি কি তেমন করছেন?

মা—করছেন বই কি, বাছা, তিনিই বাপ-মা হয়েছেন। তিনিই বাপ-মারূপে পালন করছেন। তিনিই দেখছেন।

নইলে কোথা ছিলে, কোথা এলে! তারা প্রতিপালন করলে, শেষে দেখলে এ আমাদের নয়। যেমন কাকের বাসায় কোকিল পালে না?

আমি—ঠিক ঠিক আপনার জন পাব কি না?

মা—পাবে, পাবে, তুমি সব পাবে। যা ভাব সব পাবে। স্বামিজী পেয়েছিলেন না? স্বামিজী যেমন পেয়েছিলেন তেমন পাবে।

আমি—মা, যাতে আমার ভয়-সঙ্কোচ না থাকে (মায়ের প্রতি)।

মা—না, সঙ্কোচ কি? আমি ত রুই গেঁথেছি।

আমি—বেশ ত, আমরা খাব।

মা—হাঁ, তাই ত। একজনে ছাঁচ করলে তা থেকে অনেক গড়ন হয়।

আমি—তুমি করলেই আমাদের হবে। তুমি আর ছাড়িয়ে যেতে পারছ না।

মা—হাঁ, বাবা, আমি করলেই তোমাদের হবে।

২৬-১১-১০, উদ্বোধন, সকাল ৭টা

পূর্ব্ব দিনে মা গুপ্ত-মহারাজের অসুখ দেখিতে গিয়াছিলেন। বশী ও টাবু গুপ্ত-মহারাজের খুব সেবা করিতেছে।

মা সেই কথার উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে প্রশংসা করিতেছেন—“ওরাই সাধু, ওরাই ধন্য! আর সাধু কি?”

“যোগীন চাটুজ্যেকেও (নিত্যানন্দ স্বামীকে) তার ছেলেরা (শিষ্যেরা) খুব সেবা করছে। পূর্ব্ববঙ্গের তারা সব। কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা ছেলেরা সব করত। তিনি তাদের নানা কথায় আনন্দে রাখতেন। বলতেন, ‘একটু আনন্দ না পেলে ওরা কেমন করে পারবে।’ তিনি সব্বায়ের মন বুঝে চলতেন। সেবার তেমন দরকার হত না। হয়ত দশ-বার দিন অন্তর একটু বাহ্যে হত। তবে রাত জাগতে হত। খাওয়া ত বড় ছিল না—একটু সুজি, তাও ছেঁকে দিতে হত। মাংসের যূষ হত। দুটো মরা কুকুর তার ছিবড়ে খেয়ে এই মোটা হল! একদিন—তখন অকাল—আমলকী খেতে চাইলেন। দুর্গাচরণ (নাগ মহাশয়) তিন-দিন পরে গোটা দুই-তিন আমলকী নিয়ে উপস্থিত হল। বেশ বড় আমলকী। তিন দিন তার খাওয়া-দাওয়া নেই। ঠাকুরের আমলকী হাতে করে কান্না। বললেন, ‘আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ঢাকা-টাকা চলে গেছ।’ আমাকে বললেন, ‘ঝাল দিয়ে একটা চচ্চড়ি রেঁধে দাও। ওরা পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক, ঝাল বেশী খায়।’ আর আর সব রাঁধা ছিল। বললেন, ‘একখানা থালায় সব বেড়ে দাও। ও প্রসাদ না হলে খাবে না।’ ঠাকুর তা প্রসাদ করে দিতে বসলেন।

সে সব দিয়ে ভাত প্রায় এত কটা খেলেন। তবে দুর্গাচরণ প্রসাদ পেল। তখন বাগানে খুব খরচ হয়। তিনটা রান্না —ঠাকুরের একটা, নরেনদের একটা, অপর সবার একটা। চাঁদা করলে টাকার জন্য। তাই চাঁদার ভয়ে একজন আবার ভেগে গেল।

"পাপগ্রহণ করে তাঁর শরীরে ব্যাধি। বলতেন, 'গিরিশের পাপ। ও কষ্ট ভোগ করতে পারবে না।' তাঁর ইচ্ছামৃত্যু ছিল। সমাধিতে অনায়াসে দেহ ছাড়তে পারতেন। বলতেন, 'আহা, ওদের (ছেলেদের) একটা ঐক্য করে বেঁধে দিতে পারতুম!' এত দিন ত এ বলছে, 'নরেন বাবু কেমন আছেন?' ও বলছে, 'রাখাল বাবু কেমন আছেন?'—এই রকম ছিল। তাই অত কষ্টেও দেহ ছাড়েন নি।"

১৪-৪-১১, উদ্বোধন, ঠাকুরঘর, সকালবেলা

রোজ ঠাকুরপূজার জন্য যে ফুল আসে তাহা লইয়া উপরে গিয়াছি। বেলা অধিক হইয়াছে, তাই মা বলিলেন, "ফুলটি যখন আসে দিয়ে যাবে।" মা নিজেই পূজার সব যোগাড় করিতেন এবং পূজা করিতেন। হাত ইসারা করিয়া আমাকে কাছে ডাকিলেন। মা তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। জনৈক ভক্তের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মা—ও নীচে আছে ?

আমি—হাঁ।

মা—কি করে ? পড়ে টড়ে ?

আমি—মধ্যে মধ্যে হয়ত পড়ে।

মা—মঠে বুঝি যাবে না ?

আমি—না, তার যেতে ইচ্ছা নেই।

মা—তোমরা বুঝিয়ে বলবে।

আমি—আমি ঢের বলেছি, তুমি বল যাতে গিয়ে অন্ততঃ দু-চার দিন থাকেন।

মা—বাবা, আমিও ঢের বলেছি, আমি বললেও শুনবে না। মঠে গেলে পাঁচজনে হাসিঠাট্টা করবে, তাই সে কিছুতেই যেতে চায় না। শরৎ কত করে আমাকে বললে, 'মহারাজের কথা, আমাদের কথা কি মোটেই শুনতে নেই ? মঠে গিয়ে অন্ততঃ দুদিন থেকে মহারাজের কথাটা মান্য করে আসুক।' তাই ত, রাখালের সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন পুরীতে থাকুক না। একা একা কোথায় যাবে, কোথায় খাওয়াটি জুটবে ?

আমি—খাওয়ার জন্য কিছু নয়, ভিক্ষা করে খাবে। তবে মহারাজ এবং অন্যান্য গুরুজন বলছেন, এঁদের কথা মান্য করবার জন্যও ত একবার যাওয়া উচিত।

মা—হাঁ, তাই ত, গুরুজনের কথা। ওর কাজ করতেই

ইচ্ছে নেই। কাজ না করলে কি মন ভাল থাকে ? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যান চিন্তা করা যায় ? তাই কাজ নিয়ে থাকতে হয়, ওতে মন ভাল থাকে। তোমাদের এখানে কাজকর্ম্ম কেমন চলছে ?

আমি—তা একরকম চলে যাচ্ছে।

মা—তুমি রামেশ্বর যাবার কথা লিখেছিলে। তা যাও নি, বাবা, বেশ করেছ, পথে যা ওঠা-নামা !

আমি—শরৎ মহারাজ চেষ্টা করেছিলেন। তা অত টাকা কোথায় জুটবে ? গেলে শশী মহারাজের উপরই খরচ পড়ত।

মা—হাঁ, হাজার টাকা খরচ হয়েছে শশীর।

পরদিন মা ঠাকুরঘরের দক্ষিণপাশের ঘরে পান সাজিতেছিলেন। বেলা এগারটা হইবে। উপরে গিয়াছি। মা পূর্ব্বোক্ত ভক্তটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও চলে গেল ?"

আমি—হাঁ, কাঞ্জিলালের বাড়ীতে আজ থাকবে, হয়ত কালও থাকতে পারে। শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'যদি অভিমান অহঙ্কার করে গিয়ে থাকে ত দিন দিন আরও খারাপ হবে। আর যদি লজ্জায় কি করে মুখ দেখাবে এই ভাব থেকে গিয়ে থাকে তবে ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়ত মোড় ফিরে ভালও হতে পারে।'

মা—কিই বা হয়েছে ? বেটাছেলে, মেয়ে ত নয় ? ...

ভাঙ্গতে সব্বাই পারে, গড়তে পারে ক'জনে ? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু তাকে ভাল করতে পারে ক'জনে ? দুর্ব্বলতা ত মানুষের আছেই। ...

আমি—শরৎ মহারাজ বললেন, "একা থাকা উন্নত মন হলে সম্ভব, নতুবা যার দোষী মন, তার আরও অধোগতি হয় ওতে।"

মা—কি ভয় ? ঠাকুর রক্ষা করবেন। কত সাধু একা থাকে না ?

আমি—হৃদয় মুখুয্যেও শেষটায় ঠাকুরের সঙ্গছাড়া হয়েছিলেন।

মা—তা ভাল জিনিসটি কি কেউ চিরদিন ভোগ করতে পায় ?

আমি—তিনি ঠাকুরকে অনেক কষ্টও নাকি দিতেন, গাল-মন্দ করতেন।

মা—যে অত সেবা করে পালন করেছে, সে একটু মন্দ বলবে না ? যে যত্ন করে সে অমন বলে থাকে।

আমি—ইনিও তোমার এত সেবা করলেন, শেষে এই হল !

মা—তা শাসন না থাকলে চলবে কেন ? ভাল হবে কি করে ?

জয়রামবাটী

একবার আশ্বিন মাসে ৺দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন দুইটি যুবক ভক্ত শ্রীশ্রীমার নিকট জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইল। অষ্টমীর দিন তাহারা পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিল। তারপর একজন বলিল, "মা, আমায় সন্ন্যাস দাও।" অপরটিও তাহাতে যোগ দিল। মা একটু হাসিয়া বলিলেন (দৃষ্টি একটু অস্বাভাবিক), "সব হবে, বাবা, চিন্তা কি ?" ভক্তটি জেদ করিয়া আবার বলিল, "তা সন্ন্যাস দিতেই হবে মা ; আমাদের গেরুয়া দাও।" এবার মা একটু গম্ভীরভাবেই বলিলেন, "গেরুয়ায় কি হবে, বাবা ? গেরুয়াতে কি আছে ? তোমরা ত বে কর নি, সন্ন্যাসী ত আছই। আর যা যা দরকার সব ক্রমে হবে।" ভক্তটি আবার বলিল, "মা, আমার ইচ্ছা হয় পৈতা কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে তৈলঙ্গ স্বামীর মত সর্ব্বদা ভগবৎচিন্তায় বিভোর হয়ে থাকি।" মা হাসিয়া বলিলেন, "হবে, বাবা, হবে।" এবার ভক্তটি একটু অস্থিরভাবেই বলিতে লাগিল, "মা, দিই ফেলে, পৈতে কাপড় ফেলে দিই।" কেবল কথায় নহে, কাজেও তাহাই করিতে যাইতেছে। মা তাহাতে একটু ব্যস্ত হইয়াই বলিলেন, "থাক্ না, থাক্ না—সময় হলে আপনিই খসে যাবে।"

তথাপি তাহার আবদার ফুরায় না। বলিতেছে, "মা,

ঠাকুরের পাগলামির একটু ছিটেফোঁটা আমায় দাও, আমায় পাগল করে দাও।” আবার বলিল, “মা, ভক্তি-টক্তি কিছুই দিচ্ছ না, ঠাকুরকে দেখাবে না?” মা বলিলেন, “হবে, বাবা, সব হবে।” উভয়ে প্রণাম করিয়া বাহিরে গেল।

মধ্যাহ্নে সকলে প্রসাদ পাইতেছেন। পায়েস খাইয়া ভক্তটি বলিয়া উঠিল, “মা, এ কি পায়েস রেঁধেছ? একটুও ভাল হয় নি।” মা হাসিয়া বলিলেন, “কি করব, বাবা, এখানে দুধ তেমন পাওয়া যায় না।” কেদারের মা নিকটে ছিলেন। তিনি বলিলেন, “বেশ ত বাবা, তোমরা সব ছেলে আছ, খুব করে জিনিসপত্র এনে দিও, মা ভাল করে খাওয়াবেন।” একথা তাহার কানেও গেল না; বলিল, “মা, এবার কিন্তু খেয়ে পেট ভরল না। আবার এসে পেট ভরে খেয়ে যাব, আর ‘উদ্বোধনে’ আমায় আর একবার দেখা দিও।” মা এ কথায় সম্মতি জানাইলেন।

পূর্ব্বাহ্নে শিলং হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের অবতারত্বে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য ইনি পণ করেন, সাত বার মাকে স্বপ্নে দর্শন না পাইলে দর্শনে যাইবেন না। মায়ের কৃপায় সাত বার পূর্ণ হইয়াছে। তাই এবার আসিয়াছেন। তিনি অপরাহ্নে বিদায় লইবেন। মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা, আসি তবে। আর কি কোন দরকার আছে?”

মা—হাঁ, বাবা, আছে বই কি। দীক্ষাটা নিয়েই যেও।

ভক্ত—তা বাগবাজারেই হবে।

মা—না, বাবা, ওটা হয়েই যাক, আজই না হয় হবে।

ভক্ত—প্রসাদ পেলুম যে ?

মা—ওতে দোষ হবে না।

তারপর দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

জয়রামবাটী হইতে বাড়ী আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্ষেপা ভক্তটীর মনোভাবের ক্রমশঃ খুব পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। ঠাকুরের দর্শনের জন্য সে অস্থির। শ্রীশ্রীমা ইচ্ছা করিলেই ঠাকুরকে দর্শন করাইতে পারেন, অথচ দেখাইতেছেন না—এই বিশ্বাসে তাহার মনে বড় অভিমান হইয়াছে। অত্যন্ত বিরক্তিভাবেই সে পুনরায় জয়রামবাটী গিয়া মাকে বলিল, "মা, ঠাকুরকে দেখাবে না ?" মা স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন, "হবে, বাবা, কেন ব্যস্ত হচ্ছ ?"

তাহার আর সহ্য হইল না। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কেবল ফাঁকি দিচ্ছ ? এই নাও তোমার জপের মালা, আমি আর কিছু চাই নে" এবং জপের মালা মায়ের দিকে ছুড়িয়া দিল। মা বলিলেন, "আচ্ছা, থাক্, ঠাকুরের ছেলে হয়ে থাক।" সে কিন্তু আর অপেক্ষা করিল না, চলিয়া গেল। কোয়ালপাড়া মঠে তাহার মালা গচ্ছিত রহিল।

ইহার পর ভক্তটি রীতিমত পাগল হয়। সব মহারাজ-

দিগকে গালাগালি দিয়া পত্রাদি লিখিত। শ্রীশ্রীমাকেও কটূক্তিপূর্ণ পত্র লিখিত। তাহার নানা উৎপাতের জন্য সে একদিন মারও খাইয়াছিল।

এই ভক্তটির সম্বন্ধেই আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, সে কি মন্ত্রও ফেরত দিয়াছিল? মালা ত ছুড়ে মারলে। মন্ত্র কি কখনও ফেরত দিতে পারে?"

মা—তা কি কখনও হয়? এ সজীব মন্ত্র। ও কি ফেরত হয়? যে মন্ত্র একবার পেয়েছে—মহামন্ত্র। যাঁর (যে গুরুর) উপর একবার ভালবাসা হয়েছে, তা কি কখনও যায়? ও একদিন না একদিন, যখন প্রকৃতিস্থ হবে তখন আবার এদের সবার পায়ে ধরবে।

আমি—মা, কেন এমন হয়?

মা—তা হয়ে থাকে। এক গুরুই কত জনকে মন্ত্র দেন, সবাই কি সমান হয়? যে যেমন আধার তাতে তেমনি বিকাশ হয়। ও জয়রামবাটীতে বললে, 'মা, আমায় পাগল করে দাও।' আমি বললুম, পাগল হবে কেন? অনেক পাপ না হলে কি পাগল হয়? বলে, 'আমার ছোট ভাই ঠাকুরকে দর্শন করছে, আমায়ও দেখিয়ে দাও।' আমি বললুম, সাদা চোখে কে কবে দেখ্‌ছে? তবে চোখ বুজে দেখতে পারে। চোখ বুজলেও ছবি মনে পড়ে না? ছেলেমানুষ, হয়ত তাই দেখে ভাবছে ঠাকুর দেখছি।

বললুম, তা তুমিও সাধনভজন কর, তাঁকে প্রার্থনা কর, তোমারও দর্শন হবে।' মানুষ আপন মনে জানতে পারে সে কতদূর এগিয়েছে, কতদূর জ্ঞান চৈতন্য হয়েছে। অন্তরে অন্তরে বুঝতে পারে যে কতদূর তার ঈশ্বরলাভ হয়েছে। নতুবা সাদা চোখে কে দেখ্‌ছে ?

'উদ্বোধনে' ধমক খাইয়া ভক্তটি বাগবাজারে গঙ্গার ধারে পড়িয়া থাকিত। কখনও বা উদ্বোধনের রোয়াকে বসিয়া থাকিত। আসিলে তুপুরে রোয়াকে বসিয়াই তুটি খাইয়া যাইত। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে একদিন তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া রাজী করাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি-ক্রমে (উদ্বোধনে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। মা তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "ঠাকুর বলতেন, 'যারা আমাকে ডাকবে তাদের জন্য আমাকে অন্তিমে দাঁড়াতে হবে।' এটি তাঁর নিজ মুখের কথা। তুমি আমার ছেলে, তোমার ভয় কি ? তুমি কেন অমন পাগল হয়ে চলবে ? এতে যে তাঁর তুর্নাম হবে ! লোকে বলবে, 'তাঁর ভক্ত পাগল হয়েছে।' তোমার কি এমন করা উচিত, যাতে তাঁর তুর্নাম হয় ? যাও, বাড়ী যাও, দশ জনে যেমন আছে, বেশ খাওদাও, থাক। যখন তোমার দেহ যাবে তখন তিনি দেখা দিয়ে নিয়ে যাবেন। কে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছে বল না ? এক নরেন দেখেছিল। সেও যখন তার খুব

ব্যাকুলতা—ঐ সব দেশে (আমেরিকায়)। তখন তিনি (ঠাকুর) তার হাত ধরে রয়েছেন, বোধ করত। তাও কিছুদিনের জন্য। বেশ, যাও, বাড়ী গিয়ে থাক। সংসারীদের কত কষ্ট ! এই সেদিন রামের ছেলে মারা গেল। তোমরা ঘুমিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ।” তারপর বলিলেন, “সেদিন আমি পুজা করছিলুম। পূজা করতে করতে দেখি এর মুখটি—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গোপালটির মত। সেইদিনেই খানিক পরে এসে উপস্থিত।”

মায়ের এই সকল উপদেশ ও সান্ত্বনায় ভক্তটিকে অনেকটা শান্ত দেখা গেল। সেদিন দুপুরে প্রসাদ পাইয়া সে দেশে চলিয়া গেল। বাড়ী গিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮, জয়রামবাটী

শ্রীশ্রীমা ৺রামেশ্বরদর্শনের পর কলিকাতায় কয়েক-দিন অবস্থান করিয়া ৫ই জ্যৈষ্ঠ জয়রামবাটী পৌঁছিয়াছেন। পুরাতন বাড়ীতে মায়ের ঘরের বারান্দায় সন্ধ্যার সময় কথা হইতেছে। মা জনৈক ভক্তের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মা—সে কি বললে ?

আমি—তাঁর প্রাণটা তোমার জন্য কেমন ব্যাকুল হয়েছে তিন-চার মাস ধরে।

মা—সে কি? সাধু সব মায়া কাটাবে। সোনার শিকলও বন্ধন, লোহার শিকলও বন্ধন। সাধুর মায়ায় জড়াতে নেই। কি কেবল 'মাতৃস্নেহ' 'মাতৃস্নেহ' করে 'মায়ের ভালবাসা পেলুম না'! ওসব কি? বেটাছেলে সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ফেরা—আমি ওসব ভালবাসি না। মানুষের আকৃতিটা ত? ভগবান ত পরের কথা। আমাকে কুলের ঝি বউ নিয়ে থাকতে হয়। আশু উপরে আনাগোনা করত, চন্দন ঘষা, এটি সেটি। আমি ধমকে দিলুম।

আমি—বেদান্তবাদী সাধু যারা, তারা সব কি নির্ব্বাণে যাবে?

মা—তা বই কি? মায়া কাটিয়ে কাটিয়ে নির্ব্বাণ হবে—ভগবানে মিশে যাবে। বাসনা হতেইত দেহ। একটু বাসনা না থাকলে দেহ থাকে না। একেবারে নির্ব্বাসনা হল ত সব ফুরাল।

"কোন ছেলে এল, খেলে দেলে, চ'লে গেল। মায়া কি? হাজরা ঠাকুরকে বলেছিল, 'আপনি নরেন-টরেন ওদের জন্য অত ভাবেন কেন? তারা আপনার মনে খাচ্ছে-দাচ্ছে, আছে। আপনি ভগবানের চিন্তায় মন স্থির করুন। আপনার আবার মায়া কেন?' ঠাকুর তার কথামত সব মায়া কাটিয়ে ভগবানে মন লীন করলেন।

দাড়ির চুল, মাথার চুল এমনি (দেখাইয়া) সোজা হয়ে কাঁটা দিলে, কদমফুলের মত। একবার ভাব দেখি, সে লোকটি কি ছিলেন! ঠাকুর তখন বাহ্যে গিয়েছিলেন। রামলাল আর শৌচ করাতে পারলে না। কাকে শৌচ করাবে? সব শরীর জড়, কাঠ—শক্ত! তখন রামলাল বলতে লাগল, 'যেমনটি ছিলে তেমনটি হও, যেমনটি ছিলে তেমনটি হও।' বলতে বলতে শেষে দেহে মন এল। দয়ায় মনকে নামিয়ে রাখতেন।

"যোগীন যখন দেহ রাখলে, নির্ব্বাণ চাইলে। গিরিশ বাবু বললেন, 'ত্যাখ্ যোগীন, নির্ব্বাণ নিস্ নি নিস্ নি। ঠাকুর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, চন্দ্র সূর্য্য তাঁর চক্ষু—এত বড় ভাবিস্ নি। যেমন ঠাকুরটি ছিলেন, তেমনটি ভেবে ভেবে তাঁর কাছে চলে যা।'

"দেবতা বল, যা বল—সব এসে পৃথিবীতে জন্মাচ্ছে। সূক্ষ্মদেহে ত আর খাওয়া-পরা, কথাবার্ত্তা কিছু নেই, তাই বেশী দিন থাকতে পারে না।"

আমি—খাওয়া-পরা, কথাবার্ত্তা নেই, তবে কি নিয়ে সময় কাটায়?

মা—কাঠের পুতুলটির মত যুগযুগান্তর ধরে যেখানে আছে সেইখানেই থাকে। রামেশ্বরে যেমন দেখলুম, রাজাদের সব পাথরের মূর্ত্তি পোষাক পরা রয়েছে। আবার

ভগবানের দরকার হয় ত তিনি নিয়ে আসেন সেখান থেকে। বিভিন্ন দেবলোক সব আছে কিনা—জনলোক, সত্যলোক, ধ্রুবলোক। স্বামিজীকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন, ঠাকুর বলেছেন। তাঁর কথা বেদবাক্য ত, মিথ্যা হবার যো নেই।

আমি—তবে আমাদেরও কি কাঠ-মাটীর পুতুলের মত হয়ে থাকতে হবে?

মা—না, তোমরা তাঁর সেবা করবে। তুটি থাক আছে। একটি এখানকার মত ভগবানের সেবাদি নিয়ে থাকে। অপরটি ঐ রকম পুতুলের মত যুগযুগান্তর ধরে ধ্যানমগ্ন।

আমি—মা, ঠাকুর বলতেন যে ঈশ্বরকোটি নির্ব্বাণের (নির্ব্বিকল্প সমাধির) পরও ফেরে, আর কেউ পারে না, এর মানে কি?

মা—ঈশ্বরকোটি নির্ব্বাণের পরও মনটি গুছিয়ে আনতে পারে।

আমি—যে মন লীন হয়ে গেল, সে মন কি করে ফিরে আসে? একঘটি জল পুকুরে ফেলে দিলে কি করে সেই জলটুকুই বেছে আনবে?

মা—সব্বাই পারে না। যাঁরা পরমহংস তাঁরা পারেন। হাঁস, জল তুধ একত্র করে দাও, তুধটুকু বেছে খাবে।

আমি—সবাই কি নির্ব্বাসনা হতে পারে ?

মা—তা পারলে ত সৃষ্টি ফুরিয়ে যেত। পারে না বলেই ত সৃষ্টি চলছে—পুনঃ পুনঃ জন্মাচ্ছে।

আমি—যদি গঙ্গায় দেহত্যাগ হয় ?

মা—বাসনা ফুরুলেই হয়, নইলে কিছুতেই কিছু নয়। বাসনা না ফুরুলে শেষ জন্ম হলেই বা কি হবে ?

আমি—মা, এই অনন্ত সৃষ্টিতে কোথায় কি হচ্ছে কে জানে ? এই যে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, ওতে কোন জীবের বাস আছে কি না কে বলবে ?

মা—মায়ার রাজ্যে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে। ওসব গ্রহ-নক্ষত্রে কোন জীবের বাস নেই।

এই বৎসর বর্ষাকালে একদিন পূজনীয় শরৎ মহারাজ, যোগেন মা ও কয়েকজন ভক্ত জয়রামবাটী হইতে কামার-পুকুর গিয়াছেন। সেখানে আছাড় খাওয়ায় যোগেন মার শরীরের কয়েকস্থান হইতে রক্ত পড়িয়াছে। আমি পূর্ব্বেই ফিরিয়া মাকে যোগেন মার কথা বলাতে মা দুঃখ করিয়া বলিলেন, "গোলাপ বলেছিল, 'যোগেন যে যায়, দেখি কটা আছাড় খায়।' তার এই কথাটির মানরক্ষার জন্য যোগেন এই আছাড়টি খেলে। সাধুবাক্য ত ? জপ তপ করে কিনা, না ফলে যায় না। তাই সাধুদের কাউকে কিছু বলতে নেই।"

১৬-১-১২ (২রা মাঘ, ১৩১৮)

উদ্বোধন, মায়ের ঘর, সকালবেলা

আমি বলিলাম, "মা, চৈতন্যদেব নারায়ণীকে আশীর্ব্বাদ করলেন, 'নারায়ণি, তোমার কৃষ্ণে ভক্তি হোক'। তিন-চার বছরের মেয়ে অমনি 'হা কৃষ্ণ' বলে ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। একটী গল্প আছে যে নারদের সিদ্ধিলাভের পর একটা পিঁপড়ে দেখে হঠাৎ কি রকম দয়া এল। ভাবলেন, 'আমার কত জন্ম তপস্যার পর তবে সিদ্ধিলাভ হল, আর এর মানুষ হতেই ত কত দেরী !' দয়ায় পিঁপড়ে-টাকে আশীর্ব্বাদ করলেন, 'মুক্ত হয়ে যাও, মুক্ত হয়ে যাও।' অমনি পিঁপড়েটা পক্ষী, পশু ইত্যাদি ইতর জীবদেহ ধারণ করে ক্রমে মানুষ হল। মানুষদেহে অনেক জন্ম ভোগ করে করে ক্রমে তপস্যায় মন এল এবং ভগবানকে আরাধনা করে মুক্ত হল। এই সব অসংখ্য জন্মের খেলা নারদের চোখের সামনে যেন মুহূর্ত্তমধ্যে হয়ে গেল। তা মহাপুরুষের কৃপা হলে ত যখন তখন হয়।"

মা—তা হয়।

আমি—তবে শুনেছি, অপরের পাপের বোঝা নিয়ে শরীর থাকে না। যে শরীর দ্বারা অনেকের উদ্ধার হত, সেই শরীর হয় ত একজনের জন্যই ক্ষয় হয়।

মা—হাঁ, তাঁর শক্তিও কমে যায়। যে সাধন-তপস্যার

শক্তির দ্বারা অনেকের উদ্ধার হত তা একজনের জন্যই ক্ষয় হয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, 'গিরিশের পাপ নিয়ে আমার শরীরে এই ব্যাধি।' তা গিরিশও এখন ভুগছে।

আমি—মা, আমি একদিন স্বপ্ন দেখি যে একটা লোক, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, এসে তোমাকে খুব ধরে বসেছে, তুমি যাতে তাকে সত্যসত্যই কিছু করে দাও। সে তোমার কাছ থেকে পূর্ব্বে মন্ত্র নিয়েছে। কিন্তু নিজে কোন সাধনভজন করবে না। তুমি বলছ, 'একে যদি আমি এখনি কিছু করে দিই, তা হলে আর আমি বাঁচব না, আমার দেহ থাকবে না।' আমি দুহাতে তোমাকে নিষেধ করছি আর বলছি, 'ওকে কেন করে দেওয়া ? ও নিজে করতে পারবে, সাধন করুক।' সে ঐরকম বারবার বলাতে তুমি যেন ত্যক্ত হয়ে তার বুক ও ঘাড় স্পর্শ করে কি করে দিচ্ছ এবং খানিক করতেই কেবল ঐ বলছ, 'একে যদি আমি এখনি কিছু করে দি, তা হলে আর আমি বাঁচব না, আমার দেহ থাকবে না।' তখন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। আচ্ছা, দেহধারণ করলে কি শক্তি সীমাবদ্ধ হয় ?

মা—হাঁ, তা হয়। এক একটা লোকের জ্বালায় ত্যক্ত হয়ে অনেক সময় মনে হয়, 'আর এ দেহ ত যাবেই, তা যাক না এক্ষণি, দিয়ে দিই।' এই যে রাধী রাধী করি,

এ ত একটা মোহ নিয়ে আছি। আমার পাগলা-টাগলাকে ভয় করে। আবার সেইটে আসে, না কি করে। তুমি (মঠে) চলে যাচ্ছ, ভয় হয়।

আমি—মা, ভগবান-দর্শন মানে কি জ্ঞানচৈতন্যলাভ ? না আর কিছু ?

মা—জ্ঞানচৈতন্যলাভ না ত আর কি ? নতুবা কি দুটো শিং বেরোয় ?

আমি—এদের (এখানকার অনেক ভক্তদের) ভগবান-দর্শন মানে অন্য রকম—তাঁকে চোখে দেখা, কথা বলা।

মা—'বাবাকে দেখিয়ে দাও, বাবাকে দেখিয়ে দাও' বলছে। তিনি এত কারুর বাবা নন। 'গুরু, কর্ত্তা, বাবা'—এই তিনে তাঁর গায়ে কাঁটা বিঁধত। কত মুনি ঋষি যুগ-যুগান্তর তপস্যা করে পেলে না; তা সাধন নেই, তপস্যা নেই, এখনই দেখিয়ে দাও! আমি এত পারব না। তিনি কাকে দেখিয়ে দিয়েছেন বল না ?

আমি—আচ্ছা, মা, কেউ চাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না; আবার কেউ চাচ্ছে না, তাকে দিচ্ছেন—এ কথার মানে কি ?

মা—ঈশ্বর বালকস্বভাব কি না। কেউ চাচ্ছে, তাকে দিচ্ছেন না; আবার কেউ চায় না, তাকে সেধে দিচ্ছেন। হয়ত তার পূর্ব্বজন্মে অনেক এগুনো ছিল। তাই তার উপর কৃপা হয়ে গেল।

আমি—তা হলে কৃপাতেও বিচার আছে ?

মা—তা আছে বই কি। যার যেমন কর্ম্ম করা থাকে। কর্ম্ম শেষ হলেই ভগবান-দর্শন হয়। সেটি শেষ জন্ম।

আমি—মা, জ্ঞানচৈতন্যলাভ করতে হলে সাধন, কর্ম্ম-ক্ষয়, সময় এসব দরকার মানলুম। কিন্তু তিনি যদি আপন জন হন, তবে কি তিনি ইচ্ছা করলেই দেখা দিতে পারেন না ?

মা—ঠিক কথা, তবে এ সূক্ষ্মটি তুমি যেমন ধরে বসেছ তেমনটি আর কে ধরে বসেছে ? সব্বাই ওটা একটা করতে হয় তাই করে যাচ্ছে ; ঈশ্বরকে চায় ক'জনে ?

আমি—আমি তোমাকে আগে একদিন বলেছিলুম যে আপন মায়েরও যদি যত্ন স্নেহ না পায় তবে ছেলে মাকেও মা বলে জানে না।

মা—তা ত ঠিক কথাই। দেখা না পেলে কোথা থেকে ভালবাসা হয় ? এই তোমার সঙ্গে দেখাটি হয়েছে—আমি তোমার মা, তুমি আমার ছেলে।

১-২-১২, উদ্বোধন

আজ রাত প্রায় সাড়ে নয়টার সময় মায়ের নিকট গিয়াছি। সমস্ত দিন যাই নাই দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজ কোথায় ছিলে ?"

আমি—নীচে হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

মা—প্রকাশ তাই বলছিল। যে ত্যাগ করেছে তার কি আর ওসব ভাল লাগে? ঠাকুরের মাইনে নিয়ে হিসাবে কি গোল ছিল, কম দিয়েছিল। আমি খাজাঞ্চীকে বলতে বলায় বললেন, 'ছি ছি! হিসাব করব?'

"ঠাকুর এইটি আমাকে বলেছিলেন, 'যে তাঁর নাম নেয়, তার কোন দুঃখ থাকে না; তা আবার তোমার (শ্রীশ্রীমার) কথা?' এটি তাঁর নিজ মুখের কথা। তাঁর ত্যাগই ছিল ভূষণ।"

৮-২-১২, উদ্বোধন

ঠাকুরঘরের পাশের ঘরটির উত্তরধারে মাদুর কিম্বা কম্বল পাতিয়া দেওয়া হইত। মা সকালবেলা ঐখানটিতে অনেক সময় বসিতেন। কখনও একটু জপ করিতেন—পূর্ব্ব মুখ হইয়া বসিয়া। আমরা যখন এই ঘরে মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতাম, তখন প্রায়ই এইখানে বসিতাম। আজও মা এইস্থানে বসিয়া আছেন।

আমি—মা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে কত দিন ছিলে?

মা—তা অনেক দিন ছিলাম। ষোল বছরের সময় এসেছি। তদবধি বরাবর ছিলুম। মধ্যে মধ্যে বাড়ী যেতুম। রামলালের বিয়ের সময় গিছলুম। দু-তিন বছর অন্তর যেতুম।

আমি—একা থাকতে ?

মা—কখনও কখনও একা ছিলুম। আমার শাশুড়ী থাকতেন। মধ্যে মধ্যে গোলাপ, গৌরদাসী এরা সব থাকত। এইটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা, খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হত—প্রায়ই পেটের অসুখ ছিল কি না, কালীর ভোগ সহ্য হত না। অপর সব ভক্তদের রান্না হত। লাটু ছিল ; রামদত্তের সঙ্গে রাগারাগি করে এল। ঠাকুর বললেন, 'এ ছেলেটি বেশ, ও তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।' দিনরাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়ত রামদত্ত এল। গাড়ী থেকে নেমেই বলছে, 'আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।' আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন-চার সের ময়দার রুটি হত। রাখাল থাকত ; তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হত। সুরেন মিত্তির মাসে মাসে ভক্তসেবায় দশ টাকা করে দিত। বুড়ো গোপাল বাজার করত। নাচ, গান, কীর্ত্তন, ভাব, সমাধি দিনরাতই চলছে। সামনে বাঁশের চেটাইয়ের বেড়া দেওয়া ছিল। তাই ফুটোফুটো করে দাঁড়িয়ে দেখতুম। তাই ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে বাত ধরে গেল।

"যত্নর মা বলে একটি ঝি কিছুদিন ছিল। এক বুড়ি আসত, পূর্ব্বে অসৎ ছিল। এখন বুড়ো হয়েছে, হরিনাম করে। একাটি একাটি ; তবুও আসছে, ওর সঙ্গে কথা

কইতুম। একদিন ঠাকুর দেখে বললেন, 'ওটাকে এখানে কেন?' আমি বললুম, 'ও এখন ভাল কথাই ত কয়, হরিকথা কয়; তাতে দোষ কি?' মানুষের ত আর মনে সব সময় পূর্ব্বভাব থাকে না। তিনি বললেন, 'ছি ছি! বেশ্যা—ওর সঙ্গে কি কথা? শত হোক, রাম রাম!' পাছে কুবুদ্ধি শিখায় এই ভয়ে তিনি ওসব লোকদের সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত কইতে নিষেধ করতেন। এত করে আমাকে রক্ষা করতেন।

"কামারপুকুরে একজন তাঁকে দেখতে এসেছিল। লোকটা ভাল নয়। সে চলে যাবার পর ঠাকুর বললেন, 'ওরে, দে, দে, ওখানটার এক ঝোড়া মাটি ফেলে দে।' কেউ ফেলতে না যাওয়ায় নিজেই কোদালটা নিয়ে ঠন্‌ঠন্ করে খানিকটা মাটি ফেলে দিয়ে তবে ছাড়লেন। বললেন, 'ওরা যেখানে বসে, মাটি সুদ্ধ অশুদ্ধ হয়।'

"বাঙ্গাল-দেশীয় দুর্গাচরণ আসত। তার কি গুরুভক্তিই ছিল! ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁর জন্য তিন দিন খুঁজে খুঁজে আমলকী এনে দিলে। তিন দিন আহার নিদ্রা নেই। একবার শালপাতে প্রসাদ দিলুম (বাগবাজারের গঙ্গার ধারের গুদামওয়ালা বাড়ীতে)। পাতাসুদ্ধ খেয়ে ফেললে! কাল, শুকনো চেহারা—কেবল চোখ দুটি বড় আর উজ্জ্বল ছিল। প্রেমের চক্ষু, সর্ব্বক্ষণ প্রেমাশ্রুতে ভেজা থাকত।

"তখনকার কত সব কেমন ভক্ত ছিল। এখন যারা আসছে, কেবল বলছে, 'ঠাকুর দেখিয়ে দাও।' সাধন নেই, ভজন নেই, জপ-তপ নেই, কত জন্মে কত কি করেছে—কত গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা করেছে ! সে সব ক্রমে ক্রমে কাটবে, তবে ত ? আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, তবে ত চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস্ করে কি যায় ? এও ত তেমনি।

"ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষয় হয়। ভগবানলাভ হলে ভেতরে ভেতরে তিনি জ্ঞানচৈতন্য দেন—নিজে জানতে পারে।"

৯-২-১২, উদ্বোধন

গতরাত্রে গিরিশ বাবু দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, যারা মৃত্যুর পূর্ব্বে অজ্ঞান হয়ে দেহত্যাগ করে, তাদের কি করে সদ্‌গতি হয় ?"

মা—অজ্ঞান হবার পূর্ব্বে যে চিন্তাটি ছিল, যে চিন্তাটি নিয়ে অজ্ঞান হয়েছে, সেই চিন্তাটি অনুসারে গতি হয়।

আমি—হাঁ, গিরিশবাবুও সন্ধ্যা ছটার একটু পরে যে 'জয় রামকৃষ্ণ, চল' বলে শুলেন, তারপর আর তেমন চৈতন্য হয় নাই। এর খানিকক্ষণ আগে কেবল 'চল চল'

করছিলেন। 'একটু ধর না রে, বাপ'—এই সব।*
আমি বললুম, 'কি আপনি কেবল 'চল চল' কচ্ছেন?
আপনি এখন ঠাকুরের নাম করুন, যাতে ভাল হবেন।
বার দুই আমি এই কথা বলাতে তিনি বললেন, 'তা কি
আর আমি জানি না?' আমি ভাবলুম, বাবা, বুঝি
ভিতরে ভিতরে হুঁশ রয়েছে।

মা—যে চিন্তাটি নিয়ে অজ্ঞান হল, যেন ঐ চিন্তাটিতে
ডুবে রইল। সব তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাঁর কাছে
চলে যাবে। কেউ তাঁর বাহু হতে, কেউ পা হতে, কেউ
লোম হতে হয়েছে—সব তাঁর অঙ্গ, অংশ।

গৌরমা উপস্থিত ছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে
বলিলেন, "ঠাকুর আর দুবার আসবেন বলেছেন। একবার
বাউল সেজে।"

মা—হাঁ, ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমার হুঁকো কলকে
হাতে থাকবে।' ভাঙ্গা একটু পাথরের বাসন ঠাকুরের
হাতে থাকবে। হয় ত ভাঙ্গা কড়ায় রান্না হবে। যাচ্ছেন
ত যাচ্ছেন—কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

---

* গিরিশ বাবুর গঙ্গায় যাইবার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই ঐরূপ করিতে-
ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা অতুল বাবু বলিয়াছিলেন, "আমার ভাইকে আবার
গঙ্গাযাত্রা!" আমি গিরিশ বাবুর ইচ্ছা তখন বুঝিতে পারি নাই।

"লক্ষ্মী বলেছিল, 'আমাকে তামাককাটা করলেও আর আসছি না।' তিনি হেসে বললেন, 'আমি যদি আসি ত থাকবে কোথা? প্রাণ টিকবে না। কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।'

"বৃন্দাবনে রেল থেকে নামছি। ছেলেরা আগে নেমেছে। গোলাপ গাড়ী থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে দিচ্ছে। লাটুর হুঁকোকলকেগুলো পড়ে ছিল, আমার হাতে দিয়েছে। লক্ষ্মী বলছে, 'এই তোমার হুঁকো-কলকে ধরা হয়ে গেল।' আমিও 'ঠাকুর, ঠাকুর, এই আমার হুঁকো-কলকে ধরা হয়ে গেল' বলে ধুপ্ করে মাটীতে ফেলে দিয়েছি।"

২১-২-১২, উদ্বোধন, মায়ের ঘর

মা চৌকীর পার্শ্বে নীচে বসিয়া—সকাল সাতটা। স্বামী নির্ভয়ানন্দ দ্বারকাধাম গিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমাকে পত্র লিখিয়াছেন এবং গীর্ণারের দত্তাত্রেয়ের চাউল-প্রসাদ উহার মধ্যে পাঠাইয়াছেন। মাকে দিলে মা বলিতেছেন, "দত্তাত্রেয় কে?"

আমি—জড়ভরত, দত্তাত্রেয়—সেই ব্রহ্মর্ষি, ঈশ্বরকোটি।

মা—যেমন ঠাকুরের ছেলেরা? এরা সব ঈশ্বরকোটি না? যোগীনকে অর্জ্জুন বলতেন। স্বামিজীকে সপ্তর্ষি

থেকে এনেছিলেন। বাবুরামকে নৈকষ্যকুলীন বলতেন। নিরঞ্জন, পূর্ণ, রাখাল।

আমি—বেলঘরিয়ার তারক বাবু?

মা—হাঁ, ভবনাথ। ভবনাথকে নরেন্দ্রের প্রকৃতি বলতেন। শরৎকে কিছু বলতেন?

আমি—জানি নে। বল না আর কে কি?

মা—কি জানি, আর জানি নে। শরৎকে ঈশ্বরকোটি বলেন নি।

আমি—তুমি ত বলেছিলে, 'শরৎ আর যোগীন (যোগানন্দ স্বামী) এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।' আচ্ছা, ঈশ্বরকোটি কেউ কেউ সংসারে এমন হয়ে রয়েছে কেন? স্ত্রী-পুত্র নিয়ে?

মা—হাঁ, পচে মরছে। পূর্ণকে জোর করে বিয়ে দিলে। বললে, ঠাকুরের ওখানে গেলে, ইট পাটকেল মেরে তাঁর গাড়ী ভেঙ্গে দেব যখন কলকাতায় আসবেন।

আমি—বিয়েই নয় করলে। নাগ মহাশয়ও ত বিয়ে করেছিলেন। এঁদের সব ছেলেপুলে, সংসার।

মা—হয়ত বাসনা ছিল। কি জান? এ সৃষ্টির মধ্যে কত গোলমেলে (ব্যাপার)—ঠাকুর এটাকে দিয়ে সেটা করেন, হাড়ীর মাকে দিয়ে তাড়ীর মা, এটাকে দিয়ে সেটা, কত কি!

পরে বলিতেছেন, "তা সংসার করলেও ঈশ্বরকোটি হতে পারে, তাতে দোষ কি ?"

রাধুর অসুখ করিয়াছে—জ্বর ও বেদনা। মা সেজন্য বড় চিন্তিত। বলিতেছেন, "আমি থাকতেই এর ভাল হল না, তা এর পর কে আর ওকে দেখবে ? তা হলে ও আর বাঁচবে কি ?"

আমি—আর, যে ভক্তের ভিড় সমস্ত দিন ! তোমার আর একটুও বিশ্রাম নেই।

মা—আমি ত ঠাকুরকে দিনরাতই বলি, 'ঠাকুর, এ সব কমিয়ে দাও, একটু বিশ্রাম পেতে দাও।' তা হয় কই ? যে কদিন আছি এমনি হবে। এখন সব চারদিকে প্রচার হয়ে পড়েছে কিনা, তাই এত লোক ! ব্যাঙ্গালোরে—বাপরে কত লোক ! পথে রেল থেকে নামতে সব পুষ্প-বৃষ্টি হতে লাগল। এত উঁচু হয়ে গেল রাস্তা। ঠাকুরেরও শেষটায় কত লোক ! আমি ত এত বলি, 'কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নাও, তারা প্রত্যাশা করে। আমার ত কিছু প্রত্যাশা নেই।' তা ছাড়ে না, কাঁদে। দেখে দয়া হয়। আর আমারও শেষ হয়ে এল। এখন যে কদিন আছি, এমনি হবেই।

আমি—না, না, তুমি এমন কথা কেন বলছ ? তোমার শরীর ভাল আছে। বিশেষ কোন কষ্ট ত নেই। তবে কেন যেতে চাও ? ও কথা বলো না।

এই সময়ে মায়ের মন কিছুদিন যাবৎ বড়ই উদাস ও বিষণ্ণ ছিল।

নীচে গোলাপ মা কাহারো সহিত তর্ক করিতেছিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানে কি তর্ক হচ্ছে আবার?"

আমি—গোলাপ মা কি বকছেন।

মা—কথায় মত্ত হওয়া ভাল নয়। মন্দটাই ভেবে ভেবে দুঃখ পেতে হয়। গোলাপের সত্য কথা বলতে বলতে চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেছে। আমি ত চক্ষুলজ্জা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। "অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়।"

আর একদিনও গোলাপ মা এইরূপ একজনকে অপ্রিয় সত্য বলিয়াছিলেন। তাহাতে মা বলিলেন, "ও কি গোলাপ, এ তোমার কি রকম স্বভাব হচ্ছে?"

দুপুরে একটা মাথা-পাগলা লোক মার কাছে আসিয়া ভারী গোলমাল করিয়াছিল। সেই কথায় মা বলিতেছেন, "তিনি (ঠাকুর) কাউকে জানতেও দেন নি—কত সাবধানে রেখেছিলেন! এখন আবার তেমনি বাজারে ঢাক পিটিয়ে দিয়েছে। মাষ্টারই এরূপ করলে, যত কথা 'কথামৃতে' ছাপিয়ে দিয়ে মাথা বিগড়ে দিয়েছে। গিরিশ বাবু ঠাকুরের উপর ঐ রকম জোর, গালমন্দ করেছে কি না, তাই ওরাও অমন করতে চাচ্চে।

"আর, কি কেবল এখানেই মন্ত্র নেওয়া ! মঠে সব ছেলেরা আছে। তাদের কাছে মন্ত্র নিতে পারে না ? তাদের কি শক্তি নেই ? সব্বাই আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্চে। আমি এমন কথা পর্য্যন্ত বলেছি যে কুলগুরু-ত্যাগে মহাপাপ হয়। তবু ফিরবে না।"

আমি—তুমি যে মন্ত্র দাও, সে ত ইচ্ছা করেই দাও।

মা—দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই। নতুবা আমার কি লাভ ? মন্ত্র দিলে তার পাপগ্রহণ করতে হয়। ভাবি শরীরটা ত যাবেই, তবু এদের হোক।

২৪-৪-১২, উদ্বোধন, মায়ের ঘর

দেড়টা বাজিয়াছে। দুপুরে খাওয়ার পর উপরে পান আনিতে গিয়াছি। শুনিলাম কাহারও সম্বন্ধে মা বলিতেছেন—

"স্বভাব ছাড়িতে নারে জীবের দায়, দায়।
স্বভাব ছাড়িয়ে ভজে, ভজি তার পায়॥"

আমি—মা, এর মানে কি ?

মা—মানুষ স্বভাব ছাড়তে পারে না। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, '(পূর্ব্ব) স্বভাব ছেড়ে যে আমার ভজনা করে, তাকে আমি ভজনা করি।'

আমি—তুমি জয়রামবাটীতে সেই যে বলেছিলে, ‘স্বভাব বদলালে ত হয়।’ আর একদিন বললে, ‘কারু কারু প্রকৃতিটি এমন যে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, আবার কাউকে দেখলে কি রকম মনে হয়।’

মা—ঠিক বলেছ, বাবা। তাই ত, স্বভাবই ত সব। আর কি আছে?

আমি—শরৎ মহারাজ গোলাপ মার কথায় বলেছিলেন, ‘একটা ডাব দেবে ত বাড়ীশুদ্ধ চেঁচিয়ে বলবে।’

মা—হাঁ, এদের কি স্বভাব হয়েছে এখন। একটুতেই চেঁচিয়ে মেচিয়ে অস্থির করে। যোগেন আগে এমন ছিল, ধীর স্থির। এখন তা নেই। বাবা, সহ্যগুণ বড় গুণ—এর চেয়ে আর গুণ নেই।

আমার বড় মাথা ধরিয়াছে। বৈকালে চারিটার সময় উপরে গিয়াছি। মাকে বলিলাম, “মা, বড় মাথা ধরেছে।” মা সব শুনিয়া বলিলেন, “বোধ হয় গরমে হয়েছে।” এই বলিয়া নিজে তাড়াতাড়ি গিয়া একটা পাতায় করিয়া খানিকটা ঘি ও কর্পূর জলে মিশাইয়া হাত দিয়া মাড়িতে মাড়িতে আনিয়া আমার সমস্ত কপালে মালিশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, “এ ওষুধ ঠাকুর লাগাতেন—তাঁর যখন মাথা ধরত।” কয়েক মিনিট মালিশ করিবার পর আমারও একটু ভাল বোধ হইল। আমি নীচে আসিলাম।

খানিক পরেই মাথাধরা ছাড়িয়া গেল। মাকে গিয়া বলিলাম, "মা, মাথাধরা থেমেছে।"

পোল্যাণ্ডের একটি মেম বেদান্তশিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মেমটি মায়ের সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা কহিলেন। তিনি 'বাহাই'-সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উহাও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার অনুরূপ—সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়। কথায় মনে হইল মেমটি ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত।

মেমটি চলিয়া গেলে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যে মেম এসেছিল, কেমন দেখলে?"

মা—বেশ সব।

আমি—এরা কতদূর থেকে এসেছে। পোল্যাণ্ড রুশের রাজ্য। রুশ-জাপানে যুদ্ধ হয়েছিল না? সেই রুশের দেশ।

মা—রুশিয়াদেশের লোক? ভয়ানক যোদ্ধার জাত! ধর্ম্মশিক্ষার জন্য এদেশে এসেছে। লঙ্কায় তিন-চার মাস ছিল।

আমি—এখন সব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথায় পোল্যাণ্ড, আর কোথায় 'উদ্বোধন' আফিস! তোমার ত মা ধারণাও নেই।

মা—ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলেছিলেন, 'এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। আমার যে কত লোক তার কুলকিনারা নেই।' নিবেদিতা বলেছিল, 'মা, আমরাও বাঙ্গালী। কর্ম্মবিপাকে ওদেশে জন্মেছি। তা দেখবে আমরাও এমন বাঙ্গালী হয়ে যাব যে ঠিক ঠিক।' ওদের (নিবেদিতা প্রভৃতির) এই শেষ জন্ম।

১২শে বৈশাখ, ১৩১৯, উদ্বোধন, ঠাকুরঘর, সকাল সাতটা

শ্রীযুত সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী কয়েকদিন পূর্ব্বে সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরে একদিন তিনি একা আসিয়াছেন। মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন ওটিকে (স্ত্রীকে) কেমন দেখলেন ?" মা বলিলেন, "বেশ ভাল।"

সুরেন বাবু—আমার কিন্তু ভাল লাগে না।

মা—তোমাদের এখন ঐ এক ভাব হয়েছে।

সুরেন বাবু—মা, আমরাই কেবল ঠাকুরের দর্শন পেলুম না।

মা—পাবে বই কি। তোমাদের এই শেষ জন্ম। নিবেদিতা বলেছিল, 'মা, আমরাও বাঙ্গালী, কর্ম্মের ফেরে খৃষ্টান হয়ে জন্মেছি।' ওদেরও এই শেষ জন্ম।

মা এইরূপ মাঝে মাঝে অনেকের শেষ জন্ম বলিতেন। তাই মনে করিয়া আজ তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, 'শেষ জন্ম' কথাটার মানে কি? ঠাকুর অনেকের শেষ জন্ম বলেছেন, তুমিও বলছ।"

মা—শেষ জন্ম মানে—তার আর যাতায়াত হবে না, এই জন্মেই শেষ হয়ে গেল।

আমি—এদের ত অনেকের বাসনা আছে দেখা যায়—সংসার, ছেলেপুলে, পরিবার। বাসনা না গেলে কি করে যাতায়াত ফুরুবে?

মা—তা তিনি (ঠাকুর) যাকে যা বলেছেন সব সত্য ত। মিথ্যা ত হবার যো নেই। এখন বাসনা থাকুক, আর যাই করুক, তিনি দেখেছেন শেষে তা থাকবে না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

আমি—তা হলে শেষ জন্ম মানে কি নির্ব্বাণ?

মা—তা বই কি। হয়ত দেহ যাবার সময় মন নির্ব্বাসনা হবে।

আমি—মা, ঠাকুর অনেককে আপনার জন বলেছেন, এর মানে কি?

মা—ঠাকুর বলতেন, 'তারা কেউ শরীর থেকে, কেউ লোমকূপ থেকে, কেউ হাত-পা থেকে বেরিয়েছে। তারা সব সঙ্গের সঙ্গী।' যেমন যখন রাজা কোথাও যায়, সব

সঙ্গের লোকজন তথায় যায়। আমি যদি জয়রামবাটী যাই, আমার সঙ্গের যারা তারা সব যাবে না? তেমনি যারা আপনার, তারা সব যুগে যুগে সঙ্গী। ঠাকুর বলতেন, 'যারা অন্তরঙ্গ তারা ব্যথার ব্যথী।' এই সব ছেলেদের দেখিয়ে বলতেন, 'এরা আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুখী, ব্যথার ব্যথী।' তিনি যখন আসেন, তখন সব হাজির। নরেনকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন—তাও সবটা আসে নি। শম্ভু মল্লিককে মা কালীর পেছনে দেখেছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে কালীঘরে ধ্যান করবার সময়। বলরাম বাবুকে যেমন চেহারা, অমনি দেখেছিলেন। প্রথম দেখাতেই বলেছিলেন, 'ঠিক অমনি দেখেছি, মাথায় পাগড়ি, গৌরবর্ণ।' আর সুরেন মিত্তির। বলতেন, 'এই তিনজন রসদ্দার।' একদিন ঠাকুর বললেন, 'ওরা মা কালীকে ভোগ নিবেদন না করে ছবিকে (ঠাকুরের ছবিকে) কেন দিলে?' * আমরা অকল্যাণ হবে বলে মনে মনে ভয় পেলুম। ঠাকুর বললেন, 'ওগো, তোমরা কিছু ভেবো না—এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি।'

---

* একবার কতকগুলি ভক্ত মিষ্টান্নাদি লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যায়। গিয়া দেখে ঠাকুর সেখানে নাই। তখন তিনি চিকিৎসার্থ কাশীপুরে আছেন। ভক্তেরা সেই সব দ্রব্য ঠাকুরের ছবির সামনেই ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে।

"এত করে বলা আবার কার জন্য ? না আমার আর লক্ষ্মীর জন্য। আমাদের তখন অল্প বয়স। অত কি বুঝি ?

"এখনকার লোক সব সেয়ানা—ছবিটি তুলে নিয়েছে। এই যে মাষ্টার মশায়—এরা কি কম লোক গা ? যত কথা সব লিখে নিয়েছে। কোন্ অবতারের ছবি আছে, বা কথাবার্ত্তা এই রকম করে লেখা আছে ?"

আমি—'কথামৃত' সম্বন্ধে মাষ্টার মশায় বলেছিলেন যে, দশ-বার খণ্ড বেরুলে তবে সব কথা বের হতে পারে। তা এত কথা আর কবে বের হবে ?

মা—হাঁ, বয়েস হয়েছে, হয়ত পূর্ব্বেই বা সরে পড়লে।

আমি—মা, তুমি যে আমাকে জয়রামবাটীতে বলেছিলে, ঠাকুর শ্বেতকায় ভক্তদের ভিতর আসবেন। না কি ?

মা—না, তাঁর অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবে, তাই বলেছি। যেমন এখন সব খৃষ্টানরা আসছে না ? ঠাকুর বলেছিলেন যে একশ বছর পরে আবার আসবেন। এই একশ বছর ভক্তহৃদয়ে থাকবেন। গোল বারান্দা হতে বালি, উত্তরপাড়ার দিকে দেখিয়ে বলেছিলেন। আমি বললুম, 'আমি আর আসতে পারব না।' লক্ষ্মী বলেছিল, 'আমাকে তামাককাটা করলেও আর আসব না।' ঠাকুর হেসে বললেন, 'যাবে কোথা ? কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব এসে পড়বে।'

"আর এত কথারই বা দরকার কি ? . ঠাকুর বলতেন, 'আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। অত পাতা ডাল গুণে কি হবে ?' "

আমি—কিন্তু মা, কিছু প্রত্যক্ষ না দেখলে কি করে কি হবে ? একবার এক মুসলমান ফকিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'পুকুরে কি নদীতেই লোকে মাছের আশায় ছিপ ফেলে বসে, গোষ্পদের জলে ত কেউ মাছ ধরবার জন্য ছিপ ফেলে বসে না ! কিছু টের পেয়েছেন কি, যার আশায় ফকির হয়েছেন ?'

মা—সে কি বললে ?

আমি—কি আর বলবে ?

এই কথা শুনিয়া মা ঐ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা, তাই ত। কিছু উপলব্ধি না হলে কি করে কি হবে ? তবে বিশ্বাস করে যেতে হয়।"

আমি—শরৎ মহারাজ সেদিন বললেন এবং স্বামিজীও বলেছিলেন, 'মনে কর পাশের ঘরে একতাল সোনা রয়েছে। একটা চোর এ পাশের ঘর থেকে তা জানতে পেরেছে। মাঝে দেয়াল, তাই নিতে পারছে না। সে লোকটার কি আর ঘুম আসবে ? সব সময় ঐ ভাববে —কি করে সোনার তালটা নিতে পারবে। তেমনি এ হেন ঈশ্বর বলে কেউ আছেন, এ যদি মানুষ ঠিক ঠিক বুঝতে

পারত, তাহলে কি আর এই সব সংসার-ফংসার করতে পারত ?'

মা—সে ত ঠিক কথাই।

আমি—যাই বল মা, ত্যাগ-বৈরাগ্যই প্রধান। আমাদের কি হবে না ?

মা—হবে বই কি। ঠাকুরের শরণাগত হলে সব হয়। তাঁর ত্যাগই ছিল ঐশ্বর্য্য। তিনি ত্যাগ করেছিলেন বলে এখন আমরা সব তাঁর নামে খাচ্ছি দাচ্ছি। লোকে ভাবে, তিনি এত বড় ত্যাগী ছিলেন, তাঁর ভক্ত এঁরা না জানি কত বড় হবে !

"আহা, একদিন খেয়ে নবতের ঘরে গেছেন। বেটুয়ায় মশলা ছিল না। দুটি যোয়ান মৌরি খেতে দিলুম, আর দুটি কাগজে মুড়ে হাতে দিলুম, বললুম, 'নিয়ে যাও।' তিনি নবতের ঘর থেকে ঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু ঘরে না গিয়ে সোজা দক্ষিণদিকের নবতের কাছের গঙ্গার ধারের পোস্তায় চলে গেছেন—পথ দেখতে পান নি, হুঁশও নেই। বলছেন, 'মা, ডুবি ? মা, ডুবি ?' আমি এদিকে ছটফট করছি—ভর্ত্তি গঙ্গা। বউ মানুষ, বেরুই না, কোথাও কাউকে দেখিও না। কাকে পাঠাই ? শেষে মা কালীর একটি বামুন এদিকে এল। তাকে দিয়ে হৃদয়কে ডাকালুম। হৃদয় খেতে বসেছিল, তাড়াতাড়ি এঁটো হাতেই দৌড়ে একেবারে

ধরে তুলে নিয়ে এল। আর একটু হলেই গঙ্গায় পড়ে যেতেন!"

আমি—দক্ষিণমুখো কেন গেলেন?

মা—হাতে দুটি যোয়ান দিয়েছিলুম কিনা। সাধুর সঞ্চয় করতে নেই, তাই পথ দেখতে পান নি। তাঁর যে ষোল আনা ত্যাগ।

"পঞ্চবটীতে এক বৈষ্ণব সাধু এসেছিল। প্রথমটায় তার বেশ ত্যাগ ছিল। আহা, শেষে ইঁদুরের মত টেনে হিঁচড়ে ক্রমে ঘটীটি, বাটীটি, হাঁড়ি, কলসী, চাল, ডাল, এ সব গোছাতে লাগল। ঠাকুর একদিন তাই দেখে বললেন, 'যাঃ রে, এবার মারা পড়বে!'—কিনা মায়ায় বদ্ধ হতে চলল। ঠাকুর তাকে খুব ত্যাগের উপদেশ দিলেন, আর সে স্থান ছেড়ে যেতে বললেন। তবে সে পালাল।"

জনৈক ভক্ত প্রণাম করিতে আসিয়াছিলেন। প্রণাম করিয়া যাইবার পর মা বলিতেছেন, "আমি একবার ঠকেছি কি না সেই হরিশকে আদর করে। তাই এখন আর যত্ন স্নেহ কাউকে দেখাই না।"

১-৫-১২, বৈশাখী পূর্ণিমা, উদ্বোধন

সকালবেলা মায়ের চিঠি পড়িয়া শুনাইতে গিয়াছি। মা তাঁহার ঘরের দক্ষিণপাশের ঘরে উত্তরদিকে দরজার

নিকট বসিয়া। আমি ঠাকুরঘর হইতে পড়িয়া মাকে কি একটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মা বলিলেন, "এদিকে এসে বসে কথা বল।" আমি গিয়া বসিলাম।

আমি—এক ভক্তের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে চিঠি লিখেছে আসবে বলে। প্রণাম জানিয়েছে। সে যে চিঠি লিখেছে এ কথা যেন তার শ্বশুরবাড়ীতে না জানে।

মা—থাক্, তবে আর জবাব দিয়ে কাজ নেই। আবার বাড়ীতে জানবে না! আমি অত লুকোচুরি জানি নে। জয়রামবাটীতে যোগেন্দ্র (পিয়ন) চিঠির জবাব লিখে দিত। অনেকে বলত, 'পিয়ন চিঠি পড়ে?'—কিনা যাকে তাকে দিয়ে চিঠি পড়ান। কেন? আমার কাছে কোন কপট কিছু ত নেই? আমার চিঠি যে ইচ্ছা সে দেখবে।

এক ভক্ত লিখিয়াছে, মা কবে জয়রামবাটী যাইবেন। আমি মাকে বলিলাম, "লিখে দিই, অগ্রহায়ণ মাসে যাবেন —জগদ্ধাত্রীপূজার সময়।"

মা—না, না, ওসব কি ঠিক বলা যায়? কখন কোথায় থাকি; সব তাঁর হাত। মানুষ এই আছে, এই নেই।

আমি—না, তুমি অমন কেন বলছ? তুমি আছ বলে এত লোক আসছে, শান্তি পাচ্ছে।

মা—তাই ত।

আমি—তুমি আমাদের জন্য থাক।

মা করুণস্বরে ভক্তদের জন্য কাঁদকাঁদ হইয়া বলিতেছেন, চক্ষে জল,—“আহা, এরা আমাকে যত ভালবাসে আমিও এদের তত ভালবাসি।” আমি হাওয়া করিতে-ছিলাম। করুণকণ্ঠে বলিলেন, “আশীর্ব্বাদ করি, বাবা, বেঁচে থাক, ভক্তি হোক, শান্তিতে থাক—শান্তিই প্রধান, শান্তিই চাই।”

আমি—মা, এইটিই কেবল আমার মনে জাগে—ঠাকুরের কেন দেখা পাই না? তিনি যখন আপনার জন, আর ইচ্ছা করলেই দেখা দিতে পারেন, তখন কেন তিনি দেখা দেন না?

মা—তাই ত, এত দুঃখকষ্টেও যে কেন তিনি দেখা দেন না, কে জানে? রামের মার (বলরাম বাবুর স্ত্রীর) অসুখ হয়েছিল। ঠাকুর আমায় বললেন, ‘যাও, দেখে এসগে।’ আমি বললুম, ‘যাব কিসে? গাড়ী টাড়ী নেই।’ ঠাকুর বললেন, ‘আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্চে, আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে। হেঁটে যাও।’ শেষে পাল্কী পাওয়া গেল। দক্ষিণেশ্বর থেকে আসলুম। দুবার এসে-ছিলুম। আর একবার—তখন আমি শ্যামপুকুরে—রাত্রে হেঁটে রামের মার অসুখ দেখতে আসলুম। দেখ, সেই বলরামের পৌত্র কি সময়ে (নিতাই বাবুর মার শ্রাদ্ধদিনে) মারা গেল। একদিনও কি আগ পাছ হতে নেই? তিনি

যদি এ বিপদে না দেখবেন, না দেখা দেবেন, তবে মানুষ যাবে কোথা ?

আমি—দুঃখকষ্ট শরীরধারণ করলে আছেই। তাঁকে দুঃখ দূর করতেও বলি না। কিন্তু তিনি কি দুঃখকষ্টে দেখা দিয়ে প্রবোধ দিতেও পারেন না ?

মা—আহা, তাই ত। এই রামের মা, রামের বউ, এরা আসল। ভাবলে যাই, মায়ের কাছে যাই। এখানে এসে তবু খানিকটা শান্তি পেলে।* তাই ত ঠাকুরকে বলতুম। তিনি বলতেন, 'আমার লাখ লাখ আছে। আমার তা (জিনিস) আমি পেছন দিকে কাটব, ন্যাজে কাটব, মারব।'

আমি—আমরা যে কষ্ট পাই তা তিনি দেখবেন না ?

মা—তা তোমার মত কত আছে তাঁর। তিনি বলতেন, 'চিদানন্দসিন্ধু'—এমন কত উঠছে, কত ডুবছে, কূলকিনারা নেই।

আমি—মা, যারা এমনিভাবে এই ডালগোলার লোকগুলির মত আছে (তখন 'উদ্বোধনের' সামনে ডাল-গোলা ছিল) তারা বেশ আছে। কিন্তু মা, যাদের খানিক

* রাম বাবুর এই একমাত্র পুত্র মারা যাইবার পর তাঁহারা সান্ত্বনা পাইয়া চলিয়া গেলে মা আমাকে বলিলেন, "পেটের ছেলে, রক্তমাংসের শরীর থেকে বেরোয়, তাই এত মায়া। মাগুলোর যত কষ্ট। মায়া কি করে যাবে ?"

হুঁশ হয়েছে, যারা তাঁকে চায়, তারা যদি দেখা না পায় তাদের যে কি কষ্ট, তারাই জানে।

মা—হাঁ, তাই ত। ওরা বেশ আছে। খাচ্চে দাচ্চে, আছে। ভক্তদেরই যত কষ্ট।

আমি—তোমার কি এদের (ভক্তদের) দুঃখকষ্ট দেখে কষ্ট হয় না ?

মা—আমার কি কষ্ট ? যাঁর জগৎ তিনিই দেখছেন।

আমি—ভক্তদের জন্য তোমার আসতে ইচ্ছা হয় না ?

মা—দেহ-ধারণে যা কষ্ট ! আর না, আর না—আর যেন আসতে না হয়। ঠাকুরের অসুখের সময় দুর্গাচরণ, তিন দিন খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, খুঁজে খুঁজে আমলকী আনলে। ঠাকুর খেতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর তাকে প্রসাদ করে দিতে গিয়ে ভাত বেশ এত কটা খেলেন। বললুম, 'এই ত বেশ খাচ্চ, তবে আর সুজি খাওয়া কেন ? ভাত দুটি দুটি খাবে।' ঠাকুর বললেন, 'না, না, শেষ অবস্থায় এই আহারই ভাল।' এক একদিন নাক দিয়ে, গলা দিয়ে সুজি বেরিয়ে পড়ত—অসহ্য কষ্ট হত। আহা, তারকেশ্বরে বাবার কাছে হত্যা দিতে গেলুম, তাতেও কিছু হল না। একদিন যায়, দুদিন যায়, পড়েই আছি। রাতে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম—যেমন অনেকগুলো হাঁড়ি সাজান থাকলে তার উপর ঘা মেরে যদি কেউ একটা হাঁড়ি

ভেঙ্গে দেয়, সেই রকম শব্দ। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এল, 'এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্য আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি?'—একবারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে দিলে! আমি উঠে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মন্দিরের পেছনে কুণ্ড থেকে স্নানজল নিয়ে চোখে মুখে দিলুম, খানিকটা খেলুম—পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, না খেয়ে পড়েছিলুম কিনা। তবে প্রাণ একটু সুস্থ হল। তার পরদিনই চলে আসি। আসতেই ঠাকুর বললেন, 'কিগো, কিছু হল?—কিছুই না!' ঠাকুরও স্বপ্নে দেখেন, ওষুধ আনতে হাতী গেল। হাতী মাটি খুঁড়ছে ওষুধের জন্য। এমন সময় গোপাল এসে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি স্বপ্নটপ্ন দেখ?'

"দেখলুম, মা কালী ঘাড় কাত করে রয়েছেন। বললুম, 'মা, তুমি কেন এমন করে আছ?' মা কালী বললেন, 'ওর ঐটের জন্য (ঠাকুরের গলার ঘা দেখিয়ে), আমারও হয়েছে।' ঠাকুর বললেন, 'যা ভোগ আমার উপর দিয়েই হয়ে গেল। তোমাদের আর কারুকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। জগতের সকলের জন্য আমি ভোগ করে গেলুম।' গিরিশের পাপ নিয়ে এই ব্যাধি। তা গিরিশও শেষটায় ভুগলে।

"যত ভোগ, সব এখানেই ত (পৃথিবীতে) হচ্চে। আর কোথায় কি ? ভুগে ভুগে, ঢাক ঢোল সব বাজিয়ে শেষে ধুনুরীর হাতে পড়ে তবে তুঁহু তুঁহু ডাক ছাড়ে।"

আমি—তা এর পর কি আর তোমার আমাদের মনে থাকবে ?

মা—সেখানের আনন্দ পেলে হয়ত এ মনে থাকবে না। বাবা, কালই প্রধান। কালবশে কি হবে কে জানে ?

আমি—কালবশেও হচ্চে, আবার কালজয়ীও ত আছে ?

মা—হাঁ, তাও আছে।

আমি—মা, তুমি সুস্থ থাক, তবেই ত হয়।

আটটা বাজিয়াছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আটটা কি বেজেছে ? বোধ হয় বেজেছে। যাই, বাবা, পূজো করতে যাই।"

এই বলিয়া উঠিতেছেন ও বলিতেছেন, "আর, বাবা, আশীর্ব্বাদ কর, যাতে সুস্থ থাকি।"

পূজা হইয়া গেলে মায়ের চিঠি পড়িয়া শুনাইতে গিয়াছি। তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্তের কাশীলাভ হইয়াছে। শুনিয়া মা বলিলেন, "মরতে ত হবেই একদিন। কোথায় কোন্ পুকুরপাড়ে ডোবায় মরত—তা না হয়ে কাশীলাভ হল।"

মামাদের পত্রে অর্থের আকাঙ্ক্ষা ও ঝগড়া-বিরোধের কথা আছে। আমি বলিলাম, "তাঁদের খুব করে টাকা দাও। ঠাকুরকে বল। বেশ ভোগ করুক, যাতে নিবৃত্তি হয়।"

মা—ওদের কি আর নিবৃত্তি আছে? ওদের কিছুতেই নিবৃত্তি হবে না। শত দিলেও না। সংসারী লোকদের কি আর নিবৃত্তি হয়?

"ওদের ওখানে কেবল দুঃখের কাহিনী। কেলেটাই কেবল টাকা টাকা করে। আবার ওর দেখাদেখি প্রসন্নও এখন করছে। বরদা কখনও চায় না, বলে—দিদি কোথায় টাকা পাবে?

আমি—পাগলীও না।

মা—তাকে দিলেও নেয় না।

আমি— ওঁদের ওখানে কেন জন্ম নিলে?

মা —কেন? আমার বাপ মা বড় ভাল ছিলেন। বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন। নৈষ্ঠিক, অন্য বর্ণের গ্রহণ করতেন না। মায়ের কত দয়া ছিল। লোকদের কত খাওয়াতেন, যত্ন করতেন, কত সরল। বাবা তামাক খেতে খুব ভাল-বাসতেন। তা এমন সরল অমায়িক ছিলেন যে, যে কেউ বাড়ীর কাছ দিয়ে যেত, ডেকে বসাতেন, আর বলতেন, 'বস ভাই, তামাক খাও।' এই বলে নিজেই ছিলিম ছিলিম

তামাক সেজে খাওয়াতেন। বাপ মায়ের তপস্যা না থাকলে কি (ভগবান) জন্ম নেয় ?

২৫-৬-১২, উদ্বোধন

ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে মায়ের তক্তাপোষের নিকটেই বসিয়া সকালবেলা কথা হইতেছে।

আমি—মা, এই যে কেউ কেউ বলেন, মঠের সেবাশ্রম, হাসপাতাল, বইবেচা, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি সাধুরা যে করছে, এ ভাল নয়। ঠাকুর কি এসব কিছু করেছিলেন ? নূতন নূতন যারা ব্যাকুলতা নিয়ে মঠে ঢুকছে, তাদের ঘাড়ে এই সব কর্ম্ম চাপিয়ে দিচ্ছে। কর্ম্ম করতে হয় ত পূজা, জপ, ধ্যান, কীর্ত্তন—এই সব করবে। অন্য সব কর্ম্ম বাসনা জড়িয়ে ঈশ্বর থেকে বিমুখ করে।

মা—তোমরা ওদের কথা শুনো না। কাজ করবে না ত দিনরাত কি নিয়ে থাকবে ? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যানজপ করা যায় ? ঠাকুরের কথা বলছে—তাঁর আলাদা। আর তাঁর মাছের ঝোল, ঘিয়ের বাটি মথুর যোগাত। এখানে একটি কাজ নিয়ে আছ বলে খাওয়াটি জুটছে। নইলে দুয়ারে দুয়ারে কোথায় একমুঠোর জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে ? শরীরে অসুখ হয়ে পড়বে। আর কেই বা এখন সাধুদের এত ভিক্ষা দিচ্ছে ? তোমরা ওসব কথা কিছু শুনো না।

ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলবে। মঠ এমনি ভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।

"মণি মল্লিক সাধু দেখে এসে ঠাকুরকে বললে। ঠাকুর বললেন, 'কি গো, কেমন সব সাধু দেখলে?' সে বললে, 'হাঁ, দেখলুম ত, তবে—।' ঠাকুর বললেন, 'তবে কি?' মণি মল্লিক বললে, 'সব্বাই পয়সা চায়।' ঠাকুর বললেন, 'কি আর পয়সা চায়? হয়ত একটা পয়সা, গাঁজা কি তামাক খাবে—এই পর্য্যন্ত। তোমার ঘিয়ের বাটি, দুধের বাটি, গদি—এ সব চাই। আর তার একটা আধটা পয়সা মাত্র—হয়ত একটু তামাক কি গাঁজা খাবে। এও চাই নে? সব ভোগ তোমরাই করবে? আর তারা এক পয়সার তামাকও খাবে না?'

আমি—বাসনা থেকেই ভোগ। চৌতলা বাড়ীতে বাস করলেও যার বাসনা নেই তার কিছুই না। আর গাছতলায় বাস করেও বাসনা থাকলে ঐ থেকেই সব ভোগ এসে পড়ে। ঠাকুর বলতেন, 'মহামায়ার এমনি খেলা যে, যার তিন কুলে কেউ নেই তাকে দিয়েও একটা বেরাল পুষিয়ে সংসার করাবে।'

মা—তাই ত; বাসনা থেকেই সব। বাসনা না থাকলে কিসের কি? এই যে আমি এসব নিয়ে আছি, কই, আমার ত কোন বাসনা হয় না—কিছুই না!

আমি—তা তোমার আবার বাসনা কি? মা, আমাদের ভিতরে কত কি তুচ্ছ বাসনা উঠছে, এসব কি করে যাবে?

মা—তোমাদের ওসব কোন বাসনা নয়। ও কিছু নয়। মনের খেয়ালে অমনি উঠছে, যাচ্ছে। ওসব যত বেরিয়ে যায় তত ভাল। *

আমি—কাল বসে বসে ভাবছিলুম যে ঈশ্বর যদি রক্ষা না করেন ত কাঁহাতক মনের সঙ্গে লড়াই করা যায়? এক বাসনা যাচ্ছে ত অন্য বাসনা উঠছে।

মা—যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা ত থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়, তাকে তিনি যদি রক্ষা না করেন, সে ত তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তিনি ভাল করতে হয় করুন, ডোবাতে হয় ডোবান। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয়। আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

আমি—আমার কি সেই নির্ভর আছে? হয়ত

---

* জনৈক ত্যাগী ভক্ত একবার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা, সাধন-ভজন ত করা যাচ্ছে, চেষ্টাও কম করছি না, কিন্তু মনের আবর্জ্জনা যেন কমছে না।" মা বলিলেন, "নাটাইয়ে সুতো যেভাবে গুটিয়েছ—লাল সুতো, কাল, সাদা—খোলবার সময় তেমনি করে করে খুলবে ত?"

খানিকটা নির্ভর আসে, আবার তা চলে যায়। তিনি যদি নিজে রক্ষা না করেন ত উপায় কি? মনে ভাবি, এখন মা, তুমি আছ, আপদ হোক, বিপদ হোক, এসে তোমার কাছে বলি, তোমার মুখ চেয়ে শান্তি পাই। এর পর কে রক্ষা করবে? তুমি যদি ফিরে চাও, তবে ত হয়?

মা—ভয় কি বাবা? তোমার কোন ভয় নেই। তোমাদের সংসার, পরিবার, ছেলেপুলে—এসব ত কিছু হবে না, তোমাদের ভয় কি? আর এর মধ্যে, আমি থাকতেই তোমরা তৈরী হয়ে যাবে।

আমি—ভাবি, ঈশ্বর যদি ফিরে না চান ত জপতপেই বা কি হবে? তিনি যদি রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা।

মা—না, তোমার কোন ভয় নেই। তিনিই রক্ষা করবেন। তুমি কিছু ভেবো না।

৭-৭-১২, উদ্বোধন

আমি—মা, তুমি রথযাত্রার সময় জগন্নাথ যাবে, কথা ছিল না?

মা—এখন এত লোকের ভিড়ের মধ্যে যেতে আছে? কলেরা টলেরা হবে। লক্ষ্মীকান্ত (পাণ্ডা) বললে, 'এখনই ঘর সব ভাড়া হয়ে গেছে, স্থান নেই। ছোট ছোট ঘরগুলি পর্য্যন্ত দশ টাকা। শীতকালে যাবেন।'

আমি—জগন্নাথ কি মূর্ত্তি ?

মা—আমি কিন্তু স্বপনে দেখেছিলুম শিবমূর্ত্তি।

আমি—তখন তুমি সেখানে এই জগন্নাথ-মূর্ত্তি দেখ নি ?

মা—না, শুধু শিবমূর্ত্তি—শিবলিঙ্গ। লক্ষ শালগ্রামের বেদী, তার উপর জগন্নাথ শিব। একটা কিছু না থাকলে কি আর এত লোক হয় ? বিমলা দেবী আছেন। তাঁর বলি হয় মহাষ্টমীর রাত্রে। বিমলা দুর্গা ত ? কাজেই শিব থাকবেন না ?

আমি—কেউ কেউ বলে বৌদ্ধমন্দির, বুদ্ধমূর্ত্তি। তারপর শঙ্করাচার্য্য যখন বৌদ্ধদের তাড়ালেন, তখন ঐ মূর্ত্তিকেই আবার শিবমূর্ত্তি করে তুললে। পরে আবার বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে শিবকে জগন্নাথ-বিষ্ণু করে দিলে।

মা—কি জানি, আমি কিন্তু শিব দেখেছিলুম।

আমি—মুসলমানেরা কত মন্দির, কত দেবদেবী ভেঙ্গেছে, কারও নাক কেটেছে, কারও কান কেটেছে।

মা—মুসলমানের ভয়ে বৃন্দাবনের গোবিন্দজী জয়পুরে পালালেন। পাণ্ডারা ধন্না দিলে। শেষে দৈববাণী হল, 'মূর্ত্তি গিয়েছে, আমি যাই নি। তোমরা আবার মূর্ত্তি কর, সেই মূর্ত্তিতেই আমি থাকব।'

আমি—গুজরাটে সোমনাথের মন্দির, গঙ্গোত্রীর জলে রোজ স্নান হত। মানুষের মাথায় মাথায় রোজ নূতন জল

আসত। সুলতান মামুদ ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে। মন্দিরের চন্দনকাঠের দরজা নিয়ে গেল। এমন কেন হয়?

মা—দুষ্টলোকের ভয়ে তিনি পালান। তাই বা কেন? তিনি ইচ্ছা করলে ত সবই পারেন। তবে এ-ও তাঁর এক লীলা।

আমি—মা, কর্ম্মের ফল কি খণ্ডন হয়? শাস্ত্রে বলে জ্ঞান হলে খণ্ডন হয়। তাও প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়।

মা—কর্ম্ম হতেই সুখ দুঃখ সব। তাঁকেও কর্ম্মফল ভোগ করতে হয়েছিল। ঠাকুরের বড় ভাই বিকারের সময় জল খাচ্ছিলেন। একটুখানি খেতেই ঠাকুর হাত থেকে গ্লাসটি টেনে নিলেন। তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুই আমাকে জল খেতে দিলি নি, তুইও এমনি কষ্ট পাবি, তোরও গলায় এমনি যাতনা হবে।' ঠাকুর বললেন, 'দাদা, আমি ত তোমার মন্দ করি নি। তোমার অসুখ, জল খেলে অনিষ্ট হবে, তাই দিই নি। তবে কেন তুমি আমায় এমন শাপ দিলে?' তিনি কেঁদে বললেন, 'কি জানি, ভাই, আমার মুখ থেকে ওকথা বেরিয়ে পড়ল। এ ত অন্যথা হবে না।' ঠাকুরের অসুখের সময় আমাকে বললেন, 'এই তাঁর শাপে গলার ঘা। তা তোমাদের আর কারু কিছু হবে না; যা ভোগ আমারই হল।'

আমি বললুম, 'এমন হলে মানুষ কি করে থাকবে, যখন তোমারই এরূপ হল?' তিনি বললেন, 'তাঁর সে সিদ্ধ-বাক্য ছিল, ভাল লোক। এমনি যে-সে বললে কি হয়?'

"কর্ম্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল সেঁধুত, সেখানে ছুঁচ ফুটবে। জপ তপ করলে কর্ম্ম অনেকটা খণ্ডন হয়। যেমন সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়ে দেবীর আরাধনা করেছিল বলে লক্ষ পাঁঠায় মিলে তাঁকে এক কোপে কাটলে। তার আর পৃথক লক্ষ বার জন্ম নিতে হল না। দেবীর আরাধনা করেছিল কিনা। ভগবানের নামে কমে যায়।"

আমি—তাহলে কর্ম্মের প্রাধান্যেই ত জগৎ চলছে। তবে আর ভগবান মানা কেন? বৌদ্ধেরাও কর্ম্ম মানে, ঈশ্বর মানে না।

মা—তবে কি কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা, এসব নেই বলতে চাও?

আমি—জপতপের দ্বারা খণ্ডন হয়?

মা—তা হবে না? ভাল কাজটি করা ভাল। ভালটি করলে ভাল থাকে, মন্দটি করলে কষ্ট পেতে হয়।

আমি—আচ্ছা মা, তুমি জয়রামবাটীতে বলেছিলে, সব এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। যা হয়েছে সব এক কালে হয়েছে, একটি একটি করে হয় নি।

মা—তিনি কি আর একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন? এ যেন তাঁর একটা কল চলছে—এই যেমন ময়দার কল। কলওয়ালা দেখছে, কলটি যাতে নষ্ট না হয়। সে কি কোথায় একটি একটি করে গম গুঁড়ো হচ্ছে দেখছে? তেমনি তাঁর কলটি তিনি ঠিক রাখছেন। কোথায় কে কি খুঁটিনাটি করছে তা কি তিনি অত দেখছেন? তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, তাঁকে সর্ব্বক্ষণ দেখতে হচ্ছে। অত খুঁটিনাটি দেখলে কি চলে?

উদ্বোধন—সকালবেলা

আমি—মা, তোমাকে কখন কখন রামায়ণ পড়তে দেখি। পড়তে কবে শিখলে?

মা—ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ ওরা সব পাঠশালায় যেত। ওদের সঙ্গে কখন কখন যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম। পরে কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণ-পরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে। বললে, 'মেয়েমানুষের লেখা-পড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর এক খানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমায়

পড়াত। ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে। একাটি একাটি আছি। ভব মুখুয্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে। সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। সে রোজ নাইবার সময় পাঠ দিত ও নিত। আমি তাকে শাকপাতা, বাগান হতে যা আমার এখানে দিত, তাই খুব করে দিতুম।

আমি—মা, ঠাকুর জয়রামবাটী কি অনেক বার গিয়েছিলেন, না এক আধ বার ?

মা—অনেক বার গেছেন। এক এক বার গিয়ে দশ বার দিন থাকতেন। যখন দেশে যেতেন, তখন জয়রাম-বাটী, শিওড়, এসব হয়ে আসতেন। শিওড়ে রাখাল বালকদের খাওয়ালেন।

আমি—এ কোন্ সময় ? সাধনার সময়, না তার পর ?

মা—সাধনার পর। সাধনার সময় ত উন্মাদ। তখন শ্বশুরবাড়ী গেলে ত লোকে পাগল বলবে। শিব শ্বশুর-বাড়ী গেলেন। সব্বাই বলতে লাগল, 'ওমা উমা, তোর এই ছিল কপালে! শেষে ভাঙ্গড়ের হাতে গেলে!' সেই তখন (বিবাহের পর) ঠাকুরকে কত কি সবাই বলত—'পাগলা জামাই, কি হবে গো ?'

আমি—কাল যে মণীন্দ্র গুপ্ত এসেছিলেন, এঁকে ত আর কখনও দেখি নি।

মা—এ আর একবার এসেছিল। ঠাকুরের কাছে যেত, তখন খুব ছোটটি।

আমি—ছোট নরেনকে এখানে একবারও দেখি নি।

মা—সে আসে না। ঠাকুরের কাছে যেত। কাল ছিপছিপে, মুখে বসন্তের দাগ। ঠাকুর তাকে খুব ভালবাসতেন। তার জন্য ভাবতেন; 'এই ছোট নরেনকে মনে পড়েছে, এই ছোট নরেন এল'—ভাবে দেখতেন।

আমি—পল্টু বাবু একদিন মাত্র এখানে এসেছিলেন। তারক বাবু (বেলঘরিয়ার) মধ্যে মধ্যে আসেন।

মা—পতুও মাঝে মাছে আসে। আমাকে মাস মাস একটি করে টাকা দেয়। বড় গরীব। আমি যখন জয়রামবাটীতে থাকি তখন সেখানে পাঠায়। পতু আর মণীন্দ্র এরা দুটিতে যখন ঠাকুরের কাছে যেত তখন ছেলেমানুষ, দশ-এগার বছরের। দোলের দিন সব বাইরে চলে গেছে, আবীর দিচ্ছে, কাশীপুর বাগানে। এরা দুটি গেল না। ঠাকুরকে হাওয়া করতে লাগল—এই এ হাতে, এই সে হাতে। ছেলেমানুষ কি না, হাতে পায় না। এই পা টিপছে। ঠাকুরের তখন কাশি ছিল, তাই মাথায় জ্বালা করত। হাওয়া দরকার হত। ঠাকুর বলছেন, 'যা, যা, তোরা নীচে যা, আবীর খেলগে না, সব্বাই গেছে।' পতু বলছে, 'না, মশাই, আমরা যাব না। আমরা এইখানে

আছি। আপনি রয়েছেন, আমরা কি ফেলে যেতে পারি ?'

"ওরা কিছুতেই গেল না। ঠাকুর কেঁদে বললেন, 'আরে, এরাই আমার সেই রামলালা, আমাকে সেবা করতে এসেছে। ছেলেমানুষ, তবু আমাকে ফেলে আমোদের দিকে ফিরে চাইলে না।' বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ল দেখলুম।"

আমি—ঠাকুরের কাছে কত ভক্ত যেত, তারা সব এখন কোথায় ? কেউ ত আসে না।

মা—তারা সব আপন মনে আনন্দে আছে।

আমি—যে আনন্দে আছে !

মা—তা ত বটেই। সংসারে মাগ ছেলে নিয়ে কি আর সুখ আছে ? কামিনী আর কাঞ্চন, ওতেই ভুলে রয়েছে। সংসারে সবই ভোগের।

আমি—তাতে আবার বহির্মুখ মন।

মা—জগদম্বা কালী, তিনিই সকলের মা, তাঁ থেকেই ভালমন্দ সব হয়েছে। তিনিই সব প্রসব করেছেন। স্বতঃসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, হঠাৎসিদ্ধ—এইরকম সব আছে না ?

আমি—হঠাৎসিদ্ধ কি ?

মা—যেমন পরের ধন পেয়ে হঠাৎ বড়মানুষ হয়ে গেল ;

এই সময় নলিনী স্নান করিয়া আসিল। উপরের পায়খানা একটু অপরিষ্কার ছিল, তাহাতে দুই-এক ঘটী জল ঢালিয়া দিয়া ধুইয়াছিল। সেইজন্য গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছে। মা দেখিয়া বলিলেন, "নলিনী, গঙ্গা নেয়ে এলি নাকি ?" নলিনী কারণ বলিল।

আমি—কলে নাইলেইত হ'ত।

মা—তাই ত, কলে নেয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করলেই ত হ'ত। (নলিনীর শরীর ভাল ছিল না।)

নলিনী—তা কি হয়, পায়খানা।

মা—তাতে কি ? বিষ্ঠা ত আর ছুঁস নি। আর ছুঁলেই বা কি ? পেটের মধ্যেও ত রয়েছে। ঠাকুর বলতেন, 'একটা গামলায় ডাল, ভাত, তরকারী, ছানা, মাখন রেখে দাও, দুদিন পরে পচে দুর্গন্ধ হবে। বিষ্ঠাও ত তাই।' তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিজের মল মুখে দিলেন। ন্যাংটা (তোতাপুরী) বললে, 'ও ত আপনার মল।' তখন ঠাকুর কোথা গিয়ে চাখলেন।

"আমিও ত দেশে কত শুকনো বিষ্ঠা মাড়িয়ে চলেছি। দুবার 'গোবিন্দ, গোবিন্দ' বললুম, বস্, শুদ্ধ হয়ে গেল। মনেতেই সব, মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ। মানুষ নিজের মনটি আগে দোষী করে নিয়ে তবে পরের দোষ দেখে। পরের দোষ দেখলে তাদের কি হয় ? —নিজেরই ক্ষতি।

আমার এইটি ছেলেবেলা থেকেই স্বভাব যে আমি কারও দোষ দেখতে পারতুম না। আমার জন্য যে এতটুকু করে আমি তাকে তাই দিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করি। তা আবার মানুষের দোষ দেখা? মানুষের কি দোষ দেখতে আছে! ওটি শিখি নি। ক্ষমারূপ তপস্যা।"

আমি—স্বামিজী বলতেন, 'ঘরে চোর ঢুকে কিছু নিয়ে গেল, তোমার মনে উঠবে—চোর, চোর। কিন্তু শিশুর মনে চোর-বুদ্ধি নেই ; সে চোর বলে কিছুই দেখলে না।'

মা—তা ত বটেই। যার শুদ্ধ মন, সে সব শুদ্ধ দেখে। এই গোলাপের (তখন গোলাপ মা কিজন্য আসিয়াছেন) মনটি শুদ্ধ। বৃন্দাবনে মাধবজীর মন্দিরে কাদের ছেলেমেয়ে বাহ্যে করে গেছে। সব্বাই বলছে, 'বিষ্ঠা, বিষ্ঠা,' কিন্তু কেউ ফেলবার চেষ্টা করছে না। গোলাপ তাই দেখে অমনি নিজের ধুতি—নূতন মলমলের ধুতি—ছিঁড়ে পুঁছে ফেলে দিলে। স্ত্রীলোকগুলো দেখে বলছে, 'এ যখন ফেলছে, তখন এরই ছেলে বাহ্যে করেছে!' আমি মনে মনে বলছি, 'দেখ মাধব, কি বলছে।' কেউ বা বলছে, 'এঁরা সাধুলোক (যোগীন স্বামী প্রভৃতি ছিলেন), এঁদের আবার ছেলেপিলে কি? এঁরা ফেলছেন সকলের দর্শনের অসুবিধা হচ্ছে, মন্দিরে বিষ্ঠা রয়েছে, এ জন্য।'

"এই গঙ্গার ঘাটে যদি কোন ময়লা থাকে ত গোলাপ হেথা সেথা থেকে ন্যাকড়া কুড়িয়ে এনে পরিষ্কার করে ঘটী ঘটী জল ঢেলে ধুয়ে দিলে। এতে দশজনের সুবিধা হল। তারা যে শান্তি পেলে, ওতে গোলাপেরও মঙ্গল হবে, তাদের শান্তিতে এরও শান্তি হবে।

"অনেক সাধন তপস্যা করলে, পূর্ব্বজন্মের অনেক তপস্যা থাকলে, তবে এ জন্মে মনটি শুদ্ধ হয়।"

কিছু পরে আমি বলিলাম, "মা, আমার ত জপ করতে মন লাগে না।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "কেন, মোটেই না?"

আমি—ঐ একটু আধটু, কোনমতে বেগারশোধ। একটু করেই ভাবি, বিড়বিড় করে কি হবে? ঈশ্বর যদি থাকেন ত আছেনই। বরং ধ্যান করতে চেষ্টা করি।

মা—ধ্যান হয়?

আমি—না, হয় কই? সব ত বুঝি, তবে শক্তি কোথা? দক্ষিণেশ্বরে কোন্ রাস্তায় যেতে হবে, তা ত জান, কিন্তু হেঁটে যেতে পার কি?

মা—ও জপ বিড়বিড় করা মেয়েদের কর্ম্ম, তোমাদের জ্ঞান আছে।

বৈকালে ললিত বাবু প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত কথা হইতেছিল। আমিও মাঝে মাঝে বলিতেছিলাম।

মা বলিতেছেন, "ঠাকুর বলতেন, 'ক্ষুরের ধারের ন্যায় পথ, বড় কঠিন রাস্তা।'" বলিয়াই একটু পরে আবার বলিতেছেন, "তা তিনিই কোলে করে রয়েছেন, তিনিই দেখছেন।"

আমি—কই, কিছু জানতে দিচ্ছেন না যে!

মা—সেই ত দুঃখ (তোমাদের)।

আমি—হাঁ।

ললিত বাবু—মরলে পর ঠাকুর কোলে করে নেবেন, সে আর বেশী কি? যদি এই দেহেই নিতেন!

মা—এই দেহেই কোলে করে রয়েছেন। মাথার উপরে তিনি আছেন, ঠিক ধরে রয়েছেন।

আমি—ঠিক আমাদের ধরে রয়েছেন?

মা—হাঁ, ঠিক ধরে রয়েছেন।

আমি—সত্যি বলছ?

মা—হাঁ, সত্যি বলছি, ঠিক ধরে রয়েছেন।

আমি—ঠিক?

মা—(দৃঢ়তার সহিত) হাঁ, ঠিক।

সকালের পূজা শেষ করিয়া মা শালপাতায় করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদবিতরণ করিলেন। তারপর ঘরঝাঁট দিয়া ওঁচলাগুলি হাতে তুলিয়া লইবার সময় হঠাৎ একটা আলপিন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠে ফুটিয়া গেল। উহাতে রক্ত বাহির হইল এবং খুব যাতনা হইতে লাগিল। আমি

নীচে সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়া দেখি, খুব যাতনা হইতেছে। আসিবার সময় কে যেন বলিলেন, "চূণ গরম করে দাও।" আমি তাড়াতাড়ি চূণ গরম করিয়া উপরে লইয়া গেলাম এবং আঙ্গুলে লাগাইয়া দিলাম। দিতেই যাতনার অনেকটা উপশম হইল। মা বলিলেন, "বাবা, তোমরাই আমার আপনার লোক, তোমরাই আমার আপনার।"

১৬-৮-১২ (৩১শে শ্রাবণ), বৈকাল ৫টা

মা—তের বছরের সময় কামারপুকুরে যাত্রার দিন হয়, কামারপুকুর যাই। তখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। আমি কামারপুকুরে মাস খানেক থেকে জয়রামবাটী আসি। আবার পাঁচ-ছয় মাস পরে গিয়ে কামারপুকুরে প্রায় দেড় মাস থাকি—তখনও ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। কামারপুকুরে আমার ভাসুর, জা, এঁরা সব ছিলেন। ঠাকুর তারপর যখন ব্রাহ্মণীকে নিয়ে দেশে এলেন (ইং ১৮৬৭), তখন আমাকে খবর দিলেন, 'ব্রাহ্মণী এসেছেন, তুমি এস।' আমি খবর পেয়ে কামারপুকুর গেলুম। সেবার প্রায় মাস তিনেক ছিলুম। বামুন ঠাকরুণ জয়রামবাটী, শিওড়, এসব ঘুরে দেখলেন। একদিন চিনু শাঁখারীর এঁটো নেওয়া নিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়।

আমি—চিনু তখন বেঁচে আছেন?

মা—হাঁ, বেঁচে আছে, বুড়ো অথর্ব্ব।

আমি—কেউ কেউ বইয়ে ঠাকুরের ছেলেবেলাতেই যেন চিনু মারা গেছেন, এই ভাব দিয়েছেন।*

মা—সে তার অনেক পরে মারা গেছে। ওখানে তার সমাজ আছে, শীতল দেয়।

"বামুন ঠাকরুণ বললেন, 'চিনু ভক্ত লোক, তার এঁটো নেবো তাতে কি?' হৃদয় বললে, 'তুমি শাঁখারীর এঁটো নেবে, থাকবে কোথা? কোথা শোবে?' বামুন ঠাকরুণ বললেন, 'কেন? শীতলার ঘরে মনসা শোবে।'

"হৃদয় বললে, 'দেখি কেমন শীতলার ঘরে মনসা শোয়।' ঐসব নিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি হয়। হৃদয় তাঁকে কি একটা ছুড়ে মারলে, তাঁর কাণে লেগে রক্ত পড়তে লাগল। বামুন ঠাকরুণ কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুর বললেন, 'ওরে হৃদু, তুই কেন এমন করলি? এ সংলোক, ভক্তিমতী। ওরে, এমন হলে যে সব লোক জড় হবে, কেলেঙ্কারি হবে।'

"তারপর একদিন ঠাকুর তাঁকে (ব্রাহ্মণীকে) কি রকম ভয় দেখিয়ে দিলেন। কি রকম ভাবাবস্থা দেখে ভয় পেলেন যেন হরিণীর মত। ভয়ে সর্ব্বক্ষণ এইরকম (উপরের দিকে চাহিয়া) করতে লাগলেন। বললেন, 'ওরে প্রসন্ন

* রামকৃষ্ণপুঁথি—পৃঃ ২৪।

(লাহাদের প্রসন্নময়ী), কোথা যাব? ওরে কি করব? জগন্নাথ যাব, না বৃন্দাবন যাব?' তারপর একদিন কোথায় যে কখন চলে গেলেন কেউ টের পেলে না। তদবধি আর আসেন নি। পাছে হৃদয়ের সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়— লাহাদের বাড়ী কাছে—এই সব জন্য ঠাকুর তাঁকে ঐ রকম ভয় দেখিয়েছিলেন।

"একদিন আবার বামুন ঠাকরুণ ঠাকুরকে মালাটালা দিয়ে গৌরাঙ্গের মত সাজালেন। তখন ঠাকুরের কি রকম ভাব হয়েছে। বামুন ঠাকরুণ আমাকে ডেকে নিলেন। যেতেই ঠাকুর বললেন, 'কেমন হয়েছে?' আমি 'বেশ হয়েছে' বলে, কোনমতে যা হয় একটা বলে, প্রণাম করেই চলে এলুম। ভাবাবেশ দেখে আমার ভয় হয়েছিল।

"এর পর আবার জয়রামবাটী এলুম। নানা লোকের কাছে শুনতুম তিনি পাগল, উন্মাদ হয়েছেন, উলঙ্গ হয়ে বেড়ান। কেউ ত আর তখন তাঁর ভাব বুঝত না। আমি মনে ভাবলুম, সব্বাই এমন বলেছে, আমি গিয়ে একবার দেখে আসি কি রকম আছেন। তখন কি যোগ উপলক্ষ্যে আমাদের দেশ থেকে মেয়েরা গঙ্গাস্নানে আসছিল। ফাল্গুন-চৈত্র মাস (১২৭৮ সন)। আমি একজনকে বললুম, 'আমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখতে যাব কেমন আছেন।'

সে বাবাকে সব বলে দিলে। আমি ত আর বাবাকে কিছু বলতে পারি নি লজ্জায়, ভয়ে।

"বাবা বললেন, 'যাবে, বেশ ত।' তিনি আমাদের সঙ্গে এলেন। পথে জ্বর হল। খুব জ্বর, কোন জ্ঞান নেই। রাতে স্বপ্নে দেখি কি একটি কাল কুচকুচে মেয়ে আমার বিছানার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলুচ্ছে। বললে, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' আমি বললুম, 'আমিও তাঁর ওখানে যাব। তুমি আমাদের কে হও?' সে বললে, 'আমি তোমার বোন। ভয় কি? সেরে যাবে।'

"পরদিনই জ্বর ছেড়ে গেল। বাবা শেষে পাল্কী করলেন। রাত প্রায় নটার সময় দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছুলুম। আমি একেবারেই ঠাকুরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত। এঁরা সব নহবতের ঘরেটরে গিয়েছেন (যেখানে ঠাকুরের মা আছেন)। ঠাকুর দেখে বললেন, 'তুমি এসেছ? বেশ করেছ।' বললেন, 'মাতুর পেতে দে রে।' ঘরেই মাতুর পেতে দিলে। ঠাকুর বললেন, 'এখন কি আর আমার সেজ বাবু আছে? আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে।' তখন কয়েক মাস হয় মথুর বাবু মারা গেছেন। অক্ষয় (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) তারও কয়েক মাস আগে মারা গেছে।".

আমি—মথুর বাবু তখন নেই?

মা—না, কয়েক মাস, সাত-আট মাস আগে মারা গেছেন। মথুর বাবু থাকলে কি আর আমাকে ঐ কুঁড়ে-ঘরে (নবতে) বাস করতে হয়? শৌচের যা কষ্ট! তিনি অট্টালিকায় রাখতেন। আমরা নবতের ঘরে যেতে চাইলুম। ঠাকুর বললেন, 'না না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধা হবে। এ ঘরেই থাক।' আমরা তাঁর ঘরেই শুলুম। একটি সঙ্গী মেয়ে আমার কাছেই শুল। হৃদয় দু ধামা না তিন ধামা মুড়ি আনলে। তখন সকলের খাওয়া হয়ে গেছে কিনা।

"পরদিন ডাক্তার দেখালেন। কয়েকদিন পরে জ্বর সারতে নবতের ঘরে গেলুম। তখন আমার শাশুড়ী কুঠি-ঘর ছেড়ে নবতের ঘরে এসে রয়েছেন। কুঠিঘরের একটি কোঠা তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অক্ষয় তাঁর ঐ কুঠিতেই মারা যায়। সে মারা যেতে মা ঠাকরুণ কুঠিঘর ছেড়ে এলেন। বললেন, 'আর আমি ওখানে থাকব না। আমি এই নবতের ঘরেই থাকব, গঙ্গা-পানে মুখ করে রইব, কুঠিতে আর আমার দরকার নেই।'

"দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ষোড়শীপূজা করলেন (১২৭৯, জ্যৈষ্ঠ)। আমি তখন ষোল বছরে

পড়েছি।* (সম্ভবতঃ ফলহারিণী কালীপূজার) রাত্রে প্রায় নটায় আমাকে তাঁর ঘরে আনালেন। পূজার সব যোগাড়। ভাগনে সব যোগাড় করে দিয়েছে। আমাকে বসতে বললেন। আমি তাঁর চৌকীর উত্তর পাশে (গঙ্গাজলের) জালার পানে মুখ করে (পশ্চিম মুখে) বসলুম। ঠাকুর পূর্ব্বমুখ হয়ে পশ্চিম দিকের দরজার কাছে বসেছেন। দরজা সব বন্ধ। আমার ডান পাশে সব পূজার জিনিস।"

আমি—পূজার সময় কি করলেন ?

মা—আমি একটু পরেই বেহুঁশ হয়ে গেলুম। পূজার মধ্যে কি হয়েছে জানতে পারি নি।†

আমি—হুঁশ হতে তুমি কি করলে ?

মা—আমি মনে মনে প্রণাম করলুম। পরে চলে এলুম।

---

* শ্রীশ্রীমার জন্ম ৮ই পৌষ, ১২৬০ সাল। কোষ্ঠির হিসাবে ১৯ বছরে পড়িলেও মার কিন্তু ধারণা ছিল তিনি তখন ষোল বছরে পড়িয়াছেন। অন্যত্রও ষোল বছর বলিয়াছেন। 'রামকৃষ্ণপুঁথি'তেও এই ভুল আছে।

† লক্ষ্মী দিদির মুখে শুনিয়াছি মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "পূজার প্রথমে পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন, সিঁদুর দিলেন, কাপড় পরিয়ে দিলেন। পান মিষ্টি খাওয়ালেন।" লক্ষ্মী দিদি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত অত লজ্জা কর—কাপড় কি করে পরালেন গো ?" মা বলিলেন, "আমি তখন কি রকম যেন (অর্দ্ধবাহ্যদশা ?) হয়ে গিছলুম !"

মা জ্ঞানানন্দকেও এই ঘটনা বলিয়াছিলেন। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা, ঠাকুর যখন আপনার পায়ে ফুল দিতে গিয়ে হাত দিলেন, মিষ্টি খাওয়ালেন, তখন আপনার সঙ্কোচ বোধ হল না ?" মা বলিলেন, "না, আমি তখন সব দেখছি বটে, কিন্তু কিছু বলতে কইতে ইচ্ছা ছিল না।"

আমি—কালীপূজার রাত, এত লোক, কেউ এ পূজা টের পায় নি ?

মা—দরজা যে বন্ধ ! কালীবাড়ীতে গানবাজনা, হৈ রৈ। সবাই তা নিয়ে ব্যস্ত। আর তাঁর সঙ্গে তাঁদের অন্য সম্পর্কই বা কি ?—একমাত্র দর্শন-স্পর্শন, আর ত কিছু না।

আমি—পূজার সময় আর কেউ ছিল ?

মা—দীনু বলে একটি ছেলে, আমার ভাসুরপো হয়. মুকুন্দপুরের জ্ঞাতির ছেলে, ঠাকুরের কাছে থাকত। তিনি খুব ভালবাসতেন। সে সব ফুল বেলপাতা যোগাড় করে এনে দিতে লাগল। হৃদয় সব ঠিকঠাক করে দিলে। পূজার সময় আর কেউ ছিল না, একা তিনি ছিলেন। পূজার শেষাশেষি হৃদয় এসেছিল।

"রাম বাবু বইয়ে লিখেছেন জয়রামবাটীতে ষোড়শী-পুজা হয়েছে। আমাদের দেশে এমনিই রক্ষা নেই। এতেই 'কাকে মেয়ে দিলে—উন্মাদ, পাগল !' বলত, তা আবার মেয়েমানুষকে পূজা করা ! তা হলে ত হয়েছে !

"এর পর দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এক বছর ছিলাম। শেষটায় অসুখ হতে দেশে যাই।* শম্ভু বাবু ডাক্তার প্রসাদ বাবুকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছিলেন (দক্ষিণেশ্বরে)।"

---

* রামলাল দাদা বলিতেন, তাঁহার পিতার (ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুত রামেশ্বরের) মৃত্যুকালে (১২৮০, ২৭শে অগ্রহায়ণ) শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে ছিলেন।

আমি—ঠাকুরের মার শরীর যাবার সময় (১২৮২, ১৬ই ফাল্গুন) দক্ষিণেশ্বরে ছিলে কি ?

মা—না, জয়রামবাটীতে ছিলাম। তখন আমার অসুখ। দক্ষিণেশ্বরে একবছর ভুগে দেশে গেছি। বদনগঞ্জে বাজারের শিবমন্দিরে পীলের দাগ নিলুম।*

"দু-তিন বার আসবার পর একবার কাপ্তেন (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) বাহাদুরি কাঠ দিলেন। এখন যেখানে রামলালের বাড়ী তার পাশে আমার জন্য ঘর হল। শম্ভু বাবু করালেন। একখানা গুঁড়িকাঠ জোয়ারে ভেসে গেল। হৃদয় এসে 'তোমার ভাগ্য মন্দ !'—এই সব বলে আমাকে বকলে। কাপ্তেন শুনে বললেন, 'যা কাঠ লাগে আমি দেব।' ঘরে কিছুদিন রইলুম। একদিন বর্ষাকালে ঠাকুর গেছেন। শেষে এমন বৃষ্টি যে ঠাকুর আর সে রাত্রে ফিরে আসতে পারলেন না। সেখানেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে

---

* বদনগঞ্জ জয়রামবাটী হতে প্রায় ৪ মাইল। এই দাগ দেওয়া সেকালের এক অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। স্নানের পর রোগীকে শোয়াইয়া তিন-চারি জন লোক তাহার হাত পা চাপিয়া ধরিত, যাহাতে সে যন্ত্রণায় উঠিয়া না পালায়। তারপর এক ব্যক্তি একটা জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়া পেটের উপকার কতকটা স্থান ঘষিত। সে সময় চামড়া পুড়িয়া যাওয়ায় রোগী চীৎকার করিত। শ্রীশ্রীমা স্নান করিয়া আসিবার পর যখন দাগ দিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ধরিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন তিনি বলিলেন, "না, কাউকে ধরতে হবে না, আমি নিজেই চুপ করে শুয়ে পড়ে থাকব।" বাস্তবিকই তিনি ঐ অসহ্য যন্ত্রণা স্থিরভাবে সহ্য করিলেন। ওদেশের লোকদের বিশ্বাস ছিল যে উহাতে ম্যালেরিয়া জ্বর সারে। শ্রীশ্রীঠাকুরও উহা লইয়াছিলেন।

রইলেন। আমাকে ঠাট্টা করে বললেন, 'কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ী যায় না? এ যেন আমি তাই এসেছি।'

"পরে কাশীর একটি প্রাচীন মেয়ে আমাকে বলে ওবাড়ী থেকে নবতের ঘরে আনালে। তখন ঠাকুরের অসুখ, সেবার কষ্ট হচ্ছে। বাহ্যে গিয়ে গিয়ে মলদ্বার হেজে গেছে। আমি এসে সেবা করতে লাগলুম।

"কাশীতে গিয়ে এই মেয়েটির অনেক খোঁজ করেছিলুম, দেখা পাই নি। * তার পরের বার (চতুর্থ বার) ত আমি, মা, লক্ষ্মী, আরও কে কে দক্ষিণেশ্বরে আসি। তারকেশ্বরে গত অসুখের মানসিক নখ চুল দিয়ে এলুম। প্রসন্ন সঙ্গে থাকায় প্রথমে কলিকাতায় তার বাসায় (গিরিশ বিদ্যারত্নের বাসায়) উঠি। ফাল্গুন-চৈত্র মাস হবে (১২৮৭)। পরদিন সকলে দক্ষিণেশ্বরে যাই। যেতেই হৃদয় কি ভেবে বলতে থাকে, 'কেন এসেছে? কি জন্য এসেছে? এখানে কি?'—এই সব বলে তাঁদের অশ্রদ্ধা করে। আমার মা সে কথায় কোন জবাব দেন নি। হৃদয় শিওড়ের লোক, আমার মাও

---

* যোগেন-মার নিকট শুনিয়াছি, মা পূর্ব্বে ঠাকুরকে খুব সঙ্কোচ করিতেন; মুখের ঘোমটা খুলিতেন না। ঐ কাশীর মেয়েটিই এই সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দেয়। একদিন রাত্রে সে মাকে লইয়া ঠাকুরের ঘরে গেল এবং মায়ের মুখের ঘোমটা সরাইয়া দিল। ঠাকুরও মাকে কত ভগবৎকথা শুনাইতে লাগিলেন। মা এবং ঐ মেয়েটি যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কথা শুনিতে লাগিলেন। এত তন্ময় হইয়াছেন যে এদিকে যে সূর্য্যোদয় হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও আর হুঁশ নাই।

শিওড়ের মেয়ে। কাজেই হৃদয় মাকে আদৌ মান্য করলে না। মা বললেন, 'চল, ফিরে দেশে যাই; এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?' ঠাকুর হৃদয়ের ভয়ে আগাগোড়া 'হাঁ, না' কিছুই বলেন নি। আমরা সকলে সেই দিনই চলে গেলুম। রামলাল পারের নৌকা এনে দিলে। আমি মনে মনে মা কালীকে বললুম, 'মা, যদি কোন দিন আনাও ত আসব।' তারপর হৃদয় ওখান হতে চলে গেল, ত্রৈলোক্য বাবুর মেয়ের পায়ে ফুল দিয়ে (১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ)। রামলাল কালীঘরের (স্থায়ী) পূজারী হল। পূজারী হয়ে ভাবলে, 'আর কি, এবার মা কালীর পূজারী হয়েছি।' সে ঠাকুরের অত খোঁজখবর নিত না। উনি ভাব-টাব হয়ে হয়ত পড়ে থাকতেন। এদিকে মা কালীর প্রসাদ শুক্না হয়ে থাকত। ঠাকুরের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হতে লাগল। তখন অন্য কেউ নেই। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ আমাকে আসবার জন্য খবর দিতে লাগলেন। ওদেশের যে আসত তাকে দিয়েই বলে পাঠাতেন আসবার জন্য। কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে, রামলাল মা কালীর পূজারী হয়ে বামুনের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর অত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে, ডুলি করে হোক, পাল্কী করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।' ঠাকুরের

এই সব সংবাদ পেয়ে আমি শেষে আসলুম (১২৮৮, মাঘ বা ফাল্গুন)। এক বছর আসি নি।"*

আমি—রাসমণি যখন দেহত্যাগ করেন তখন ঠাকুর কোথায় ?

মা—তখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর মুখে ও আরও লোকজনের মুখে শুনেছিলুম, রাসমণির দেহত্যাগের সময় কালীঘাটের মা কালীর মন্দিরের সব আলো একটা দমকা হাওয়া এসে নিবে যায়। তখন মা রাসমণিকে দেখা দেন। ওদের সকলেই কালীঘাটে মারা যায়। কেবল মথুর বাবু জানবাজারে মারা যান।

১৬-১০-১২, বুধবার, বেলুড় মঠ

মঠে দুর্গাপূজা। আজ দেবীর বোধন। শ্রীশ্রীমা আজ বৈকালে মঠে আসিবেন। সন্ধ্যা সমাগত। মায়ের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ছুটাছুটি করিতেছেন।

* ইহার পরের বার মা দেশে গিয়া ৭।৮ মাস পরেই (১২৯০ সনের মাঘ মাসে) দক্ষিণেশ্বরে আসেন। আসিয়া ঠাকুরের ঘরে কাপড়ের পুঁটুলিটি রাখিয়া প্রণাম করিতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে রওনা হয়েছ ?" তখন শ্রীশ্রীমায়ের উত্তরে ঠাকুর জানিলেন যে তিনি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওয়ানা হইয়াছেন। অমনি বলিলেন, "এই তুমি বৃহস্পতির বারবেলায় রওনা হয়ে এসেছ বলে আমার হাত ভেঙ্গেছে। যাও, যাও, যাত্রা বদলে এসগে।" শ্রীশ্রীমা সেইদিনই ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আজ থাক, কাল যেও।" পরদিনই শ্রীশ্রীমা যাত্রা বদলাইতে দেশে ফিরিয়া যান।

মঠের প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট ও কলাগাছ-স্থাপন হয় নাই দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এসব এখনও হয় নি, মা আসবেন কি?" দেবীর বোধন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীমায়ের গাড়ী মঠে পৌঁছিল। গোলাপ-মা মাকে হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইতেছেন। নামিবার পরই সমস্ত দেখিয়া মা বলিতেছেন, "সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গাঠাকরুণ এলুম।"

অষ্টমীর দিন অনেক লোক শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিল। তিন শতের উপর হইবে। উত্তর পাশের বাড়ীতে মা ও স্ত্রী-ভক্তদের থাকিবার স্থান হইয়াছিল। দক্ষিণ দিকের ঘরটিতে মা থাকিতেন। তক্তাপোষের উপর পশ্চিমমুখে পা ঝুলাইয়া বসিয়া সব ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তিন-চারি জন মন্ত্রও লইলেন।

বৈকালে ন-দিদির (গিরিশ বাবুর ভগিনীর) মৃত্যুপ্রসঙ্গ হইতেছিল। বোধনের দিন রাত্রে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হইয়াছে। মা বলিলেন, "আর মানুষ, এই আছে, এই নাই। কিছুই সঙ্গে যাবে না। একমাত্র ধর্ম্মাধর্ম্মই সঙ্গে যাবে। পাপ-পুণ্য মৃত্যুর পরও সঙ্গে যায়।"

একটি ছেলে স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছিল। ঠাকুর তাহাকে কোলে করিয়া মন্ত্র দিয়াছেন। সে মায়ের নিকট হইতে সব জানিয়া লইল। মা সেই কথায় বলিলেন, "এই ত

সেই বামুনের ছেলেটিকে ঠাকুর মন্ত্র দিয়েছেন, কোলে করে।”

আমি—তুমি তাকে ফের মন্ত্র দিলে ?

মা—না ; আমি বললুম, 'তুমি কৃপাসিদ্ধ। তুমি এই মন্ত্র জপ করেই সিদ্ধ হবে।' আমি তার মন্ত্র কেন শুনতে যাব ? আমি তাকে জপ দেখিয়ে দিলুম।

বিজয়ার দিন ডাক্তার কাঞ্জিলাল যে নৌকাতে প্রতিমা গঙ্গায় ভাসান হইতেছিল উহাতে দেবীর সামনে নানা-প্রকার মুখভঙ্গি রঙ্গব্যঙ্গ করিতেছিলেন এবং অনেকেই সেই সব দেখিয়া হাসিয়া অধীর হইতেছিল। একজন ব্রহ্মচারী কিছু মার্জ্জিতরুচি ছিল। সে উহাতে খুবই চটিতেছিল। মঠের উত্তর পাশের বাগানে থাকিয়া মাও নৌকার এই সব ব্যাপার দেখিতেছিলেন এবং আনন্দিত হইতেছিলেন। আমি মাকে বলিলাম, “মা, দেবীর সামনে ওরূপ করার জন্য কাঞ্জিলাল ডাক্তারকে গাল দিচ্ছে।” মা বলিলেন, “না, না, এসব ঠিক। গানবাজনা, রঙ্গব্যঙ্গ, এসব দিয়ে সকলরকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।”

পূজার কয়দিন থাকিয়া বিজয়ার পরদিন মা কলিকাতায়, প্রত্যাগমন করেন এবং কয়েকদিন মাত্র তথায় থাকিয়া কাশীধামে গমন করেন। •

কাশীধাম, ২০শে কার্ত্তিক, ১৩১৯
(৫ই নভেম্বর, ১৯১২), মঙ্গলবার, একাদশী

বেলা প্রায় একটার সময় শ্রীশ্রীমা কাশী অদ্বৈতাশ্রমে শুভাগমন করেন। তথায় কিছুক্ষণ থাকিয়া পরে কিরণ বাবুদের নূতন বাড়ীতে (লক্ষ্মীনিবাস) গমন করেন। বাড়ীটি একেবারে নূতন, আশ্রমের নিকটেই। বেশ প্রশস্ত বারান্দা দেখিয়া মা প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “ভাগ্যবান না হলে এমন হয় না। ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় দিলও খোলা হয়।”

মা এই বাড়ীতে দোতলায় উঠিয়াই প্রথম ঘরটিতে ছিলেন। গোলাপ মা, মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী ও আরও অনেক স্ত্রী-ভক্তেরা সঙ্গে ছিলেন। নীচে প্রজ্ঞানন্দ স্বামী ও আমরা থাকিতাম।

পরদিনই সকালবেলা পাল্কী করিয়া মা বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিতে যান। ২৪শে কার্ত্তিক, শ্যামাপূজার পরদিন সকালে মা পুনরায় অদ্বৈতাশ্রমে আসেন এবং সেবাশ্রম দর্শন করেন। পূজ্যপাদ মহারাজ, হরি মহারাজ, চারু বাবু, ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কেদার বাবা শ্রীশ্রীমার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সমস্ত ওয়ার্ড দেখাইলেন ও প্রত্যেকটির পরিচয় দিলেন। অন্যান্য সমস্ত দেখিয়া মা দক্ষিণের বারান্দায় চেয়ারে

আসন গ্রহণ করিলেন এবং কেদার বাবার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সেবাশ্রমের বাড়ী, বাগান ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন। আচ্ছা, এটি প্রথমে কি করে আরম্ভ হল? এ ভাবটি কার মাথায় প্রথমে ঢুকেছিল?" কেদার বাবা চারু বাবু প্রভৃতির যত্ন ও অধ্যবসায়ের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বাড়ী-তৈরীর সময় বুড়ো বাবা দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়েছিলেন।" মহারাজ কেদার বাবার যত্ন, উদ্যম ও পরিশ্রমের কথা বলিলেন। মা আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "স্থানটি এত সুন্দর যে আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাশীতে থেকে যাই।" মা বাসায় ফিরিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই একজন ভক্ত আসিয়া অধ্যক্ষকে বলিলেন, "শ্রীশ্রীমার সেবাশ্রমে দান এই দশ টাকা জমা করে নেবেন।"

২৮শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, শ্রীশ্রীমা পাল্কীতে প্রথমে কালভৈরব, বেণীমাধব, ত্রৈলঙ্গস্বামী, নাগপুররাজার মন্দির, গোয়ালিয়ররাজার মন্দির, সঙ্কটা, বীরেশ্বর ও মণিকর্ণিকা প্রভৃতি দর্শন করিয়া সন্ধ্যায় বাসস্থানে ফিরিয়া আসেন। গোলাপ-মা ও মায়ের স্ত্রী-ভক্তেরা গাড়ীতে এবং খগেন মহারাজ পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। অন্য আর একদিন বৈদ্যনাথ ও তিলভাণ্ডেশ্বর দর্শন করিয়া মা বলিলেন, "এ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ।" পরে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কেদারনাথ

দর্শন করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ গঙ্গাদর্শন করিয়া সন্ধ্যারতি দর্শন করিলেন। বলিলেন, "এ কেদার ও সেই কেদার (হিমালয়ের) এক—যোগ আছে। এঁকে দর্শন করলেই তাঁকে দর্শন করা হয়, বড় জাগ্রত।"

একদিন মা সারনাথ দেখিতে যান। কয়েকজন সাহেবও দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে অবাক হইয়া সারনাথের পুরাতন কীর্ত্তি দেখিতেছেন। মা বলিলেন, "যারা করেছিল, তারাই আবার এসেছে। আর দেখে অবাক হয়ে বলছে, কি আশ্চর্য্য সব করে গেছে!" সারনাথ হইতে ফিরিবার সময় মহারাজ নিজের গাড়ীতে মাকে পাঠাইলেন। প্রথমে মা কিছুতেই রাজী হন না, বলেন, "না, না, ও গাড়ীতে রাখাল এসেছে, রাখাল ওরা যাবে। আমার এ গাড়ীতে কষ্ট হবে না।" মায়ের গাড়ী রওয়ানা হইয়া দৃষ্টির বাহিরে যাইতেই মহারাজ যে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন উহার ঘোড়া ক্ষেপিয়া গিয়া গাড়ীসমেত রাস্তার পাশে খানায় পড়িল। মহারাজের শরীর বহু স্থানে ছড়িয়া গিয়া রক্তারক্তি হইয়াছিল।

মা এই ঘটনায় বলিয়াছিলেন, "এ বিপদ আমারই অদৃষ্টে ছিল। রাখাল জোর করে নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে। না হলে ছেলেপিলে (রাধু, ভূদেব প্রভৃতি) গাড়ীতে, কি যে হত!"

মা একবার কাশীতে তুইজন সাধুকে দর্শন করেন। গঙ্গা-তীরে এক নানকপন্থী সাধু এবং চামেলী পুরী। চামেলী পুরীকে যখন দর্শন করেন, গোলাপ মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে খেতে দেয় ?" বৃদ্ধ তত্নত্তরে খুব তেজ ও বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন, "এক তুর্গা মাঈ দেতী হ্যায়, ঔর কোন্ দেতা ?" উত্তরটি শুনিয়া মা খুব খুশী হইয়াছিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া সন্ধ্যার পর আমাদিগকে বলিতেছেন, "আহা, বুড়োর মুখটি মনে পড়ছে। যেন ছেলেমানুষটির মত।" পরদিন তাঁহার জন্য কমলালেবু, সন্দেশ ও একখানি কম্বল পাঠাইয়া দেন। পরে একদিন আমি অন্যান্য সাধু দেখিবার কথা বলাতে মা বলিলেন, "আবার সাধু কি দেখব ? ঐ ত সাধু দেখেছি, আবার সাধু কোথা ?"

একদিন কাশীর কয়েকটি স্ত্রীলোক শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়া দেখেন মা রাধু, ভূদেব প্রভৃতি ছেলে-মেয়েদের লইয়া খুব ব্যস্ত, আবার নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় একটু সেলাই করিয়া দিতে গোলাপ-মাকে বলিতেছেন। ঐসকল দেখিয়া তাহাদের একজন বলিয়া উঠিলেন, "মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ।" অস্ফুট-স্বরে মা বলিলেন, "কি করব, মা, নিজেই মায়া।"

আর একদিন বৈকালে তিন-চারিটার সময় কয়েকটি

স্ত্রীলোক শ্রীশ্রীমায়ের নাম শুনিয়া দর্শন করিতে আসিলেন। মা বারান্দায় বসিয়া আছেন। গোলাপ-মা প্রভৃতি এক পাশে বসিয়া। একটি স্ত্রীলোক গোলাপ-মাকে প্রাচীনা এবং ভব্য-আকৃতি-বিশিষ্টা দেখিয়া তাঁহাকেই মাতাঠাকুরাণী মনে করিয়া প্রণাম করিয়া কথা বলিতে যাওয়ায় গোলাপ-মা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ঐ উনিই মা-ঠাকুরুণ।" মায়ের সাদাসিধা চেহারা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, মাতাঠাকুরাণী বুঝি রহস্য করিতেছেন। গোলাপ-মা আবার বলায় তিনি যেমন মাকে প্রণাম করিতে গেলেন, অমনি মাও হাসিয়া বলিলেন, "না, না, ঐ উনিই মা-ঠাকরুণ।" তখন স্ত্রীলোকটি মহা সমস্যায় পড়িলেন। গোলাপ-মা এবং মা বারবার পরস্পরকে দেখাইয়া বলিতেছেন, "ঐ উনিই মা-ঠাকরুণ।" আমরা দেখিয়া হাসিতেছি। শেষে যখন তিনি গোলাপ-মাকেই মাতাঠাকুরাণী সাব্যস্ত করিয়া তাহার দিকে ফিরিতে গেলেন, তখন গোলাপ-মা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমার কি বুদ্ধি-বিবেচনা নেই? দেখছ না, মানুষের মুখ, কি দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন হয়?"

বাস্তবিকই মায়ের সরল, প্রসন্ন দৃষ্টিতে এমন একটি বিশেষত্ব ছিল যাহাতে স্বতঃই তাঁহাকে একটু অসাধারণ বলিয়া ধারণা হইত।

কিরণ বাবুর বাড়ী, কাশীধাম, প্রাতঃকাল

আমি—বিশ্বনাথকে রোজ সব লোকে ছোঁয়, সেজন্য সন্ধ্যার পর অভিষেক হয়ে তবে আরতি ও ভোগ হয়।*

মা—পাণ্ডাগুলো টাকার জন্য ওরূপ ছুঁতে দেয়। কেন ছুঁতে দেওয়া? দূর থেকে দর্শন করলেই ত হয়। যত লোকের পাপ এসে লাগে। কত অসচ্চরিত্র নানা রকমের লোক সব ছোঁয়।

"এক একটা লোক এমন আছে যে ছুঁলে সব শরীর গরম হয়, জ্বালা করে। তাই হাত পা ধুয়ে ফেলতে হয়। এখানে তবু লোকের ভিড় কলকাতার চেয়ে কম।"

আমি—এখানে যে মহারাজদের অনুমতি নিয়ে এলে তবে দর্শন হয়—ভিড় কমাবার জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন।

মা—হাঁ, কে এত সাত জায়গায় দরবার দিয়ে আসতে চায়?

পাগলী মামী এখানেও মাকে জ্বালাতন করিতেছেন। সেই কথার উল্লেখ করিয়া মা বলিলেন, "হয়ত কাঁটাসুদ্ধ বেলপাতা শিবের মাথায় দিয়েছি, তাই আমার এই কণ্টক হয়েছে।"

আমি—সে কি? না জেনে দিলে দোষ কি?

মা—না, না; শিবপূজা বড় কঠিন। ওতেও বড় দোষ

---

* তখন দিনের বেলায় ভোগ হইত না।

হয়। কি জান, যাদের শেষ জন্ম তাদের কর্ম্মগুলো সেই জন্মেই ভোগ হয়ে যায়।*

"আমি ত জন্মাবধি কোন পাপ করেছি বলে মনে পড়ে না। পাঁচ বছরের সময় তাঁকে ছুঁয়েছি। আমি না হয় তখন না বুঝি, তিনিও ত ছুঁয়েছেন। আমার কেন এত জ্বালা? তাঁকে ছুঁয়ে অন্য সকলে মায়ামুক্ত হচ্ছে, আর আমারই কি এত মায়া? আমার যে মন রাত দিন উঁচুতে উঠে থাকতে চায়, জোর করে তা আমি নীচে নামিয়ে রাখি—দয়ায়, এদের জন্য, আর আমার এত জ্বালাতন?"

আমি—মা, যতই করুক না কেন, সহ্য করে যাবে। মানুষ হুঁশে থাকলে রাগে না।

মা—ঠিক কথা বাবা। সহ্যর চেয়ে কিছুই নাই। তবে কি জান? রক্তমাংসের শরীর, হয়ত রেগেমেগে কিছু বলে ফেললুম।

আপন মনে বলিতেছেন, "যে সময়ে বলে সে বান্ধব। অসময়ে 'আহা' করলে কি হয়?"

---

* জনৈক ত্যাগী ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা, আমাদের এত রোগভোগ কেন হয়?" মা তদুত্তরে বলেন, "তোমাদের এই শেষ জন্ম, তাই বাকী সব জন্মের কর্ম্মফল এ জন্মেই ভোগ হয়ে যাচ্ছে।"

১১ই ডিসেম্বর, ১৯১২

মায়ের ওখানে 'কাশীখণ্ড'-পাঠ হইত। সন্ধ্যায় পাঠের পর কথাবার্ত্তা হইতেছে।

আমি—কাশীতে মলে কি সবারই মুক্তি হয়?

মা—শাস্ত্রে বলছে, 'হয়'।

আমি—তুমি কি দেখলে? ঠাকুর ত দেখেছিলেন শিব তারকব্রহ্ম-মন্ত্র দেন।

মা—কি জানি বাপু, আমি ত কিছু দেখি নি।

আমি—তোমার মুখে না শুনলে বিশ্বাস করি নে।

মা—ঠাকুরকে বলব, 'ঠাকুর, এ বিশ্বাস করতে চায় না, আমাকে কিছু দেখিয়ে দাও।'

ইহার পর আমি মুসলমান-রাজত্বে ভারতের নানাস্থানে মন্দির-ধ্বংসের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যে এত অত্যাচার তার তিনি কি করলেন?"

মা—তাঁর অনন্ত ধৈর্য্য। এই যে তাঁর মাথায় ঘটী ঘটী জল ঢালছে দিনরাত, তাতেই বা তাঁর কি? আর শুক্‌নো কাপড় দিয়ে ঢেকে পূজা কর তাতেই বা তাঁর কি? তাঁর অসীম ধৈর্য্য।

পরদিন সকালে খগেন মহারাজ মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর ৺কাশীতে এত সব দর্শন করেছিলেন, আপনি কি দেখলেন?" উত্তরে মা বলিলেন, "রাত্রে বিছানায়

শুয়ে জেগে আছি, হঠাৎ দেখি যে বৃন্দাবনের শেঠের বাড়ীর নারায়ণমূর্ত্তি পাশে দাঁড়িয়ে। মূর্ত্তির গলার ফুলের মালা পা পর্য্যন্ত ঝুলছে। ঠাকুর ঐ মূর্ত্তির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে। আমি মনে ভাবছি, 'ঠাকুর এখানে কি করে এলেন?' বললুম, 'ও বিশ্বাস করতে চায় না।' ঠাকুর বললেন, 'বিশ্বাস করবে বই কি, সব সত্য।' (অর্থাৎ কাশীতে মরিলে মুক্তি হয়।)

"সেই নারায়ণমূর্ত্তি আমাকে দুটি কথা বললেন। তার একটি এই—'ঈশ্বরতত্ত্ব না করলে কি তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়?' অপরটি মনে করতে পারছি না।"

খগেন মহারাজ—ঠাকুর নারায়ণমূর্ত্তির সামনে হাতজোড় করে কেন?

মা—ও তাঁর ওরকম ভাব ছিল—সকলের সামনে দীনতা।

সকালে পূজার পর যখন প্রসাদ আনিতে গিয়াছি, পূর্ব্বদিনের কথা মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল, কাশীতে মলে মুক্তি হয় কি না, কি দেখলে?"

মা—শাস্ত্রাদিতে আছে, আর এত লোক আসছে—মুক্তি হয়। তাঁর শরণাগত যে তার মুক্তি হবে না ত হবে কি?

আমি—শরণাগত যে তার ত মুক্তি হবেই। যে শরণাগত নয়, ভক্ত নয়, বিধর্ম্মী—এদের মুক্তি হবে কিনা?

মা—তাদেরও হবে। কাশী চৈতন্যময় স্থান। এখানের সব জীব চৈতন্যময়—পোকাটা মাকড়টা পর্য্যন্ত। ভক্তাভক্ত, বিধর্ম্মী, যে এখানে মরবে—কীটপতঙ্গ পর্যন্ত—তারই মুক্তি হবে।

আমি—সত্য বলছ ?

মা—হাঁ, সত্য বই কি ! নইলে আর স্থানমাহাত্ম্য কি ?

প্রসাদী মিষ্টের গন্ধে আমার হাতে একটা মাছি বসিয়াছিল ; সেটিকে দেখাইয়া বলিলাম, "এই মাছিটারও ?"

মা—হাঁ, মাছিটারও হবে। এখানের সব চৈতন্যময় জীব। ভূদেব তুটো পায়রা নিতে চেয়েছিল, উপরে সিঁড়ির কোঠায় বাচ্চা হয়েছিল। আমি বললুম, 'ওরে, না, না ; এরা কাশীবাসী, এদের নিতে নেই।'

"বাঙ্গালদেশের মেয়েছেলে সব, দেখগে বাঙ্গালীটোলায়। এদের কি ঘরবাড়ী, আত্মীয়স্বজনের মায়া নেই ? এরা সব কাশীলাভের জন্য এখানে এসেছে। বেশ জ্ঞান, মায়া নেই।"

আমি—দেখলে বাঙ্গালদের কেমন জ্ঞান ?

মা—হাঁ। ও দেশের (মায়ের দেশের) লোকগুলোর জ্ঞান নেই। এই তাজপুরের (রাধুর শ্বশুরবাড়ীর) ওরা—ওদের ত এখানে বাড়ী রয়েছে। তবু কাশীবাসের নামে ভয় পায়। মনে করে, বাড়ীতে থাকলে যেন মরবে না। মরণ ত সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

আমি—সত্য বলছ এখানে মলে মুক্তি হয় ?

মা—(বিরক্ত হইয়া) আমি তোমার কাছে তেসত্য করতে পারব না। এক সত্যেই রক্ষা নেই, তা আবার তেসত্য, কাশীতে !

আমি—(হাসিয়া) দেখো, আমার যেন কাশীতে মৃত্যু না হয়। তা হলে আমিই বা কোথায়, আর তুমিই বা কোথায় থাকবে—দেখাই হবে না।

মা—(সহাস্যে) কি বলে—'আমার কাশী চাই নি'।

আমি—মা, একটা কিছু প্রত্যক্ষ হলে তবে ত সত্য বিশ্বাস হয় ?

মা—তা মানুষ মহাজনদের কথা নেবে না ত কি করবে ? মুনি ঋষিরা যা বলে গেছেন, মহাজনেরা যে পথে গেছেন, তা ছাড়া আর পথ কি ?

আমি—প্রত্যক্ষ যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কথা শুনব না ত কি করব ? তাইত তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তুমি বললে তবে তোমাকে ছাড়ব।

মা—তুমি বিশ্বাস করলে আর না করলে তাতে তাঁর কি ? শুকদেব ত ডেয়ো-পিঁপড়ে ! অনন্ত তিনি, তার কি বুঝবে ? ঠাকুর ছিলেন—তিনি একটি দেখা (প্রত্যক্ষদর্শী) লোক, তিনি সব দেখেছেন, তিনি সব জানেন, তাঁর কথা বেদবাক্য। তাঁর কথা যদি বিশ্বাস না করবে ত কি করবে ?

আমি—শাস্ত্রে ত কত কথা বলে। এ বলছে এই, ও বলছে ঐ ; কার কথা নেব ? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।

মা—তা ত বটে। পাঁজিতে বিশ আড়া জল লিখেছে, নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না। আর শাস্ত্রে অনেক বাজে কথাও ভরেছে ! শাস্ত্রবিধি অত আর পারা যায় না। তিনি বলতেন, 'বৈধী-ভক্তি ভক্তিই নয়।'

"কামারপুকুরে যখন ছিলুম, বৃন্দাবন থেকে আসবার পর, তখন সব লোকের ভয়ে—'এ ও বলছে, ও তা বলছে'—হাতের বালা খুলে ফেললুম। আর ভাবতুম গঙ্গাহীন স্থানে কি করে থাকব, গঙ্গাস্নানে যাব মনে করলুম। আমার বরাবরই একটা গঙ্গাবাই ছিল। একদিন দেখি কি সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আগে আগে (ভূতির খালের দিক থেকে), পিছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল, এই সব যত ভক্তেরা—কত লোক ! দেখি কি ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে—এই জলের স্রোত ! আমি ভাবলুম, দেখছি ইনিই ত সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই ত গঙ্গা ! আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাফুল গাছ থেকে মুটো মুটো ফুল ছিঁড়ে এনে গঙ্গায় দিতে লাগলুম। তারপর ঠাকুর আমাকে বললেন, 'তুমি হাতের বালা ফেলো না। বৈষ্ণব-তন্ত্র জান ত ?' আমি বললুম, 'বৈষ্ণব-তন্ত্র কি ?

আমি ত কিছু জানিনে।’ তিনি বললেন, ‘আজ বৈকালে গৌরমণি আসবে, তার কাছে শুনবে।’ সেই দিনই বৈকালে গৌরদাসী এল। তার কাছে শুনলুম ‘চিন্ময় স্বামী’।*

“এ কলিতে শুধু সত্যের আঁট থাকলেই ভগবানলাভ হয়। ঠাকুর বলতেন, ‘যে সত্যকথাটি ধরে আছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।’ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁকে রোজ যে দুধ দিতুম তা জ্বাল দিয়ে বেশ ঘন করে দিতুম। আর এক সের দুধ হলে বলতুম আধ সের—কম করে বলতুম। ঠাকুর একদিন টের পেয়ে বললেন, ‘সেকি! সত্য ধরে থাকবে। এই আমার বেশী দুধ খেয়ে পেটের অসুখ হয়েছে।’ যাই মনে করা, অমনি সেদিন পেটের অসুখ হল।

“তাঁর সব সুযোগ ছিল। আমাদের সে সব কই?”

শেষে আমি বলিলাম, “মা, আমি এসব যা জিজ্ঞাসা করি, ও অমনি বলি, আমি ওসবের জন্য অত ভাবি না। আমার মনের ভাব অন্য রকম। আমি নিজে জানতে চাই, তোমাকে যে মা বলে ডাকি, তুমি আপন মা কিনা।”

---

* যোগেন-মা কামারপুকুর যাইলে মা তাঁহাকে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, “ঐ অশ্বত্থগাছের গোড়ায় ঠাকুর তখন দাঁড়িয়েছিলেন। শেষে দেখলুম, ঠাকুর নরেনের দেহে মিলিয়ে গেলেন।” তারপর যোগেন-মাকে বলিলেন, “এইখানকার ধূলি খাও, প্রণাম কর।” এই কথা স্বামিজীর কানে পৌঁছিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “একথা (অর্থাৎ ঠাকুরের স্বামিজীর দেহে প্রবেশ করার কথা) আমাকে বলা ভাল হয় নি।”

মা—আপনার মা নয় ত কি ? আপনারই মা।

আমি—তুমি ত বললে, আমি যে ভাল বুঝতে পারছি না। গর্ভধারিণী মাকে যেমন আপনা হতেই মা বলে জানি, এমন তোমাকে মনে হয় কই ?

মা—আহা, তাই ত।

পরক্ষণেই বলিতেছেন, "তিনিই মা-বাপ, বাছা, তিনিই মা-বাপ হয়েছেন।" (অর্থাৎ যে মা-বাপের দৃষ্টান্ত দিলাম তাঁহারাও তিনিই।)

১লা পৌষ, সন্ধ্যা ৭টা

মা তাঁহার ঘরে শুইয়া শুইয়াই কথা বলিতেছেন। 'কাশীখণ্ডে' আছে, কাশীতে মাছ খাওয়া উচিত নয়। সেই প্রসঙ্গ হইতেছিল।

আমি—তা মাছ খেলে প্রাণীহত্যা হয় ত।

মা—ওসব মানুষের খাদ্য, মানুষ খাবে না ত কি করবে ?

আমি—খাদ্যের নাম করে প্রাণীকে ব্যথা দেবে ?

মা—(অন্য কথার পর) তা বিচার করতে গেলে ওতেও হিংসা হয় বই কি—প্রাণী ত ? কাশীপুরে ঠাকুরের জন্য শামুকের ঝোল ব্যবস্থা হল। ঠাকুর আমাকে করতে বললেন। আমি বললুম, 'এগুলো জীয়ন্ত প্রাণী, ঘাটে দেখি চলে বেড়ায়। আমি এদের মাথা ইট দিয়ে ছেঁচতে

পারব না।' শুনে ঠাকুর বললেন, 'সেকি! আমি খাব, আমার জন্য করবে।' তখন রোখ করে করতে লাগলুম।

"সব সময় মনের এক অবস্থা থাকে না। (আমার প্রতি) তুমি সব খাবে। তোমার ওসব বিচার করবার দরকার নেই।"*

আমি দর্শনাদির কথা উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, লোকে এই যে দর্শনাদি করে, এসব কি ভাবে, না সাদা চোখে?"

মা—সবই ভাবে। আমি কিন্তু সাদা চোখে দেখেছিলুম—কামারপুকুরে—গৈরিকপরা, রাধুর মত অতটুকু মেয়ে (১১।১২ বছরের), মাথায় রুখো রুখো চুল, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, যেখানে যাই সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে—এই সামনে, এই পিছনে!

"তারপর বেলুড়ে—তখন নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে—

---

* কাশীতে আমি মাছ খাইতাম। কিন্তু মার জীবহিংসা সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত কথাটি আমার মনে লাগায় কলিকাতায় গিয়া প্রায় এক বৎসর মাছ খাই নাই। মা তাহা জানিতেন না। পরে তাঁহার সহিত যখন জয়রামবাটী যাই, সেখানে আমি মাছ খাইতেছি না দেখিয়া মা উহা খাইবার জন্য আমাকে বলেন; কিন্তু আমি খাইলাম না। আবার একদিন বিশেষ করিয়া বলেন; সেদিনও আমি খাই নাই। তৃতীয় বার পুনরায় খুব বলেন। "তোমরা মাছ খাবে, ওতে দোষ কি? তোমরা ত বিধবা নও। বিধবাদের খেতে নেই"—ইত্যাদি অনেক বলায় শেষে আমি খাই। ভাবিলাম, উনি অত করিয়া বলিতেছেন। আর ওদেশে মাছ ছাড়া খাইতেই বা কি দিবেন?

পঞ্চতপা করলুম। যোগেনও করলে। সেই সাধন-টাধনের পর মিশে গেল—আর দেখি নি।”

আমি—তপস্যার কি দরকার?

মা—তপস্যা দরকার। এই যোগেন এখনও কত উপবাস করে। খুব তপস্বী। গোলাপ জপে সিদ্ধ।

“নরেনের মা আমাকে দেখতে এসেছিল। নরেন তাকে বললে, ‘এই তুমি হয়ত তপস্যা করেছিলে বলে বিবেকানন্দকে পুত্র পেলে। আবার তপস্যা কর, আবার হয়ত একটা পাবে।’ ”

ঠাকুরের পঞ্চবটীতে তপস্যার কথা মা বলিলেন। তাহাতে আমি বলিলাম, “তাঁর ব্যাকুলতায় হুঁশ থাকত না, গঙ্গার জোয়ার মাথা বয়ে যেত। তুমি তাঁর কথা কেন বলছ? পঞ্চতপা-টপা এসব করে শরীরকে কেন কষ্ট দেওয়া?”

মা—পার্ব্বতীও শিবের জন্য করেছিলেন।

আমি—শিবও ত করেছেন—ধ্যানস্থ।

মা—হাঁ, তবে এসব করা লোকের জন্য। নইলে লোকে বলবে, ‘কই, সাধারণের মত খায় দায় আছে।’ আর পঞ্চতপা-টপা, এসব মেয়েলী—যেমন ব্রত সব করে না?

আমি—হাঁ, বুঝেছি। যেমন ব্রত করে, এসবও তেমনি ব্রত।

মা—ঠাকুর সব সাধনা করেছেন। বলতেন, 'আমি ছাঁচ করে গেলুম, তোরা সব ছাঁচে ঢেলে তুলে নে।'

আমি—'ছাঁচে ঢালা' মানে কি ?

ভূদেব—মানে ঠাকুরকে চিন্তা করা।

মা—ও বুঝেছে। 'ছাঁচে ঢালা' মানে ঠাকুরকে ধ্যান-চিন্তা করা। ঠাকুরকে ভাবলেই সব ভাব আসবে। তিনি যে-সব করেছেন তা চিন্তা করা। ঠাকুর বলতেন, 'আমাকে যে স্মরণ করে তার কখনও খাওয়ার কষ্ট থাকে না।'

মাকু—তিনি নিজে বলেছেন ?

মা—হাঁ, তাঁর নিজ মুখের কথা। তাঁকে স্মরণ করলে কোন দুঃখ থাকে না। দেখছ না, তাঁর ভক্তেরা সকলেই ভাল আছে। তাঁর ভক্তের মত এমনটি কোথাও দেখা যায় না। এই ত কাশীতে এত সাধু দেখছি, তাঁর ভক্ত-গুলির মত কোন্‌টি ?

আমি—তার কারণ আছে, মা। যেন এইমাত্র একটা বাজার ভেঙ্গেছে। সব চিহ্ন, লোকজন এখনও রয়েছে—ঠাকুরের সব অন্তরঙ্গ ভক্ত-টক্ত রয়েছেন কিনা। মনে হয়, এই যেন কাছে, বেশী দূর যান নি—ডাকলেই তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে।

মা—আর কত লোক পাচ্ছে যে !

আমি—কৃষ্ণ, রাম এঁরা যেন কত কালের! যেন সাড়া পাওয়ার মত কাছে নাই।

মা—হাঁ, ঠিক কথা।

আমি কাশীপুর বাগানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলাম, "এমন স্থানে এখন কে এক সাহেব বাস করছে।"

মা—কাশীপুর বাগান তাঁর অন্ত্যলীলার স্থান। কত তপস্যা, ধ্যান, সমাধি! তাঁর মহাসমাধির স্থান—সিদ্ধস্থান। ওখানে ধ্যান করলে সিদ্ধ হয়।

"ঠাকুর যদি তাদের (মালিকদের) স্বপ্ন দিয়ে স্থানটি করে নেন তবে হতে পারে।

"ঐ কাশীপুরে একদিন নিরঞ্জন-টিরঞ্জন ওরা কাঁচা রস খাবে বলে রস চুরি করতে যাচ্ছে। আমি দেখি কি ঠাকুরও তাদের পিছে-পিছে যাচ্ছেন। পরদিন তাঁকে একথা বলায় তিনি বললেন, 'ও রেঁধে তোমার মাথা গরম!'*

---

* এই ঘটনার একটু বিস্তৃত বিবরণ নীরদ মহারাজের মাতা শ্রীশ্রীমার নিকট এইরূপ শুনিয়াছিলেন: ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানে অত্যন্ত পীড়িত। এত দুর্ব্বল যে একেবারে শয্যাশায়ী। স্বামিজী প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেছেন। একদিন তাঁহারা স্থির করিলেন, বাগানের এক পাশের একটি খেজুর গাছ হইতে সন্ধ্যার সময় জিরেনের রস খাইবেন। ঠাকুরকে কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছুই জানাইলেন না। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা সকলে সেই গাছটির দিকে চলিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন সেই বাড়ীতেই থাকিতেন। তিনি হঠাৎ দেখিলেন, ঠাকুর তীব্রবেগে নীচে চলিয়া গেলেন। দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ইহা কি সম্ভব! যাঁহাকে পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়, তিনি ইহা কিরূপে করিবেন! অথচ চাক্ষুষ দেখিলেন। তখন ঠাকুরের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর বিছানায়

"ঢাকায় বিজয় গোঁসাইও দেখেছিল্ (ঠাকুরকে)—গা টিপে।

"তাঁর যাবার পর নরেন এরা বললে, 'বাড়ীটা তিন দিনও থাক্, আমরা ভিক্ষা করে খাওয়াব মাকে—সদ্য সদ্য মায়ের মনে কষ্ট।' রামদত্ত-টত্ত এরা বললে, 'তোদের আর ভিক্ষে করে খাওয়াতে হবে না।' বাড়ী চুকিয়ে দিলে।

"এই যে গিরিশ বাবু, এখন সব বড় ভক্ত হয়েছে! বলরাম বাবু! তবে গৃহীদের মধ্যে বলরাম বাবু সব চেয়ে বড়। সব ভক্ত হিসাবে ভক্ত। কে এলেন? না ভক্ত এলেন! এলে, গেলে, প্রণাম করলে!*

"শরৎ যে কদিন আছে, সে কদিন আমার ওখানে থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন

নাই, ঘর শূন্য। মা ভয়বিহ্বল হইয়া চারিদিক খুঁজিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না এবং নিজ স্থানে ফিরিয়া গিয়া উৎকট চিন্তায় অভিভূত হইলেন—এ কি ঘটনা হইল! কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, ঠাকুর পূর্ব্বের ন্যায় তীরবেগে আপন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। মা পরে তাঁহার নিকট গিয়া ঐ সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, "তুমি দেখেছ নাকি?" তারপর বলিলেন, "ছেলেরা সব এখানে এসেছে; সকলেই ছেলেমানুষ। তারা আনন্দ করে এই বাগানের এক পাশে একটা খেজুর গাছ আছে, তারই রস খেতে যাচ্ছিল। আমি দেখলাম, ঐ গাছতলায় একটা কালসাপ রয়েছে। সে এত রাগী যে সকলকেই কামড়াত। ছেলেরা তা জানত না। তাই আমি অন্য পথে সেখানে গিয়ে সাপটাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম। বলে এলাম, 'আর কখনও ঢুকিস্ নে।'" মা ইহা শুনিয়া অবাক হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে উহা তখন প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

* প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মা বর্দ্ধমানের রাস্তায় কামারপুকুর যান। টাকার অভাবে বর্দ্ধমান হইতে উচালন পর্য্যন্ত তাঁহাকে হাঁটিয়া যাইতে হয়। উহাতে

কে আছে দেখি না। যোগীন ছিল। কৃষ্ণলালও আছে, ধীর, স্থির—যোগীনের চেলা। ··· শরৎটি সর্ব্বপ্রকারে পারে। শরৎ হচ্ছে আমার ভারী। রাখাল, শরৎ-টরৎ, এরা সব আপনার শরীর থেকে বেরিয়েছে।"

আমি—মহারাজ পারেন না?

মা— না; রাখালের সে ভাব নয়। ঝঞ্ঝাট পারে না। মনে মনে পারে, কি কারুকে দিয়ে করাতে পারে। রাখালের ভাবই আলাদা।

আমি—বাবুরাম মহারাজ?

মা—না, সেও পারে না।

আমি—মঠ চালাচ্ছেন যে।

মা—তা হোক। মেয়েমানুষের ঝঞ্ঝাট! দূর থেকে খবর নিতে পারে।

"এই রাধুর বিয়ের কথা—এটি মায়ের বোঝা। ··· আপনার মায়ের বোঝা কে মনে করছে? আপনার জন কয়টি আর? দু-চারটি। ঠাকুর বলেছিলেন, 'কটিই বা অন্তরঙ্গ।'

আমি—কোন্ কোন্ ভক্ত কে, বল না; কিছুই চিনতে পারলুম না।

মা খুব ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সঙ্গে গোলাপ-মা, যোগানন্দ স্বামী প্রভৃতি ছিলেন। উচালনে গোলাপ-মা কোনপ্রকারে দুটি খিচুড়ি সিদ্ধ করেন। মা ক্ষুধায় তাহাই খাইয়া বার বার বলিয়াছিলেন, "ও গোলাপ, তুমি কি অমৃতই রেঁধেছ!"

মা—কি জানি। তবে যারা সব (পূর্ব্বে) এসেছিল তারাই এসেছে।

একটি ভক্তের কথায় বলিলেন, "হাঁ, তাই হবে। ওর ভিতরের স্বভাবটি আনন্দময়। বাহিরে এ রকম।"

আমি—চতুর্ভুজ প্রভৃতি দর্শনের সাধ আমার হয় না, আমার যা আছে তাই।

মা—আমারও তাই। ওসব দেখে কি হবে? আমাদের এই ঠাকুর আছেন—উনিই সব।

২রা মাঘ, বুধবার, মা কাশী হইতে কলিকাতা রওয়ানা হন।

১১-২-১৯১৩, উদ্বোধন

আমি—মা, এই যে স্বামিজী কত লোককে মন্ত্র দিয়েছেন, তুমিও কত লোককে দিচ্ছ, এ যেন কেউ এলে দুটো টাকা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হল, আর মনে রইল না।

মা—এত লোক আসছে, কটিকে মনে রাখা যায়? আগুন জ্বাললে বাদুলে পোকা আসে না? সেই রকম।

আমি—এই যে মন্ত্র নেয়, কি পায়? এমনি,ত বাহ্য দৃষ্টিতে দেখি, লোকটি যেমন ছিল তেমনি আছে।

মা—মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শক্তি যায়। গুরুর শক্তি শিষ্যে

যায়, শিষ্যের গুরুতে আসে। তাই ত মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। গুরু হওয়া বড় কঠিন—শিষ্যের পাপ নিতে হয়। শিষ্য পাপ করলে গুরুরও লাগে। ভাল শিষ্য হলে গুরুরও উপকার হয়। কারও বা হঠাৎ উন্নতি হয়, কারও বা ক্রমে হয়। তা যার যেমন সংস্কার।

"রাখাল তাই মন্ত্র দিতে চায় না। বলে, 'মা, মন্ত্র দিলে অমনি শরীর অসুস্থ হয়।' মন্তরের নামে আমার গায়ে জ্বর আসে।"

জনৈক মহারাজ একটি ছেলেকে মন্ত্র লইবার জন্য মার কাছে পাঠাইয়াছেন। মা তাহার সমস্ত পরিচয় শুনিয়া বলিলেন, "তোমাদের সব গোঁসাই গোবিন্দ আছেন। তাঁদের কাছ থেকে মন্ত্র নেবে।" যে কোন কারণে হউক, মা তাহাকে দীক্ষা দিলেন না।

প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, "কুলধর্ম্মানুযায়ী চলা উচিত। জাতিবিচার সংসারে থাকলে মেনে চলতে হয়।"

রাত্রে খাইবার পর পান আনিতে গিয়াছি। মা পাশের ঘরে ছেলেমেয়েদের মশারি খাটাইয়া দিতেছিলেন। শুনিলাম মা পাগলী মামীকে বলিতেছেন, "তুই আমাকে সামান্য লোক মনে করিস নি। ··· তুই যে আমাকে এত বাপান্ত মা-অন্ত করে গাল দিচ্ছিস, আমি তোর অপরাধ নিই না। ভাবি, দুটো শব্দ বই ত নয়। আমি যদি তোর

অপরাধ নিই তা হলে কি তোর রক্ষা আছে? আমি যে কদিন বেঁচে আছি, তোরই ভাল। তোর মেয়ে তোরই হবে। যে কদিন না মানুষ হয়, সে কদিনই আমি। নতুবা আমার কি মায়া? এক্ষুণি কেটে দিতে পারি। কর্পূরের মত কবে একদিন উড়ে যাব, টেরও পাবি নি।

পাগলী—আমি তোমাকে বাপান্ত করে কবে গাল দিয়েছি? আমি ব্যপান্ত করি নি—অমনি বলেছি। তুমি যাকে দাও, সব যে দিয়ে ফেল!

তাঁহার মনের ভাব, মা যেন টাকা-পয়সা সব রাধুর জন্য রাখিয়া দেন।

মা—আমার বালকস্বভাব। আমার কি অত আগ-পাছ হিসাব থাকে? যে চাইলে দিলুম।

কাশী হইতে ফিরিয়া মা অল্প কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া জয়রামবাটী রওয়ানা হইলেন। ১৩ই ফাল্গুন কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিলেন। ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে মাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। একটি বটফলের বীজ বাহির করিয়া মাকে বলিতেছিলাম, "মা, দেখছ, লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট। এ থেকে অত প্রকাণ্ড গাছ! কি আশ্চর্য্য!" মা বলিলেন, "তা হবে না? এই দেখ না, ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম, এসব কত কি হয়!"

জয়রামবাটীতে আসিয়া রাত্রে আমরা খাইতে বসিয়াছি। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "মা, দেখলেন, এঁদের (মামাদের) কি আক্কেল? আপনি এলেন, তা একটি লোকও নদীর ধারে পাঠালে না।" এই কথার উল্লেখ করিয়া মা বড় মামাকে বলিলেন, "এই যে আমি এলুম, তুই নদীর ধারে লোক পাঠালি না কেন? আমার এই ছেলেগুলি এল। তুই একটি লোকও পাঠালি নে, নিজেও গেলি নে।"

প্রসন্ন মামা—দিদি, আমি কালীর ভয়ে পাঠাই নি। পাছে কালী বলে, 'দিদিকে হাত করে নিতে যাচ্ছে।' আমি কি বুঝি না, তুমি কি বস্তু, আর এঁরা (ভক্তেরা) কি বস্তু? সব জানি, কিন্তু কিছু করবার সাধ্য নেই। ভগবান এবার আমাকে সে ক্ষমতা দেন নি। এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাকে এবার যে ভাবে পেয়েছি, এই ভাবেই জন্মে জন্মে পাই, অন্য আর কিছু চাই নে।

মা—তোদের ঘরে আর? এই যা হয়ে গেল। রাম বলেছিল, 'মরে যেন আর না জন্মাই কৌশল্যার উদরে।' আরও তোদের মধ্যে? বাবা পরম রামভক্ত ছিলেন, পরোপকারী; মায়ের কত দয়া ছিল; তাই এ ঘরে জন্মেছি।

একদিন প্রসন্ন মামা আসিয়া মাকে বলিলেন, "দিদি,

শুনলুম, তুমি নাকি কাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছ, তাকে মন্ত্র দিয়েছ, আবার এও বলে দিয়েছ যে তার মুক্তি হবে। আর আমাদের তুমি কোলে করে মানুষ করেছ—আমরা কি চিরদিনই এমনি থাকব ?" মা উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর যা করবেন তাই হবে। আর দেখ, শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালকদের সঙ্গে কত খেলেছেন, হেসেছেন, বেড়িয়েছেন, তাদের এঁটো খেয়েছেন, কিন্তু তারা কি জানতে পেরেছিল কৃষ্ণ কে ?"

একদিন আমরা কয়েকটি ভক্ত আহারান্তে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে যাইতেছি ; মা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না, ওসব রেখে দাও—তোমরা দেবের দুর্লভ জিনিস।" ভক্তেরা আপত্তি করায় বলিলেন, "ও ফেলবার লোক আছে, ঝি আছে।"

১৪-৩-১৩ (ফাল্গুন-সংক্রান্তি, ১৩১৯), জয়রামবাটী

শ্যামবাজারের ললিত ডাক্তার ও প্রবোধ বাবু আসিয়াছেন। বৈকালে প্রায় চারটার সময় তাঁহারা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন।

ললিত বাবু—মা, খাওয়া-দাওয়ার কি রকম নিয়ম পালন করা উচিত ?

মা—আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন খেতে নেই, ভক্তির বড় হানি

হয়। বরং অন্য শ্রাদ্ধের অন্ন খাবে, তবু আদ্যশ্রাদ্ধের নয়, ঠাকুর নিষেধ করতেন। আর যা কিছু খাবে, ভগবানকে দিয়ে খাবে, অ-প্রসাদী অন্ন খেতে নেই। যেমন অন্ন খাবে তেমন রক্ত হবে। শুদ্ধ অন্ন খেলে শুদ্ধ রক্ত হয়, শুদ্ধ মন হয়, বল হয়। শুদ্ধ মনে শুদ্ধা ভক্তি হয়, প্রেম হয়।

ললিত বাবু—মা, আমরা ত গৃহী, আত্মীয়-স্বজনের শ্রাদ্ধে কি করব?

মা—শ্রাদ্ধে গিয়ে কাজকর্ম্ম দেখবে, খাটবে, যেন তারা কিছু মনে না করতে পারে। কিন্তু সে দিনটা কোন রকম করে খাওয়াটা এড়াতে চেষ্টা করবে। নেহাৎ না পারলে শ্রাদ্ধে বিষ্ণু বা দেবতাদিগকে যা নিবেদন হয়, তাই গ্রহণ করবে। প্রসাদী হলে আদ্যশ্রাদ্ধের অন্নও ভক্তেরা খেতে পারে।

ললিত বাবু—অনেক সময় শ্রাদ্ধের জন্য আনা জিনিস-পত্র বাড়তি থাকে, তা খাওয়া চলে?

মা—তা চলতে পারে, তাতে দোষ নেই, বাবা। গৃহী আর কি করবে?

প্রবোধ বাবু—মা, তিনি যে ত্যাগ ভালবাসতেন। আমাদের ত্যাগ কোথায়?

মা—হবে ক্রমে ক্রমে। এজন্মে খানিকটা হল, পরজন্মে আবার হবে। খোলটাই ত বদলায়, আত্মা ত একই থাকে।

"কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ। তিনি বলতেন, 'আমি ইচ্ছা

করলে কামারপুকুরটাকে সোনার করে দিতে পারি, সেজ বাবুকে বলে। কিন্তু ওতে কি হবে? ওগুলো ত অনিত্য।' কারও কারও তিনি বলতেন শেষ জন্ম। বলতেন, 'আরে, এর কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নাই রে! এর শেষ জন্ম।' ”

তাঁহারা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

সন্ধ্যার সময় মায়ের বারান্দায় বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল। কায়স্থের উপবীতের কথা উঠিল।

আমি—কেউ কেউ স্বামিজীকে বলেছিল, 'শূদ্রের সন্ন্যাসে অধিকার কি?' তুমি যখন কাশী গিয়েছিলে তখন কাশীর 'ত্রিশূল' পত্র মহারাজকে গাল দিয়েছিল। স্বামিজী কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন, 'কায়স্থ ক্ষত্রিয়, সুতরাং সন্ন্যাসে অধিকার আছে।'

মা—(অন্য কথার পর) আর কিছু বুঝি না, সপ্তর্ষির মধ্য থেকে একটি ঋষি এসেছিলেন—এইটি জানি। আর ঠাকুরের ভক্তেরা জ্ঞানী সন্ন্যাসী। জ্ঞানীর সন্ন্যাস হতে পারে। এই যে গৌরদাসী; মেয়েদের ত সন্ন্যাস নেই। গৌরদাসী কি মেয়ে? ও ত পুরুষ। ওর মত কটা পুরুষ আছে? এই স্কুল, গাড়ী, ঘোড়া সব করে ফেললে। ঠাকুর বলতেন, 'মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়, সে কখনও মেয়ে নয়' —সে ত পুরুষ। গৌরদাসীকে বলতেন, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।'

১৫ই চৈত্র, ১৩১৯, জয়রামবাটী

সকালে বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি মা কলমী শাক কুটিতেছেন। আমি বলিলাম, "কলমী শাকের সঙ্গে এ কি কুটছ? এ যে ঘাস!" মা বলিলেন, "এ ঘাসফুলের শাক (ও দেশে খায় বোধ হয়), কৃষ্ণের গায়ের এই ঘাসফুলের রং ছিল।"

মধ্যাহ্নে খাইতে বসিয়াছি। পাগলী মামী তাঁহার ঘরের বারান্দায় একটি ছেলেকে (বোধ হয় আত্মীয়) পাতা ও জলের গ্লাস দিয়াছেন। বিড়ালে সে জলে মুখ দেওয়ায় পুনরায় জল আনিয়া দিয়েছেন। আবার মুখ দেওয়ায় সে জলও বদলাইয়া দিলেন। এবারেও একটা বিড়াল সে জল খাইতেছে। পাগলী বিড়ালটাকে তাড়া করিয়া বলিতেছেন, "পোড়ারমুখো বেরাল, মেরে ফেলব।" তখন চৈত্র মাস। মা কাছেই ছিলেন, বলিলেন, "না, না, পিপাসার সময় বাধা দিতে নেই। আর ও জলে ত মুখ দিয়ে ফেলেছে।"

পাগলী মামী চিৎকার করিয়া বলিতেছেন, "তোমায় আর বেরালকে অত দয়া দেখাতে হবে না। মানুষকেই বড় দয়া করছেন! মানুষকে দয়া কর না।"

মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমার দয়া যার উপর

নেই সে নেহাৎ হতভাগ্য। আমার দয়া যে কার উপর নেই তা বুঝি না—প্রাণীটা পর্যন্ত।”

রাত্রে খাইতে বসিয়াছি। মা নিজে ঝিঙ্গে, আলু প্রভৃতি দিয়া একটি ব্যঞ্জন রাঁধিয়াছিলেন। তাই আনিয়া দিয়া বলিলেন, “খেয়ে দেখ কেমন হয়েছে।” আমি একটু খাইয়া বলিলাম, “এ যেন রোগীর পথ্য, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। কে রেঁধেছে?”

মা—আমি।

আমি—তুমি নিজে?

মা—হাঁ।

আমি—কই, তেমন হয় নি। আমাদের দেশের পছন্দ মত হয় নি।

মা—তুমি শুধু ঝোল মুখে দিয়ে দেখ।

নলিনী—ও পিসীমা, তুমি যে রান্নায় মোটেই ঝাল দাও না; ও কি খাওয়া যায়?

মা (নলিনীকে)—তুই ওর কথা শুনিস নি। খেয়ে দেখবি ভাল হয়েছে।

আমি—আমি কদিন তোমার রান্না কোন্‌টা, এদের জিজ্ঞাসা করে একটু একটু চেখে দেখেছি। সব ঐ রকম।

মা—বেশ ত, একদিন তোমাদের দেশের মত রাঁধব, দেখিয়ে দেবে। লঙ্কা বেশী দিতে হয়, না?

আমি—তত বেশী নয়। আর ঝাল কম হলেও রান্না কি খারাপ হয়?

মা—(নলিনীকে) কাল ছোলার ডাল আনিস, রাঁধব। আমি আগে বেশ রাঁধতে পারতুম। এখন অভ্যাস নেই ত। কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাঁধতুম। একদিন খেতে বসেছেন—ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা ভাল রাঁধতে পারত। সে যেটা রেঁধেছে, খেয়ে বললেন, 'ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে, এ রামদাস বদ্যি।' আমি যেটা রেঁধেছি, খেয়ে বললেন, 'আর এই ছিনাথ সেন।' শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে। লক্ষ্মীর মা হল রামদাস বদ্যি, আর আমি হলুম ছিনাথ সেন—হাতুড়ে। শুনে হৃদয় বলছে, 'তা বটে, তবে তোমার এ হাতুড়ে বদ্যি তুমি সব সময় পাবে—গা টিপিতে, পা টিপিতে পর্য্যন্ত। ডাকলেই হল। রামদাস বদ্যি—তার অনেক টাকা ভিজিট, তাকে ত আর সব সময় পাবে না। আর লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে—সে তোমার সব সময় বান্ধব।' ঠাকুর বললেন, 'তা বটে, তা বটে। এ সব সময় আছে।'

"নরেনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বললেন, 'বেশ করে রাঁধো।' আমি মুগের ডাল, রুটী করলুম। খাবার পর নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরে, কেমন খেলি?' নরেন বললে, 'বেশ খেলুম, যেন রোগীর পথ্য।' ঠাকুর

শুনে বললেন, 'ওকে ওসব কি রেঁধে দিয়েছ? ওর জন্য ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি করে দেবে।' আমি শেষে তাই করলুম। তবে নরেন খেয়ে তুষ্ট হল।"

২৫শে বৈশাখ, ১৩২০, জয়রামবাটী

রাধুর কি অসুখ করায় পাগলী মামী তাকে তিরস্কার করিতেছেন। "তুমিই ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেললে" ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ করিয়া শেষে যা-তা বলিতে লাগিলেন। বরদা মামাকে ডাকায় তিনি পাগলীকে তাড়া করিলেন। মাও অত্যন্ত অসহ্য হওয়ায় ধমকাইয়া বলিলেন, "তোকে আজই মেরে ফেলব। আমি যদি তোকে মারি, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে তোকে রক্ষা করতে পারে। আর এতে আমার পাপও নেই, পুণ্যও নেই।"

কিছুক্ষণ পরে আমাদিগকে বলিতেছেন, "আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম যে তিনি কখনও আমাকে 'তুই' পর্য্যন্ত বলেন নি। দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুরের ঘরে খাবার দিতে গেছি।* রেখে চলে আসছি; তিনি লক্ষ্মী খাবার দিয়ে গেল মনে করে বলছেন, 'দরজাটা

---

* সরুচাকলী ও সুজির পায়েস প্রস্তুত করিয়া, অন্য কেহ ঠাকুরের ওখানে নাই জানিয়া, সন্ধ্যার পর নিজেই লইয়া গিয়াছিলেন।

ভেজিয়ে দিয়ে যাস্।' আমি বললুম, 'হাঁ, দরজা ভেজিয়ে রাখলুম।' তিনি আমার গলার স্বর টের পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, 'আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী—কিছু মনে করো না।' 'দিয়ে যাস্' বলেছিলেন, তার জন্যই এত সঙ্কোচ। পরদিন পর্য্যন্ত নবতের সামনে গিয়ে বলছেন, 'দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয় নি, ভেবে ভেবে—কেন এমন রূঢ় বাক্য বলে ফেললুম।' আর এটা (রাধুর মা) কি না আমাকে দিনরাত গাল দিচ্ছে! কি পাপে যে আমার এমন হচ্ছে জানি না। হয়ত শিবের মাথায় কাঁটাসুদ্ধ বেলপাতা দিয়েছি। সেই কণ্টকে আমার এই কণ্টক।"

২৯শে বৈশাখ, ১৩২০, জয়রামবাটী

রাধুর সেই জ্বর ও বেদনা। মা বলিতেছেন—"এই রাধীর উপর আমার আর একটুও মন নেই। রোগ ঘেঁটে ঘেঁটে বিতৃষ্ণা হয়েছে। জোর করে মন টেনে রাখি। বলি, 'ঠাকুর, রাধীর উপর একটু মন দাও, নইলে ওকে কে দেখবে? এমন রোগও আর দেখি নি। জন্মান্তরীণ রোগ নিয়ে মরেছিল, প্রায়শ্চিত্ত করে নি। আমার এই দুইটি করাবার ইচ্ছা আছে: একটি চণ্ড দেখান—কেন এমন হচ্ছে, আর এই চান্দ্রায়ণ করা।

“ঠাকুরের যখন মহাভাব হত বুকের ভিতর যেন সাতটা আগুনের তাওয়া জ্বলছে। বইয়েতে সব পড়েছ ত? তখন আমার ভাসুর তাঁকে দেশে নিয়ে এলেন। পাণ্ডবা থেকে একজন চণ্ড আনালেন। দেবতার ভর হতে সেই চণ্ড বললে, তার ছেলেবেলার নাম করে, ‘ও অমুক (গদাই), তোমার এ মহাভাব ঈশ্বরের মহাকৃপায় হয়। এ রোগ নয়। তুমি অত সুপারি খেও না।’ সুপারি বেশী খেলে পুরুষের ইন্দ্রিয়দোষ হয়।

“মানুষ যে রোগ নিয়ে মরে, যদি প্রাশ্চিত্ত না করে মরে, তবে পরজন্মেও সেই রোগ হয়। সাধুদের পক্ষে এসব কিছু নয়।”

কেদারের মা—তারা ভগবানের নাম করে মরে, ভগবানকে পায়।

মা—হাঁ, তাই ত। এই যে ছেলেটি* কোয়ালপাড়ায় মারা গেল, এর কি আর পুনর্জ্জন্ম হবে? এর আর জন্ম হবে না।

---

* দ্বারিকা মজুমদার। ছেলেটি বি-এ পরীক্ষা দিয়াই জয়রামবাটী গিয়াছিল। গরীব বাপ-মা তাহাকে কষ্ট করিয়া পড়াইয়াছেন এবং একমাত্র পুত্র বলিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। ছেলেটি পিতামাতার অনুরোধে উহাতে সম্মত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমাকে সমস্ত ঘটনা বলায় তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “ভয় কি, ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্ত সব ছিল, বলরাম বাবু এঁরা ছিলেন” এবং তাহাকে অভয় দেন। ফিরিবার পথে ছেলেটি কোয়ালপাড়া আসিয়া হঠাৎ ভীষণ আমাশয়ে আক্রান্ত হয় এবং ছয়-সাত দিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করে। অন্তিম সময়ে সজ্ঞানে

"কাশীপুরে তাঁর অসুখের সময় তিনি বললেন, 'এই অসুখ, খাজাঞ্চী-টাজাঞ্চী লোকে কেউ কিছু বলবে— প্রায়শ্চিত্ত করলে না। ও রামলাল, তুই দশটা টাকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যা, মা কালীকে নিবেদন করে বামুন-টামুনদের বিলিয়ে দে।'

"সাধুর ত কর্ম্ম নেই, তাই টাকা ইষ্টকে নিবেদন করে দিয়ে বিতরণ করতে বললেন। মুনি-ঋষিরা বনে থাকতেন। তারা কি চান্দ্রায়ণ করতে পারতেন? তারা ফলমূল নিজ ইষ্টকে নিবেদন করে সব্বাইকে বিতরণ করতেন। তাঁদের ওতেই হয়।"

পাগলী মামী—এই আমার মাসী রোগ নিয়ে মরেছে। তা হলে তারও কি সে রোগ হয়েছে?

মা—তোর মাসী মরে জন্ম নেয় নি? সে মরে জন্মও নিয়েছে, সেই রোগও তার সঙ্গে এসেছে।

"অনেক সময় কর্ম্মের ফলে বংশের লোক সেই বংশেই পুনঃপুনঃ জন্মায়, আর মরে। গয়ায় পিণ্ড দিলে তবে উদ্ধার হয়ে যায়।"

রাত্রে আহারের পর মার ঘরে পান আনিতে

ঠাকুরের নাম করিতে থাকে এবং 'রামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি বোল' বলিয়া তাহার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হয়। মায়ের কাছে সংবাদ যাইলে তিনি খুব দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখানে এসে এমন কারু হয় নি।" (অর্থাৎ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া কেহ মারা যায় নাই)।

গিয়াছি। রাঁচিতে একটি ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন, সেই কথা মাকে বলিলাম—"একটি লোক সাধুদর্শন করবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কখনও কখনও যেতেন। তিনি পাতলা ও বেঁটে ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে 'ঝুনো সরষে' বলে ডাকতেন। ঠাকুরের দেহ যাবার অনেক বছর পরে যখন তিনি শিলংএ চাকরী করেন, সেই সময় ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত হন। তাঁদের আপিস শিলং থেকে ঢাকায় আসে এবং পরে রাঁচি যায়। রাঁচিতে রাত্রে তিনি শুয়ে আছেন, হঠাৎ কার ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যেতে শোনেন যে, কে ডাকছে—'ও ঝুনো সরষে!' অবাক হয়ে ভাবছেন, আমার এ নাম ত কেউ জানে না—ঠাকুর ডাকতেন। দরজা খুলে দেখলেন ঠাকুর রাস্তায় দাঁড়িয়ে—গেরুয়া পরা, খড়ম পায়ে, চিমটে হাতে! জ্যোৎস্না রাত। বলছেন, 'এখানকার কিছু কথা হত। তা ঢাকায় নয় দরকার না ছিল, এখানে ওটি বন্ধ কেন করলে? উটি করো না'—বলে অন্তর্দ্ধান হলেন।"

শিলংএ ইঁহাদের একটি সমিতির মত ছিল। তাহাতে 'কথামৃত' প্রভৃতি পাঠ হইত। ঢাকায় পূর্ব্ব হইতেই একটি সমিতি থাকায় শিলং হইতে আসিয়া ভক্তেরা উহাতেই যোগ দেন। নিজেদের সমিতিটির আর পৃথক্ অস্তিত্ব রহিল না। কিন্তু ইঁহারা যখন রাঁচিতে আসিলেন,

তখন আর নূতন করিয়া শিলং-এর মত 'কথামৃত' পাঠ আরম্ভ না হওয়ায় তাহা বন্ধই হইয়া গিয়াছিল।

মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, খড়ম পায়ে, চিমটে হাতে কেন দেখলে ?"

মা—সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউলবেশে আসবেন বলেছেন। বাউলবেশ—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুটি, এতখানা দাড়ি। বললেন, 'বর্দ্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব, পথে কাদের ছেলে বাহ্যে করবে, ভাঙ্গা পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে।' যাচ্ছেন ত যাচ্ছেন, খাচ্ছেন ত খাচ্ছেন—কোন দিক-বিদিক খেয়ালই নেই।

আমি—বর্দ্ধমানের রাস্তা কেন ?

মা—এইদিকে দেশ (জন্মস্থান)।

আমি—তবে কি বাঙ্গালী ?

মা—হাঁ, বাঙ্গালী। আমি শুনে বললুম, 'ও কিগো, তোমার একি সাধ ?' তিনি হেসে বললেন, 'হাঁ, তোমার হাতে হুকো-কলকে থাকবে।'

ইহা বলিয়া মা বৃন্দাবনের সেই হুকো-কলকে-ধরার ঘটনাটি বলিলেন (পৃঃ ৮৮)।

আমি বলিলাম, "আমাদের দেশে কেউ এল না। তুমি আমাদের দেশে যাবে (জন্ম নেবে)।"

এইবার যাইতে বলিতেছি ভাবিয়া মা বলিতেছেন,

"তোমাদের দেশে কি করে যেতে হয়? রেল, জাহাজ, ষ্টীমার? তোমাদের ও দেশে একবার গেলে হয়। তাঁর যদি ইচ্ছে হয় ত হবে। ওদিকে যাওয়া হয় নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমার যে-সব স্থানে যাওয়া হয় নি, তুমি সে-সব জায়গায় যাবে।' তাই তাঁর আশীর্ব্বাদে রামেশ্বর এসব যাওয়া হল।"

আমি—মা, শাস্ত্রে ত দশ অবতারের কথা আছে। চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, এসব অবতারের ত কথা নেই।

মা—তাঁর কি জান, সব খেলা, খেয়াল!

আমি—কোন্ গ্রামে জন্ম নেবেন?

মা "কি জানি, জানি নে" বলিয়া এ প্রসঙ্গ চাপা দিলেন।

১৩২০ সাল, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, জয়রামবাটী,
মায়ের পুরাতন বাড়ী

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক ও ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ আসিয়াছেন। আজ অপরাহ্নে তাঁহারা রওয়ানা হইবেন। পূর্ব্বাহ্নে স্নানান্তে তাঁহারা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গেলেন। মা তাঁহাদিগকে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বসিতে বলিলেন। দুই-এক কথার পর সুরেন বাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ঠাকুরকে পূজা করতে গিয়ে একটা খটকা বাধে। যেমন, এক জনের হয়ত

ইষ্টদেবী ও ঠাকুরকে এক বলে সাধারণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু ঠাকুরের মূর্ত্তিতে ইষ্টদেবীর পূজা করে জপ-বিসর্জ্জনের সময় "ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি" বলতে তার কেমন একটু খটকা বাধে।

মা—(সহাস্যে) তা বাবা, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই মহেশ্বরী। তিনিই সর্ব্বদেবময়, তিনিই সর্ব্ববীজময়। তাঁতে সব দেবদেবীর পূজা হয়। ও মহেশ্বর বললেও হবে, মহেশ্বরী বললেও হবে।

সুরেন বাবু—মা, ধ্যান-ট্যান ত কিছুই হয় না।

মা—তা নাইবা হল। ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে। ঠাকুরের তখন অসুখ, কাশীপুরে। ছেলেরা পালা করে থাকত। তখন গোপাল রয়েছে। ঠাকুরকে ফেলে সে গিয়ে ধ্যান করতে বসেছে। অনেক ক্ষণ ধ্যান করছে। গিরিশ বাবু এসে শুনে বললেন, 'চোখ বুঁজে যাঁর ধ্যান করছে তিনি এখানে রোগশয্যায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছেন, আর ও কি না ধ্যান করতে গেল!' গোপালকে ডেকে পাঠালেন। ঠাকুর তাকে পা টিপে দিতে বললেন। বললেন, 'পায়ে ব্যথা হয়েছে বলে পা টিপতে বলছি কি? তা নয়, তোর অনেক করা ছিল (জন্মান্তরে), তাই।'

"ওঁকে দেখবে, তাহলেই হবে।"

সুরেন বাবু—মা, যথানিয়মে তিন বেলা জপ করাও সব সময় হয়ে ওঠে না।

মা—তা নাই বা হল, স্মরণ-মনন রাখবে। যখন পার জপ করবে। অন্ততঃ প্রণামটা ত করতে পারবে?

দুর্গা বাবু—মা, আহারাদির সম্বন্ধে কি রকম নিয়ম পালন করে চলতে হবে বুঝতে পারি নে।

মা—আহারাদি সম্বন্ধে ঠাকুর একটা নিয়ম বেশী মানতেন, প্রথম শ্রাদ্ধের অন্নটা খেতে সব ভক্তদের নিষেধ করতেন। বলতেন, 'ওতে ভক্তির হানি হয়।' তা ছাড়া তাঁকে মনে করে খাবে দাবে।

দুর্গা বাবু—মা, হাসপাতালে কাজকর্ম্ম করতে অনেক সময় হয়ত পিপাসায় সেইখানেই যার-তার জল খেতে হয়, খেয়েও থাকি। তার কি হবে, মা?

মা—তা কি করবে? কাজের জন্য করতে হয়। ঠাকুরকে স্মরণ করে খাবে। কাজের জন্য, ওতে দোষ হবে না। যাদের কাজকর্ম্ম করতে হয় তাদের অত মেনে চলা হয় কি?*

---

* মা যে সব সময় সকলের ছোঁয়া জিনিস খাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা মনে হয় না। জয়রামবাটীতে একদিন এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বলতেন, ওরে আমি ত এখুনি মুচি মেথর সব্বায়ের খেয়ে আসতে পারি। তা হলে তোরা যে এখুনি সব একাকার করে দিবি।" মার শেষ অসুখের সময় যখন তাঁহাকে পাঁউরুটি দিবার ব্যবস্থা হয়, মা আমাকে বলিলেন, "বাবা, আমার এই শেষকালটায় আর আমাকে মুসলমানের ছোঁয়াটোয়া খাইও না।" যদিও তাঁহাকে এই সময় পাঁউরুটি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণের তৈয়ারি। পরে কলের তৈয়ারি বলিয়া বুঝাইয়া milk-roll পাঁউরুটি দেওয়া

সুরেন বাবু—এই ত, মা, সংসারে দশজন নিয়ে বাস। রান্না হতে হয়ত দুজন অগ্রভাগ খেয়ে গেছে। তারপর সেই অন্ন এল! তা নিবেদন করতেও দ্বিধা লাগে।

মা—তা সংসারে ওরকম হবেই। আমাদেরও হয়।* ধরনা, একজন হয়ত রোগা, তার জন্য আগে একটু উঠিয়ে রাখতে হল। তা খাবার এলে, তিনিই খেতে দিলেন মনে করে তাঁকে স্মরণ করে খাবে। দোষ হবে না।

সুরেন বাবু—মা, মনের যা অবস্থা ত আর কি বলব। আপনি অন্তর্য্যামিনী, বুঝতেই পারছেন। আর যে ভোগ ক'বছর ভুগছি। আপনার আশীর্ব্বাদ না থাকলে হয়ত এতদিনে মরে যেতুম।

হইয়াছিল। কিন্তু অন্য সময়ে কখনও কখনও ব্রাহ্মণেতর ত্যাগী ভক্তের রান্না খাইয়াছেন, ইহাও দেখা গিয়াছে।

* কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি যে, জয়রামবাটীতে ভোগের পূর্ব্বে বাড়ীর ছেলেমেয়ে কেহ খাবার কথা বলায় ধমক দিয়া বলিলেন, "এখন কি খাওয়া? ঠাকুরদেবতার ভোগ হল না, কিছু না।" একবার কার্য্যোপলক্ষ্যে মামাকে সকাল সকাল রওয়ানা হইতে হইবে। মা তাঁহার জন্য পৃথক রাঁধিয়া দিলেন, তথাপি যে রান্না হইতে ঠাকুরের ভোগ হইবে তাহা দিলেন না। একদিন 'উদ্বোধনে' ঠাকুরের জন্য ফল ছাড়াইতেছেন, মাকুর শিশুপুত্র খাইতে চাওয়ায় তাহাকে যাহা দিবেন তাহা হাতে করিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়া (নিবেদন করিয়া) দিলেন। শেষ অসুখের পূর্ব্ববারের অসুখে একদিন অনেক বলিয়া কহিয়া মাকে ভোগের পূর্ব্বে খাওয়ান গেল। অবশ্য যাহা খাইলেন তাহা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া লইলেন। পরদিনও ভোগের পূর্ব্বে খাইতে দেওয়া হইল। কিন্তু যাই যাই বলিয়া কোন রকমে বিলম্ব করিয়া সকলের অনুরোধে যখন খাইতে বসিলেন, তখন ঠাকুরের ভোগ উঠিয়াছে। এদিকে ঠাকুরের ভোগও হইয়া গেল, মাও খাইতে আরম্ভ করিলেন। পরদিন ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেলে তবে খাইতে বসিলেন।

মা—হাঁ, বাবা, সংসারে যা কষ্ট তা আর বলতে! কষ্টের পার নেই। তোমাদের ত আছেই; আমাকেই, বাবা, যেভাবে ঠাকুর রেখেছেন! এই মেয়েটাকে (রাধুকে) নিয়ে কি কষ্টই পাচ্ছি!

সুরেন বাবু—হাঁ, মা, এখানকার এই ভাব দেখেই মনকে প্রবোধ দিই, আর ভরসা হয়। মা ত সংসারের যন্ত্রণা নিজে দেখছেন, কাজেই দয়া হবে।

মা—তা ভয় নেই, বাবা, ঠাকুর আছেন। তিনিই তোমাদের ইহকাল পরকাল সব রক্ষা করবেন।

সুরেন বাবু—মা, দূরে পড়ে থাকি; স্বপ্ন কি সত্য?

মা—হাঁ, সত্য বই কি! তাঁর স্বপ্ন সত্য। তাঁর স্বপ্ন আবার তিনি তাঁর কাছেই বলতে নিষেধ করতেন।

সুরেন বাবু—মা, ঠাকুর কেমন জানি নি, দেখি নি। আমাদের ঠাকুর বলুন, যা বলুন, সবই এখানে (আপনি)।

মা—ভয় নেই, ঠাকুর দেখবেন, বাবা। ইহকাল পরকাল সব দেখবেন, সব রক্ষা করবেন।

আহারাদির পর তাহারা রওয়ানা হইলেন। সঙ্গে বরদা মামা; তিনি কলিকাতা আসিবেন। তাহারা ক্রমে উত্তরদিকের মাঠে পড়িলেন। মা কিছুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া যতক্ষণ দেখা গেল চাহিয়া রহিলেন।

এই সুরেন বাবু যখন বল্লারতনগঞ্জ স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন, সেই সময় তিনি তথাকার কসাইগণ জীবন্ত গরুর চামড়া খসাইয়া লয় জানিয়া বড়ই ব্যথিত হন। দুর্বৃত্তেরা একদিন স্কুলের সামনেই ঐরূপ করিল। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকগণ এবং সুরেন বাবু ইহার খুব প্রতিবাদ করেন। কসাইগণ মারও খায়। ইহা লইয়া তথায় একটা গণ্ডগোল বাধে। কসাইগণ সুরেন বাবুর উপর অত্যাচার করিবে বলিয়া তাহাকে ভয় দেখায়। এই সময় স্কুলের দুই-তিনটি ছাত্র শ্রীশ্রীমার কৃপালাভের জন্য জয়রামবাটী যায়। সুরেন বাবু ঐসঙ্গে পত্র দেন ; তাহারাও সব ঘটনা শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করে। মা শুনিয়া শিহরিতে লাগিলেন, এবং সুরেন বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি এমন কাজের প্রতিবাদ না কর, তবে কে করবে?" মায়ের কথামত সুরেন বাবুকে খুব অভয় দিয়া পত্র লেখা হইল এবং যাহাতে এরূপ নৃশংস ব্যাপার আর না ঘটে তাহারই বিশেষ চেষ্টা করিতে বলা হইল। সুরেন বাবুর দ্বিতীয় পত্রের উত্তরে মা লিখিতে বলিলেন, "ভগবান্ যদি সত্য হন, তবে নিশ্চয়ই এর প্রতিবিধান হবে।" এই ঘটনা উপলক্ষ্যে মকদ্দমা হইয়াছিল। ইহার ফল আশানুরূপ না হইলেও ক্রমে প্রকাশ্যভাবে ঐ নৃশংস কর্ম্মের অনুষ্ঠান একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, জয়রামবাটী

মধ্যাহ্নে মায়ের ঘরের বারান্দায় আমি ও আর একজন খাইতে বসিয়াছি।

মা—রাধু বললে, এবার নাকি আশ্বিন মাসে খুব মারামারি হবে, পাঁজিতে লিখেছে।

আমি—মারামারি নয়, মহামারী।

কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন, "ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ বিশেষ লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এই নরেন সপ্ত ঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি। তিনি ত শত ঋষির মধ্যে বলতে পারতেন; তা না বলে সেই বড় সাতজনের মধ্যে একজন বললেন। অর্জ্জুন যোগীন হয়ে এলেন। তেমন প্রধান প্রধান কটি থাকে? অনেক থাকে কি? টোকা আম অনেক পাওয়া যায়, ফজলি আম কি বেশী পাওয়া যায়? সাধারণ লোক কত জন্মাচ্ছে, মরছে। এই সব সর্ব্বপ্রধান যাঁরা, তাঁরাই ভগবানের কার্য্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে আসেন।"

আমি—স্বামিজীও বলেছেন, ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ।

মা—তাই ত।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, জয়রামবাটী

দ্বিপ্রহরে মায়ের বারান্দায় খাইতে বসিয়াছি ; রাধুকেও মা একধারে বসিয়া খাওয়াইতেছেন। মা রাধুকে বলিতেছেন, "খা, খা, গাঁদাল-ঝোল, এ ঠাকুর খেতেন। তিনি ভালবাসতেন—গাঁদাল, ডুমুর, কাঁচকলা। পেটের অসুখ ছিল কিনা। এই দুধ খা।"

রাধু—না, আর খাব না।

মা—খা, একটু খা। (আমাদিগকে) ঠাকুরের অসুখের সময় কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে দেখালেন। কবিরাজ জল বন্ধ করে ওষুধ খাবার ব্যবস্থা করলেন। ঠাকুর এসে সব্বাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'হ্যাঁগা, জল না খেয়ে পারব ?' যাকে দেখেন তাকেই জিজ্ঞাসা করেন, পাঁচ বছরের ছেলেদের পর্য্যন্ত, 'হ্যাঁগা, জল না খেয়ে কি থাকা যায় ?' তারা বললে, 'হাঁ, পারবেন বই কি, মশায়।' আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'পারব ?' আমি বললুম, 'পারবে বই কি।' তিনি বললেন, 'বেদানা পর্য্যন্ত জল পুঁছে দিতে হবে, দেখ যদি তোমরা পার।' আমি বললুম, 'তা মা কালী যেমন করবেন, যথাসাধ্য তাঁর ইচ্ছায় হবে।' শেষে মন স্থির করে জল বন্ধ করে ওষুধ খেলেন। রোজ তিন-চার সের, শেষে পাঁচ-ছ সের

পর্য্যন্ত দুধ দিতুম। গাই দুইয়ে যে লোকটি দুধ দিত সে আমাকে বেশী বেশী দুধ দিয়ে যেত। বলত, 'ওখানে দিলে কালীর ভোগ বেটারা বাড়ী নিয়ে যাবে। কাকে না কাকে খাওয়াবে। আর এখানে দিলে উনি খাবেন।' তাই পাঁচ-ছয় সের পর্য্যন্ত দিয়ে যেত। বেশ ভাল ভক্তিমান লোকটি ছিল। আমি সন্দেশ, রসগোল্লা, এসব মিষ্টি-টিষ্টি যা থাকত—আর তখন অনেক আসত—সব দিতুম। দুধ জ্বাল দিয়ে দিয়ে কমিয়ে এক সের, দেড় সের করে দিতুম। জিজ্ঞাসা করতেন, 'কত দুধ?' বলতাম, 'কত আর—এক সের, পাঁচপো হবে।' তিনি বলতেন, 'না, এই যে পুরু সর দেখা যাচ্ছে।'

"একদিন গোলাপ ছিল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'হ্যাঁগা, কত দুধ হবে?' গোলাপ বলে দিয়েছে।

" 'এঁ্যা, এত দুধ! তাইত আমার পেটের অসুখ হয়। ডাক, ডাক।' আমি গেলুম। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দুধ?' আমি বললাম, 'পাঁচপো হবে আর কি।'

'তবে যে গোলাপ বলে এত?'

"গোলাপ জানে না; এখানের মাপ গোলাপ জানে? ঘটিতে কত দুধ ধরে গোলাপ জানবে কি করে?

"আর একদিন গোলাপকে জিজ্ঞাসা করেছেন। গোলাপ

বলে দিয়েছে, 'এখানের এক বাটী, আর কালীঘরের এক বাটি।' শুনে বললেন, 'এ্যাঁ, এত দুধ? ডাক, ডাক, জিজ্ঞাসা কর।' যেতেই বলছেন, 'বাটিতে কত ধরে? ক ছটাক, ক পো?' আমি বললুম, 'ক ছটাক, ক পো, অত জানি নে। দুধ খাবে, তা ক ছটাকের ঘটী, কত পো, অত কেন? অত হিসাব কে জানে?' তিনি বললেন, 'এত কি হজম হয়? তাইত, পেটের অসুখ হবে।' বাস্তবিকই সেদিন পেটের অসুখ করল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি রকম দাস্ত হচ্ছে?' বললেন, 'পালো পালো, সাদা সাদা, একটু একটু পনর বার বাহ্যে গেলুম। তোমাদের এমন সেবা চাই না।' সে দিন আর বিকালে কিছু খেলেন না। ভাত টাত পড়ে রইল। একটু সাগু করে দিলুম। গোলাপ বললে, 'মা, বলে দিতে হয়। আমি কি জানি? তাইত, খাওয়া নষ্ট হল।' আমি বললুম, 'খাওয়ার জন্য মিথ্যা বললে দোষ নেই, আমি এই রকম করে ভুলিয়ে টুলিয়ে খাওয়াই।' (আমাদিগকে) এই এতখানি শরীর হয়েছিল। বেশ সেরে গিয়েছিলেন।"

আমি—এ ত দেখছি মনেই সব।

মা—তাই ত, মনেই। নতুবা না বললে এমনি বেশ খেতেন।

রাত্রে আমি ও বিভূতি খাইতে বসিয়াছি। আমি

বিভূতিকে বলিলাম, "রাধুর জন্য একটি হিষ্টিরিয়া রোগের কবচ ভাল লোকের কাছ থেকে এনে দিলে হয়।"

মা—হাঁ, বেল্‌টের স্বরূপনারায়ণ ধর্ম্মের পণ্ডিতরা ঔষধ দেয়। রাধুর জন্য তাই দেব মনে করেছি। এখন কিছুদিন দৈবী টৈবী দেখাবার ইচ্ছা। আমার মা ঐ স্বরূপনারায়ণের ফুল পেয়ে ভাল হয়েছিলেন। সেই হতে আমার এটিতে বিশ্বাস।

বিভূতি—ওঃ, ধর্ম্মের পণ্ডিত (সেবাইত)? বৌদ্ধরা ঔষধপত্র দিত কিনা। ধর্ম্ম হচ্ছে বুদ্ধদেব।

মা—আমাদেরও আছে ধর্ম্মমাড়ো (মন্দির), ঐ যে ওখানে।

আমি—ধর্ম্ম ত সব জায়গায় জানি বুদ্ধমূর্ত্তি।

মা—এখানে কচ্ছপমূর্ত্তি, নারায়ণ বলে।

বিভূতি—আসনের মত না? নীচে চারটি খুরো দেওয়া?

মা—হাঁ, মাঝখানটি একটু উঁচু।

বিভূতি—ও কচ্ছপ নয়, বুদ্ধাসন। বুদ্ধাবস্থা অস্তি-নাস্তির পারে কিনা। তাঁর কোন মূর্ত্তি হতে পারে না। তাই তাঁর শুধু আসন করেছে।

মা—তা হতে পারে। আমাদের এই ধর্ম্মকে ছেলেরা পূজো করছে। যা দেয়; কোন বিধি-নিষেধ নেই। হয়ত

দুটো লাল ফুল, কি যা হল তাই দিলে ; কোন অপরাধ নেন না। যে যা দেয় তাতেই খুশী।

আমি—বেদনা প্রভৃতির লোকে দৈব ঔষুধ পায়, এর অদৃষ্টে তা আর হল না।

মা—না, কেউ ফিরে চাইলেন না। এই যে এত ডাকি, কিছুই না। আমার অসুখের সময়, তখন সব শরীর ফুলে গেছে, নাক কান দিয়ে রস ঝরছে। উমেশ (মায়ের ভাই) বললে, 'দিদি, এখানে সিংহবাহিনী আছেন, হত্যা দেবে ?' সে-ই আমাকে রাজী করে ধরে ধরে নিয়ে গেল। পূর্ণিমার রাত আমার কাছে অমাবস্যা—চক্ষে দেখতে পাই না, জল পড়ে পড়ে চক্ষু গেছে। গিয়ে মায়ের মাড়োতে পড়ে রইলুম। আবার আমাশা ; তিন-চার বার হাতড়ে হাতড়ে রাত্রেই শৌচে গেলুম। ভিক্ষে মা ছিল : ঐখানেই তার ঘর। সে মাঝে মাঝে গলা খ্যাঁকার দিত, আমি ভয় না পাই। পড়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরেই আমার মাকে এসে বলছেন, কামারদের একটি মেয়ের বেশে, রাধুর মত অত বড় (১২।১৩ বছরের) মেয়েটি, 'যাও যাও, উঠিয়ে আনগে। অমন অসুখ, তাকে ফেলে রাখতে আছে ? এক্ষুণি আনগে। এই ওষুধ দিও, এতেই ভাল হয়ে যাবে।' এদিকে আমাকে বললেন, 'লাউফুল নুন দিয়ে রগড়ে তার রস চোখে ফুট (ফোঁটা ফোঁটা করে) দিও, ভাল হয়ে যাবে।' তারপর

মা যে ওষুধ পেলেন তাই নিলুম। আর লাউফুলের ফুঠ চোখে দিলুম। দিতেই যেমন জাল টেনে আনে, অমনি চোখের সব ময়লা টেনে বের করে দিলে। সেই দিনই চোখ ভাল হয়ে গেল। আর শরীরের সব ফুলো-টুলো কমে গেল। বেশ ঝরঝরে হলুম। সেরে গেলুম। যে জিজ্ঞাসা করত, বলতুম, 'মা ওষুধ দিয়েছেন।' সেই হতেই মায়ের মাহাত্ম্য-প্রচার হল। আমিও ওষধ পেলুম, জগৎও ধন্য হল। আগে আগে মাকে অত কেউ জানত না। আমার খুড়ো মায়ের ওখানে হত্যা দিলেন। তাঁকে কিন্তু এমন ডেয়ো ছেড়ে দিলেন যে টিকতে দিলে না। মাকে এসে স্বপ্নে বলছেন, 'আমি যে শয়নে আছি, এখন কেন হত্যা দিয়েছে? ও বামুন মানুষ, এ সব জানে না? যাও, যাও, উঠিয়ে আনগে।' মা বললেন, 'এত কথা বললে, আর ওষুধটুকু বলে দিলেই ত হত।'

"আমার মা একবার দেখেছিলেন। একবার গ্রামের কালীপূজার সময় নব মুখুয্যে আড়াআড়ি করে আমাদের চাল নিলে না। মা চাল টাল তয়ের করে রেখেছিলেন—পূজার যোগান। আমাদের ঘর থেকে আর নিলে না। মা সমস্ত রাত্তির কেবল কাঁদলেন, 'কালীর জন্যে চাল করেছি, আমার চাল নিলে না? এ চাল আমার কে খাবে? এ কালীর চাল ত কেউ খেতে পারবে না।' তারপর রাত্রে

দেখেন কি জগদ্ধাত্রী, লাল রং, দুয়ারের ধারে পায়ের উপর পা দিয়ে বসেছেন। তখন ঐ একটি ঘর, বরদার ঘরটি। তিনি (ঠাকুর) আসলেও ঐ ঘরে থাকতেন। জগদ্ধাত্রী আমার মাকে গা চাপড়ে চাপড়ে ওঠালেন। উঠিয়ে বলছেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? কালীর চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি?' মা বললেন, 'কে তুমি?' জগদ্ধাত্রী বললেন, 'আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা গ্রহণ করব।' পরদিন মা আমাকে বলছেন, 'আরে সারদা, লাল রং, পায়ে পা ঠেসান দিয়ে ও কি ঠাকুর? আমি জগদ্ধাত্রী পূজা করব।' 'জগদ্ধাত্রী পূজা করব, জগদ্ধাত্রী পূজা করব'—তাঁর একটা বাই হয়ে গেল। বিশ্বাসদের কাছ থেকে দু আড়া (প্রায় ১৩ মণ) ধান আনালেন। এমন বৃষ্টি তখন, একদিনও ফাঁক নেই। মা বললেন, 'মা, কি করে তোমার পূজা হবে, ধানই শুকাতে পারলুম না!' শেষটায় মা জগদ্ধাত্রী এমন রোদ দিলেন যে, চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, মায়ের চাটাইয়ে রোদ! কাঠ জ্বেলে সেঁকে সেঁকে মূর্তি শুক্নো করে রং দেওয়া হল। প্রসন্ন তাঁকে (ঠাকুরকে) দক্ষিণেশ্বরে খবর দিতে গেল। তিনি শুনে বললেন, 'মা আসবেন, মা আসবেন, বেশ, বেশ। তোদের বড় খারাপ অবস্থা ছিল যে রে।' প্রসন্ন বললে, 'আপনি যাবেন, আপনাকে নিতে এলুম।' তিনি

বললেন, 'এই আমার যাওয়া হল ; যা, বেশ, পূজা করগে। বেশ, বেশ, তোদের ভাল হবে।' জগদ্ধাত্রীপূজা হল। দেশাম (দেশসুদ্ধ নিমন্ত্রণ) হল। ঐ চালেই সব খরচ-পত্র কুলিয়ে গেল। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের সময় মা জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তির কানে কানে আবার বলে দিলেন, 'মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি তোমার জন্য সমস্ত বছর ধরে সব যোগাড় করে রাখব।' পরের বছর মা আমাকে বললেন, 'দেখ, তুমি কিছু দিও, আমার জগাইয়ের পূজা হবে।' আমি বললুম, 'অত ল্যাঠা আমি পারব না! হল, একবার পূজা হল, আবার ল্যাঠা কেন? দরকার নেই, ও পারব না।' রাত্রে স্বপ্নে দেখি কি তিন জনে এসে হাজির। ওরে বাপ! সেই মনে পড়ছে।"

আমি—তিন জন কে কে?

মা—জগদ্ধাত্রী ও জয়া বিজয়া সখী। বলছেন, 'আমরা তবে যাব?' আমি বললুম, 'কে তোমরা!' বললেন, 'আমি জগদ্ধাত্রী।' আমি বললুম, 'না, তোমরা কোথা যাবে? না, না, তোমরা কোথা যাবে? তোমরা থাক, তোমাদের যেতে বলি নি।'

"সেই থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রীপূজার সময় এখানে আসি। বাসন-টাসন মাজতে হয় কিনা। আর তখন ত আমাদের সংসারে লোকজন বেশী ছিল না। বাসন মাজতে

আসতুম। তারপর যোগীন (মহারাজ) সব কাঠের বাসন করে দিলে। বললে, 'মা, তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না।' জগদ্ধাত্রীপূজার জমিও করে দিলে। আহা! আমার মা ছিলেন যেন লক্ষ্মী; সমস্ত বছর সব জিনিসটি-পত্রটি গুছিয়ে-টুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতেন। বলতেন, 'আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার, আমার সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) হয়ত কখনও আসবে, যোগীন (মহারাজ) আসবে। এসব দরকার।' ভাল চাল টাল যা পেতেন সব ঠিকঠাক করে রাখতেন। বলতেন, 'আমি যতক্ষণ আছি, ব্রহ্মা আছেন, বিষ্ণু আছেন, জগদম্বা আছেন, শিব আছেন, সব আছেন। আমিও যাব, এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। তোরা কি যত্ন করতে পারবি! আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার।'

"আমার একটু আমাশয়ের মত হইয়াছিল। তাহা শুনিয়া মা বলিলেন, 'ওর আমাশার ধাত, কাশীতেও হল।' আমি বলিলাম, 'কাশী যাবার আগে কলকাতায় হয়েছিল। আমাদের বংশেরই এই রোগ। বাবা এবং আরও অনেকে আমাশায় মারা গেছেন।'"

বিভূতি—ও সব কি? কবে বাপ কিসে মারা গেছেন, তাতে কি?

মা—হাঁ, ও কি? দৃষ্টান্ত দেওয়া ভাল নয়। দৃষ্টান্ত

দিলে ভুগতে হয়। কে কবে মরেছে। কেবা বাপ, কেবা মা? ঈশ্বরই সব।

৩০শে আষাঢ়, ১৩২০, জয়রামবাটী

মধ্যাহ্নে মায়ের ঘরের বারান্দায় আমি ও মুকুন্দ (সাহা) খাইতে বসিয়াছি। মা বড় মামার বারান্দার পূর্ব্বপাশে বসিয়া আছেন, এমন সময় নলিনী ভিজা কাপড়ে আসিয়া বলিল, কাকে তাহার কাপড়ে প্রস্রাব করিয়াছে বলিয়া সে আবার স্নান করিয়া আসিয়াছে।

মা—বুড়ো হতে চললুম, কাকে প্রস্রাব করে, কখনও শুনি নি! বহু পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়? কৃষ্ণ বোসের বোনের অমনি শুচিবাই ছিল। 'টিকিটা ডুবল কি?'—গঙ্গায় নাইতে গিয়ে ডুব দিচ্ছে, আর লোকদের জিজ্ঞাসা করছে। শুচিবাই, মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না। অশুদ্ধ মন অনায়াসে যায় না। আর শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে। সবই যত বাড়াবে তত বাড়বে।

আমি—মহাপুরুষকে দেখেছি ভজা প্রভৃতি কুকুরগুলোকে ঘেঁটে তারপর হয়ত ঠাকুরপূজা করতে গেলেন। যাবার সময় কেউ হাতে জল (তখন গঙ্গাজলই সব কাজে ব্যবহার হইত) ঢেলে দিলে, আচমনের মত একটু হাত ধুলেন মাত্র।

মা—তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের মন কত শুদ্ধ—সাধুর মন! গঙ্গাতীরে যারা বাস করে তারা সব দেবতা। দেবতা না হলে কি গঙ্গাতীরে বাস হয়? আর গঙ্গাস্নানে রোজের পাপ রোজ ক্ষয় হয়।

নলিনী—গোলাপ দিদি একদিন 'উদ্বোধনে' (উপরের) পায়খানা সাফ করে এসে, আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল। আমি বললুম, 'ও কি, গোলাপ দিদি! গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস।' গোলাপ দিদি বললে, 'তোর ইচ্ছা হয় তুই যা না।'

মা—গোলাপের মন কত শুদ্ধ, কত উঁচু মন। তাই ওর অত শুচি-অশুচি-বিচার নেই—অত শুচিবাই-টাই-এর ধার ধারে না। ওর এই শেষজন্ম। তোদের অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার।

"আর চারক্রোশী গঙ্গাতীর, পবিত্র হাওয়া বয়। হাওয়া-রূপী নারায়ণ। বহু তপস্যা করলে এই মন শুদ্ধ হয়। 'সাধন বিনা শুদ্ধ বস্তু কভু না মিলয়।'

"ভগবানলাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং বেরোয়? না, মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনে জ্ঞানচৈতন্যলাভ হয়।"

আমি—যারা ভগবানের উপর নির্ভর করে পড়ে থাকে, তাদের (বিনা সাধনে) কি করে হয়?

মা—ভগবানের উপর নির্ভর করে, বিশ্বাস করে যে পড়ে থাকে, এইটিই তাদের সাধন। আহা, নরেন বলেছিল, 'লাখ জন্ম হলেই বা, তাতে ভয় কি?' তাই ত, জ্ঞানীর জন্ম নিতে ভয় কি? তাদের ত আর পাপ হয় না। অজ্ঞানীরই যত ভয়। তারাই বদ্ধ হয়, পাপে লিপ্ত হয়। কত লাখ লাখ জন্ম ভুগে ভুগে, যাতনা পেয়ে পেয়ে শেষে ভগবানকে চায়।

আমি—ঘেঁটে ঘেঁটে তবে ত শিক্ষা হয়, জ্ঞান হয়।

মা—হাঁ, ঢাক, ঢোল, বীণা, সব যন্ত্র বাজিয়ে বাজিয়ে শেষে ধুনুরীর হাতে পড়ে তবে তুঁহু তুঁহু ডাক ছাড়ে।

শ্রীযুত রামলাল দাদার মেয়েটি বিধবা হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওসব দেববংশের মেয়ে, ওরা কখনও সংসারী হবে না।' তাই সব বিধবা। রাম-লালের কষ্ট আর কি। ছেলেটি মারা গেল। আজ থাকলে বার-তের বছরের হত। ছেলেগুলো* 'দাদামশায়, দাদামশায়' করে নাচছে। আর ওদেরও এই শেষ জন্ম। তাই সব এসে জন্মেছে ত।"

২রা আশ্বিন, জয়রামবাটী

মা একজনকে পত্রে জানাইতেছেন, "শরীরধারণে

* শ্রীযুত রামলাল দাদা ও শিবু দাদার শিশুপুত্রগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি-দর্শনে ঐরূপে আনন্দপ্রকাশ করিত।

কিছুমাত্র সুখ নাই। দুঃখপূর্ণই জগৎ। সুখ কেবল একটি নাম মাত্র। ঠাকুরের কৃপা যাহার উপর হইয়াছে সেই কেবল তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতে পারিয়াছে এবং তাহার সেইটুকুই সুখ জানিবে।"

একটি ত্যাগী ভক্ত জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করিয়া হৃষীকেশ গিয়াছেন। কিছুদিন পরেই তিনি মাকে লিখিয়াছেন, "মা, তুমি বলেছিলে, 'সময়ে ঠাকুরের দর্শন পাবে।' কই তা হল?" ইত্যাদি। মা চিঠি শুনিয়া আমাকে বলিতেছেন, "দাও ত, দাও ত ওকে লিখে, 'তুমি হৃষীকেশ গিয়াছ বলে ঠাকুর তোমার জন্য সেখানে এগিয়ে থাকেন নি।' সাধু হয়েছে, ভগবানকে ডাকবে না ত কি করবে? তিনি যখন ইচ্ছা দেখা দেবেন।"

উদ্বোধন

একটি ছেলে মায়ের কৃপালাভের জন্য দুই-এক বার আসিয়াছিল। ছেলেটি গরীব, অনেক কষ্টে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়ের শরীর অসুস্থ থাকায় কৃপালাভ করিতে পারে নাই। এবারে সে আমাদিগকে অনুযোগ করিয়া লিখিয়াছে, "আপনারা আর দুয়ার বন্ধ রাখিবেন না, আমাকে বহু কষ্টে যাইতে হয়। আমি জানিতে চাই, এবার যাইলে হইবে কিনা" ইত্যাদি। তাহার পত্র মাকে পড়িয়া শুনান হইল। মা তদুত্তরে

বলিলেন, "আমার শরীর যখন খারাপ থাকে তখন যেই আসুক না কেন, ফিরে যাবে। শরীর ভাল থাকলেও কাকেও নিমন্ত্রণ করে আনতে পারব না। যার যেমন ভাগ্য, যার যেমন কর্ম্ম, তার তেমনি সুযোগ-সুবিধা হয়ে থাকে। কেউ বা বহুবার এসেও দর্শনের সুবিধা পায় না, হয়ত আমার অসুখ, বা অন্য কোন ব্যাঘাত ঘটল। সে তার অদৃষ্ট ; তার আমি কি করব ? যাতায়াতে তাদের বহু অর্থব্যয় হয়ে থাকে, সকলের টাকা নাই, বলবে। তা গুরু যতবারই ফিরিয়ে দেন না কেন, যে কৃপা চায়, সে ভিক্ষা করেও আসে। কথা এই, যার ভবপারে যাবার সময় হবে সে দড়ি ছিঁড়ে আসবে, তাকে বেঁধেও কেউ রাখতে পারে না। অর্থাভাব, চিঠির অপেক্ষা, এসে ফিরে যাওয়ার ভয়—এসব কিছুই কিছু নয়।" পরিশেষে বলিলেন, "আজকাল শরীর একটু ভাল আছে, এখন আসতে পারে, লিখে দাও।"

একটি স্ত্রীলোক লিখিয়াছেন, "মা, আমার অল্প বয়স। শ্বশুর-শাশুড়ী আসতে দিচ্ছেন না। তাঁদের অমতে কি করে আসি। আপনার কৃপালাভ-ইচ্ছা" ইত্যাদি। মা তাঁহাকে লিখিতে বলিলেন, "মা, তোমার এখানে আসিবার আবশ্যকতা নাই। যে ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছেন তুমি তাঁহাকেই ডাক। তিনিই তোমাকে কৃপা করিবেন।"

৩০-৯-১৮, উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

সকালে মা পূজার জন্য ফল ছাড়াইতেছিলেন। জনৈক ভক্তের পত্র পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। পত্রখানি ভগবানের উপর অভিমানের ভাবে লেখা। মা তদুত্তরে বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, শুক, ব্যাস ত ডেয়ো-পিঁপড়ে। তাঁর অনন্ত রয়েছে। তুমি যদি ঈশ্বরকে না ডাক—আর কত লোক ত তাঁকে মনেই করছে না—তাতে তাঁর কি? সে তোমারই দুর্ভাগ্য। ভগবানের এমনি মায়া যে তিনি এই রকম করে সব ভুলিয়ে রেখেছেন—'বেশ আছে ওরা, থাক্।'

আমি—মা, এরা (পত্রলেখক) যে চায় না তা নয়। না চাইলে এমন প্রশ্ন এদের মনে উঠবে কেন? তবে যাঁকে আপনার বলে ধরতে যাচ্ছি, তিনি ধরাছোঁয়া দিচ্ছেন না, এটা বড় প্রাণে লাগে। বুদ্ধ, চৈতন্যদেব, যিশুখৃষ্ট, এঁরা ভক্তদের জন্য কত করতেন—কিসে তাদের কল্যাণ হবে।

মা—আমাদের ঠাকুরেরও ত ঐ ভাব ছিল। তবে আমার ত সব সময় মনে থাকে না (সকল ভক্তকে)। আমি ঠাকুরকে বলি, 'ঠাকুর, তুমি সকলের কল্যাণ কর, যে যেখানে আছে, আমার ত সকলকে মনে থাকে না।'

আর দেখ, তিনিই সব করছেন, তা না হলে এত সব আসছে ?

আমি—তাত বটেই। মানুষ কালী, দুর্গা, এ সবকে বরং ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু মানুষকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করা—একি হতে চায় ?

মা—এইটি তাঁর কৃপা।

পরে একদিন ভক্তটি আসিলে মাকে বলিলাম, "মা, এই সেই চিঠি লিখেছিল।" মা বলিলেন, "এ ? এত ভাল ছেলে।" ভক্তটিকে বলিয়াছিলেন, "এমন যে জল, যার স্বভাবই নীচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের ত স্বভাবই নীচুদিকে —ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্দ্ধগামী করে।"

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা হইবে। একটি গৃহস্থ শিষ্য মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। প্রণাম করিয়া মাকে বলিতেছেন, "মা, কেন ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে না ?" ইত্যাদি। মা বলিলেন, "ডাকতে থাক, ক্রমে হবে। কত মুনি-ঋষি যুগযুগান্তর ধরে তপস্যা করে পেলে না, আর তোমাদের ফস্ করে হবে ? এজন্মে না হয়, পরজন্মে হবে ; পরজন্মে না হয়, তার পরজন্মে হবে। ভগবানলাভ কি এতই সোজা ? তবে এবার ঠাকুরের সোজা পথ, তাই।"

ভক্তটি বাহিরে গেলে মা বলিলেন—

"এই সংসার করে এলুম, এই কুড়িগণ্ডা ছেলের বাপ হয়ে এলুম! বলে কিনা, 'ঠাকুরের দেখা কেন পাই না?'

"ঠাকুরের কাছে মেয়েমানুষগুলো যেত। বলত, 'কেন ঈশ্বরে মন হয় না? কেন মন স্থির হয় না?'— এই সব। ঠাকুর তাদের বলতেন, 'আরে, গা থেকে এখনও আঁতুড়-গন্ধ যায় নি। আগে আঁতুড়-গন্ধ ছাড়ুক। এখন কিরে? ক্রমে হবে। এজন্মে এই দেখা হল, পরজন্মে আবার দেখাটেখা হবে, তখন হবে।'

"যখন দেহ থাকে তখন অনায়াসেই দর্শন মেলে। এই এখানে রয়েছি—এলেই দেখা হয়। এখন ঠাকুরকে চাক্ষুষ দেখা কজনের ভাগ্যে হয়? বিজয় গোঁসাই ঢাকায় দেখে-ছিল—গা টিপে। ঠাকুর বললেন, 'আত্মাটা যে বেরিয়ে যায়, এ ভাল নয়; দেহ বুঝি এবার বেশী দিন থাকবে না।'

"কার হয়েছে বল না? নরেনের তিনি করে দিয়ে-ছিলেন।··· শুক, ব্যাস, শিব ত ডেয়ো-পিঁপড়ে। স্বপ্নে-টপ্নে হয়ত দর্শন হয়। নতুবা তিনি দেহ ধরে দেখা দেবেন, সে বহু ভাগ্যের কথা।

(উত্তেজিতকণ্ঠে) "যদি শুদ্ধ মন হয়, কেন ধ্যানধারণা হবে না? কেন দর্শন হবে না? জপ করতে বসলুম ত আপনা হতেই ভিতর থেকে গর গর করে নাম উঠতে থাকবে, চেষ্টা করে নয়।

"জপধ্যান সব যথাসময়ে আলস্য ত্যাগ করে করতে হয়। দক্ষিণেশ্বরে একদিন শরীরটা খারাপ লাগায় একটু দেরিতে উঠেছি। তখন রাত তিনটায় উঠতুম। পরদিন আরও দেরিতে উঠলুম। ক্রমে দেখি আর সকালে উঠতেই ইচ্ছা যাচ্ছে না। তখন মনে হল, ওরে এই ত আলস্যে পেয়েছে। তারপর জোর করে উঠতে লাগলুম, তখন সব পূর্ব্বের মত হতে লাগল। এ সব বিষয়ে রোক করে অভ্যাস রাখতে হয়।

"সাধন বল, ভজন বল, তীর্থদর্শন বল, অর্থোপার্জ্জন বল —সব প্রথম বয়সে করে নিতে হয়। এই আমি তখন হেঁটে হেঁটে কাশী-বৃন্দাবনে কত দর্শন করেছি। এখন দুহাত যেতে হলে পাল্কি চাই—ধরে ধরে নিতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে কফ-শ্লেষ্মায় ভরা, শরীরে সামর্থ্য নেই, মনে বল থাকে না— তখন কি কোন কাজ হয়? এই যে এখানকার ছোকরারা সব প্রথম বয়সেই ভগবানে মন দিচ্ছে, এ ঠিক দিচ্ছে, ঠিক সময়ে হচ্ছে। (আমাকে) বাবা, সাধন বল, ভজন বল, সব এখন, এই বয়সেই করে নেবে। শেষে কি আর হয়? যা করতে পার, এখন।"

আমি—এখন যারা তোমার কৃপা পাচ্ছে, তারা ত ভাগ্যবান। এর পর যারা আসবে তাদের কি করে হবে?

মা—সে কি? তা হবে না? ভগবান সর্ব্বত্র সব

সময়ে রয়েছেন'। ঠাকুর রয়েছেন। তাঁর কৃপায় হবে। অন্য সব দেশে হচ্ছে না ?

আমি—ভালবাসা পেলে তবে ত প্রাণ ব্যাকুল হয়। তুমি আমাদের ভালবাস কই ?

মা—তোমাকে আবার ভালবাসি না? যে আমার জন্য এতটুকু করে, তাকে ভালবাসি ; আর তুমি এত করেছ ! বাড়ীতে যখনই যে জিনিসটি ধরি, তোমার কথা মনে পড়ে।, ভাল খুবই বাসি। তবে শরীর নিয়ে ত আর মেশামিশি করতে পারি না। আর সেগুলো করা কি ভাল ? তোমরা যে কয়টি এখানে রয়েছ তাদের প্রায়ই মনে পড়ে। তবে যারা দূরে আছে তাদের জন্য ঠাকুরকে জানাই—'ঠাকুর, তুমি ওদের দেখো, আমার ত আর মনে থাকে না।'

উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

মা তাঁহার তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছেন, আমি ভক্তদের পত্র পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। কৃষ্ণলাল মহারাজও ছিলেন। পত্র লিখিয়াছে, মন স্থির হয় না, ইত্যাদি। মা এই সকল কথায় বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "রোজ পনর-বিশ হাজার করে জপ করতে পারে, তাহলে হয়। আমি দেখেছি, কৃষ্ণলাল, বাস্তবিক হয়। আগে

করুক ; না হয়, তখন বলবে। তবে একটু মন দিয়ে করতে হয়। তা ত নয়, কেউ করবে না, কেবল বলে—কেন হয় না ?”

একটি ভক্ত প্রণাম করিতে গিয়া ধ্যানজপের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন—

“জপ, সংখ্যা, করগণনা—এসব শুধু মন আনবার জন্য। মন এদিক ওদিক যেতে চায়, তবু ঐ সবের দ্বারা এদিকে আকৃষ্ট হয়। যখন জপ করতে করতে ভগবানের রূপ-দর্শন হয়, ধ্যান হয়, তখন জপও থাকে না। ধ্যান হল ত সবই হল।

“মন চঞ্চল, তাই প্রথম প্রথম মন স্থির করবার জন্য একটু একটু নিঃশ্বাস বন্ধ করে ধ্যানের চেষ্টা করতে হয়। তাতে মন স্থির হবার সাহায্য করে। কিন্তু ওভাবে বেশী করতে নাই, মাথা গরম হয়। ভগবানদর্শন বল, ধ্যান বল, সবই মন। মন স্থির হলে সবই হয়।

“মানুষ ত ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ। তিনি শতবর্ষ ছেলেপুলে নিয়ে থাকবেন বলছেন।”

—স্বামী অরূপানন্দ

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন সকালে শুনিলাম, সেইদিন বৈকালে চারিটার সময় শ্রীশ্রীমা পূজনীয় শরৎ মহারাজ, যোগেন-মা, গোলাপ-মা প্রভৃতির সহিত কলিকাতার পথে কোয়ালপাড়া পৌঁছিবেন এবং আমাদের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্তের (স্বামী কেশবানন্দের) বাটীর ঠাকুরঘরখানিতে শ্রীশ্রীমার ও আমাদের স্কুলে আর সকলের বিশ্রামের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেলেও তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলেন না। পরে সংবাদ আসিল তাঁহাদের গাড়ী নদীর নিকট দঁকে পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ ভক্তদের কয়েক জন সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে রাত্রি দশটা আন্দাজ সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মা গাড়ী হইতে নামিয়া বেশ ঘোমটা দিয়া একটু পা টানিতে টানিতে কেদার বাবুর মার সহিত তাঁহাদের ঠাকুর-ঘরে গেলেন। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলে সমবেত স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আমিও করিলাম। কেদার বাবুর মা কানে একটু কম শুনিতেন বলিয়া মা আমার দ্বারাই পুরুষ ভক্ত-গণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। এদিকে বেশী রাত্রি

হইতেছে বলিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ সংবাদ পাঠাইলে মা শশব্যস্তে থালা হইতে একটি সন্দেশের কিছু ভাঙ্গিয়া গ্রহণ করিলেন ও একটু জল খাইয়া রওয়ানা হইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। সকলের সঙ্গে আমিও তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, বাবা যাহা প্রণামী দিতে দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার হাতে দিলাম। মা সস্নেহে চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিলেন, "বাবা, যা কিছু দিতে হয় সব পায়ে দিতে হয়।" তিনি ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিলেন।

সেই সামান্য কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া তাহার যে স্নেহের আস্বাদ পাইয়াছিলাম তাহার তুলনায় পিতামাতার ভালবাসাও সেই বয়সে তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল।

একবার ৺জগদ্ধাত্রীপূজার সময় মা কলিকাতা হইতে জয়রামবাটী আসিবার পথে সকালে কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌঁছিলেন। অপরাহ্ণে রওয়ানা হইবার সময় আশ্রমের উৎসাহী কর্ম্মিগণকে বলিলেন, "এখানে এখন তোমরাই আপনার জন। দেশে এখন তোমাদের ভরসাই ভরসা। এখানে দেখছি ঠাকুর তাহলে বসছেন।" একে একে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মধ্যে মধ্যে জয়রাম-বাটী যেও। বিশেষ করে জগদ্ধাত্রীপূজার সময় তোমাদের সব যেতে হবে।"

জগদ্ধাত্রীপূজার দিন আমরা তিন জন আমাদের ক্ষেতের কতকগুলি শাকসব্জি লইয়া জয়রামবাটী গেলাম। মা আমাদের দেখিয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন ও বলিলেন, “এখানে তরকারিপাতি সব সময়ে মেলে না, মাঝে মাঝে বড় মুশকিলে পড়তে হয়। তা ঠাকুরই তোমাদের দিয়ে সব যোগাবেন দেখছি।” সেই সময় হইতে তিনি যখনই দেশে থাকিতেন, আমরা সপ্তাহে দুই-তিন দিন আশ্রমের দৈনন্দিন কার্য্য শেষ করিয়া কখনও বাগান হইতে, কখনও বা হাট হইতে কিনিয়া তাহার জন্য তরকারি লইয়া যাইতাম। কোন কোন দিন গিয়া দেখিতাম মা শুইয়া আছেন। আমরা তাঁহার নির্দ্দেশমত জিনিসগুলি যথাস্থানে রাখিয়া প্রণাম করিলে তিনি মাথা একটু তুলিয়া, “তোমাদের চৈতন্য হোক, ভক্তিবিশ্বাস হোক” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কিছু মুড়ি লইতে বলিতেন। আমরাও উহা লইয়া খাইতে খাইতে কোন কোনদিন রাত্রি বারটায় আশ্রমে ফিরিতাম।

একদিন শীতকালে কতকগুলি তরকারি ও কিছু গাওয়া-ঘি প্রভৃতি মাথায় লইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম-অবস্থায় সন্ধ্যার সময় আমরা জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। মামীদের মধ্যে একজন আমাদের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, “ভক্ত হইলেই কি যত কষ্ট! বোঝা বয়ে ছেলেদের মাথা গেল।” শ্রীশ্রীমা ঐকথা শুনিয়া বলিলেন, “ওদের মাথা কি আর আছে?

যাঁর মাথা তাঁকে দিয়ে দিয়েছে।” তারপর অতি স্নেহে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আশ্রমে আমাদের বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, “একসঙ্গে অত জিনিস না পাঠিয়ে অল্প অল্প পাঠিও, নইলে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।” ইহার পর আমরা অল্প মোট লইয়া ঘন ঘন তাঁহার নিকট যাইতাম।

জগদ্ধাত্রীপূজার পর মা কলিকাতা যাইবেন। কোয়ালপাড়া আশ্রমে তখন খুব স্বদেশীচর্চ্চা হয় এবং ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ প্রভৃতি অপেক্ষা তাত, চরকা প্রভৃতির উপরই সকলের বেশী ঝোঁক। মা চলিয়া যাইবেন শুনিয়া কেদার বাবু জয়রামবাটীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, “দেখ, বাবা, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য ঘর ও আমাদের পথের বিশ্রামের স্থান একটু করেছ, তখন এবার যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব। সব আয়োজন করে রেখো। পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করবে। শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর। তিনিই আদর্শ। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।” কেদার বাবু বলিলেন, “স্বামিজী ত দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না দেশের হত!” ইহা শুনিয়া মা তাড়াতাড়ি বলিতেছেন,

"ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আর তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল! বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাকে বললে, 'মা, আপনার আশীর্ব্বাদে এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি। সেখানেও দেখলাম ঠাকুরের কি মহিমা! কত সজ্জন লোক আমার কাছে তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছে এবং এই ভাব নিয়েছে!' " তারপর বলিলেন, "তারাও ত আমার ছেলে, কি বল?"/

প্রসঙ্গক্রমে দু-একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একবার পূজার সময় মামাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কাপড় কিনিবার ভার মা আমার উপর দেন। আমি সব দেশী কাপড় লইয়া যাই। মেয়েরা অধিকাংশই অপছন্দ করিলেন এবং তাঁহাদের নিজেদের পছন্দমত ফরমাস করিতে লাগিলেন। আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "ওসব ত বিলিতি হবে, ও আবার কি আনব?" শ্রীশ্রীমা একপাশে বসিয়াছিলেন। তিনি একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা, তারাও (বিলাতের লোক) ত আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি এক-রোখা হলে চলে? ওরা যেমন যেমন বলছে তাই এনে দাও।" পরে দেখিতাম কাহারও জন্য কোন বিলাতি

দ্রব্য আনাইতে হইলে মা আমাকে না বলিয়া অপরকে দিয়া আনাইতেন। কাহারও ভাবে আঘাত দেওয়া তাঁহার স্বাভাববিরুদ্ধ ছিল।

কিন্তু যেদিন সংবাদ আসিল কোন স্বদেশী মামলা সম্পর্কে যূথবিহার গ্রামের দেবেন বাবুর স্ত্রী ও ভগিনী সিন্ধুবালা দেবীদের (দুজনেরই নাম এক ছিল) গর্ভাবস্থায় বাঁকুড়ার পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষ বন্দী করিয়া হাঁটাইয়া থানায় লইয়া গিয়াছেন, সেদিন মার অগ্নিময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মা প্রথমতঃ "বল কি!" বলিয়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন। তারপর বলিলেন, "এটা কি কোম্পানির আদেশ, না পুলিশ সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধ স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় ত কই শুনি নি! এ যদি কোম্পানির আদেশ হয়, তবে আর বেশী দিন নয়। এমন কোন বেটা-ছেলে কি সেখানে ছিল না যে দু চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?" কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তাহাদের ছাড়িয়া দিয়াছে এই সংবাদ শুনিলেন তখন অনেকটা শান্ত হইয়া বলিলেন, "এ খবর যদি না পেতাম তবে আজ আর ঘুমুতে পারতাম না।"

আর একবার মা কোয়ালপাড়ায় আছেন, সেই সময়ে একদিন পূজনীয় শরৎ মহারাজ রাসবিহারী মহারাজকে

কতকগুলি আম্র সঙ্গে দিয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়াছেন। তিনি পৌঁছিবার একটু পরেই প্রবোধ বাবু মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, যুদ্ধের কি খবর? কি লোকক্ষয়টাই না হল—কি মানুষমারা কলই না বের করেছে! আজকাল কতরকম যন্ত্রপাতি—টেলিগ্রাফ ইত্যাদি। এই দেখনা, রাসবিহারী কাল কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আজ এখানে পৌঁছে গেল। আমরা তখন কত হেঁটে, কত কষ্ট করে তবে দক্ষিণেশ্বর গেছি।" প্রবোধ বাবু একটু উৎসাহিত হইয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "ইংরেজ সরকার আমাদের দেশের অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে।" মা সব কথায় সায় দিতে দিতে শেষে বলিলেন, "কিন্তু বাবা, ঐ সব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।"

কলিকাতা যাইবার পথে মা কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিজহাতে ঠাকুরের ও নিজের ফটো দুইখানি বসাইয়া বিশেষ পূজা করিলেন এবং কিশোর দাদাকে দিয়া হোম ও অন্যান্য ক্রিয়া করাইলেন। মধ্যাহ্নে মা হাঁটিয়া কেদার বাবুর মায়ের সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীতে একটু বেড়াইতে গিয়াছেন। মা কেদার বাবুর বাড়ী হইতে

ফিরিয়া আসিবার সময় মধ্যপথে প্র—মহারাজ তাঁহাকে পাল্কিতে উঠিতে বলায় তিনি একটু বিরক্ত হইয়াই উহাতে চড়িলেন। আশ্রমে আসিয়া মা তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এ আমাদের পাড়াগাঁ। কোয়ালপাড়া হল আমার বৈঠকখানা। এই সব ছেলেরা আমার আপনার লোক। আমি এদেশে এসে একটু স্বাধীনভাবে চলব ফিরব। কলকাতা থেকে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমরা ত সেখানে আমাকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখ। আমাকে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়। এখানেও যদি তোমাদের কথামত পাটি বাড়াতে হয়, তা আমি পারব না। শরৎকে লিখে দাও।" তখন প্র—মহারাজ ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "শরৎ মহারাজ আমাকে পথে খুব সাবধানে আপনাকে নিয়ে যেতে আদেশ করেছেন। আমার মনে হয়েছিল, বোধ হয় আমারই ত্রুটিতে আপনি হেঁটে গিয়াছেন। তা মা, আপনার যে অভিপ্রায় সেইরূপই করবেন।"

প্র—মহারাজের কথামত ঠিক হইল সন্ধ্যা ছয়টার পূর্ব্বে তাঁহাদের খাবার আমরা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে দিব। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা সময়মত সব শেষ করিতে পারিতেছি না দেখিয়া তিনি রাগ করিতে লাগিলেন। রাজেন দাদা বলিলেন, "বেশ, আপনার সময়মত এঁদের

নিয়ে আপনি রওনা হোন। আমরা খাবার তৈরি করে যতদূর হোক মাথায় করে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবো।" মা এই সকল শুনিতে পাইয়া প্র—মহারাজকে বলিলেন, "তুমি মাথা গরম করে এত রাগারাগি করছ কেন? এ আমাদের পাড়াগাঁ; কলকাতার মত এখানে কি সব ঘড়ির কাঁটাটিতে হয়ে ওঠে? দেখছ সকাল থেকে ছেলেরা কি খাটাই খাটছে! তুমি যাই বলনা কেন, এখান থেকে না খেয়ে যাওয়া হবে না।" শেষে রাত্রি আটটা আন্দাজ আহারাদি করিয়া আটখানি গরুর গাড়ীতে সকলে বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মা রামেশ্বর তীর্থ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। আমরা তিন জন 'উদ্বোধনের' বাড়ীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে উপরে গিয়াছি। আমরা প্রণাম করিয়া বসিলে কোয়ালপাড়া আশ্রমের ও জয়রামবাটীর সকলের কুশল জিজ্ঞাসার পর মা কেদার বাবুকে বলিলেন, "তুমি আসবে শুনে তোমাদের আশ্রমের জন্যে দুখানি রামেশ্বরের ফটো রেখেছি। যাবার সময় নিয়ে যেও। সেখানে পূজা করবে।" কেদার বাবু বলিলেন, "আপনি ত ঠাকুরকে বসিয়ে এসেছেন, আর তাঁকেই সকল দেবদেবীজ্ঞানে পূজো করতে বলেছেন। আবার এই সব ঠাকুর দিচ্ছেন। কত ঠাকুরের পূজো করব? আমরা অন্য ঠাকুরের পূজো করতে পারব না।" তখন মা

বলিলেন, "আচ্ছা, এইগুলো ভাল করে বাঁধিয়ে ঠাকুরঘরে টাঙ্গিয়ে রেখো।" কেদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন?" মা বলিলেন, "বাবা, যেমনটি রেখে এসেছিলাম ঠিক তেমনটিই আছেন।" গোলাপ-মা তখন ঐ দিক দিয়া বারান্দায় যাইতেছিলেন। তিনি মায়ের ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি বললে, মা?" মা একটু চমকিত হইয়া বলিলেন, "কই, কি বলব? বলছি এই তোমাদের কাছে যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তেমনটিই দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল।" তখন গোলাপ-মা বলিলেন, "না, মা, আমি সব শুনেছি, এখন আর কথা ফেরালে কি হবে? কেমন গো, কেদার?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন ও যোগেন-মা প্রভৃতিকে সব বলিতে লাগিলেন।

মা বলিলেন, "আহা, শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) আমাকে সোনার ১০৮টি বেলপাতা দিয়ে রামেশ্বরের পূজা করালে। রামনাদের রাজা, আমি এখানে এসেছি শুনে, তাঁর দেওয়ানকে হুকুম দিলেন, মন্দিরের রত্নাগার খুলে আমাকে দেখাতে; আর যদি আমি কোন জিনিস পছন্দ করি, তখনই যেন তা আমাকে উপহার দেওয়া হয়। আমি আর কি বলব? কিছু ঠিক করতে না পেরে বললাম, 'আমার আর কি প্রয়োজন? আমাদের

যা কিছু দরকার সব শশীই ব্যবস্থা করছে।’ আবার তারা ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে বললাম, ‘আচ্ছা, রাধুর যদি কিছু দরকার হয়, নেবে এখন।’ রাধুকে বললাম, ‘দেখ, তোর যদি কিছু দরকার হয়, নিতে পারিস।’ তারপর যখন হীরা-জহরতের জিনিস সব দেখছি তখন কেবলই আমার বুক দুর দুর করছে। ঠাকুরের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করছি, ‘ঠাকুর, রাধুর যেন কোন বাসনা না জাগে।’ তা রাধু বললে, ‘এ আবার কি নেব? ও সব আমার চাই না। আমার লেখবার পেন্সিলটা হারিয়ে ফেলেছি, একটা পেন্সিল কিনে দাও।’ আমি এ কথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাইরে এসে রাস্তায় দোকান থেকে দু পয়সার একটা পেন্সিল কিনিয়ে দিলাম।”

এই সকল কথাবার্ত্তার পর মা ঠাকুরকে ভোগ দিতে উঠিয়া গেলেন। আমরাও নীচে নামিয়া আসিলাম।

জন্মাষ্টমীর দুই-এক দিন পূর্ব্বে আমি মার নিকট ঐ দিন দীক্ষা লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় গোলাপ-মা শুনিতে পাইয়া তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “ঐটুকু ছেলে (আমার বয়স তখন তের বৎসর), দুদিন পরে মন্ত্র ভুলে যাবে, এখন থেকেই দীক্ষা! কেদারের যেমন কাণ্ড! মা ত তোমাদের দেশেরই। তিনি যখন সেখানে যাবেন তখন দেখে শুনে পরে দীক্ষা নিও।” ইহা

বলিয়া গোলাপ-মা চলিয়া গেলেন। তখন মা বলিতেছেন, "গোলাপের কথা দেখনা। বালককালে যা ভাল করে শেখে তা কি ভোলে কখনও? এখন থেকে যা পারে করুক না। পরে ত আমি আছিই।" জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সারিয়া মা আমাকে দীক্ষা দিলেন এবং আমাকে যেমন বলিয়াছিলেন সেইরূপ জপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই ত; এইটি আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে। পরে যেমন যেমন আবশ্যক সব সময়মত আবার দেখিয়ে দেব।" তারপর মাথায় ও বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস।" আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত পাশের ঘরে গেলে তিনি শিকা হইতে দুইটি পান্তুয়া লইয়া একটি হইতে সামান্য দাঁতে কাটিয়া খাইলেন এবং বাকী আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "খাও।" আমি উহা হাতে লইয়া তাঁহার সামনে খাইতে লজ্জা করিতেছি দেখিয়া বলিলেন, "লজ্জা করো না, দীক্ষার পর প্রসাদ খেতে হয়।" বলিয়া এক গ্লাস জল দিলেন।

কয়েক দিন পরেই আমরা কেদার বাবুর মাকে* (তিনিও মায়ের সহিত রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে গিয়া

---

* এই বৃদ্ধা মহিলা মায়ের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ষাট বৎসর বয়সে লেখাপড়া শিখিবার আগ্রহ হওয়ায় তিনি প্রথম ভাগ হইতে পড়িতে আরম্ভ করেন

ছিলেন) সঙ্গে লইয়া কোয়ালপাড়ায় চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় মা কেদার বাবুকে কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলেন, "জগদ্ধাত্রীপূজার জন্যে ধান কিনে কিছু চাল করিয়ে রাখবে।"

ফাল্গুন মাসে মা দেশে আসিতেছেন। কোয়ালপাড়া হইতে ভোরে আমরা তিনজন অনেক দূর আগাইয়া তাঁহাকে আনিতে গেলাম। মার গাড়ীগুলি দৃষ্টিগোচর হইতেই আমাদের দুজন আশ্রমে খবর দিবার জন্য ফিরিয়া গেলেন। আমি গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব বলিয়া থাকিয়া গেলাম। দূর হইতে মা আমাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "কে গো, ব— নয় ?" আমি কাছে গিয়া প্রণাম করিতেই মা সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গাড়ী চলিতেছে, আমিও হাঁটিয়া যাইতেছি। মা ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া "এটি কোন্ গ্রাম ? ওটা কাদের পুকুর ? কোয়ালপাড়া আর কতদূর ?" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কোতুলপুর ছাড়াইয়া আসিলে মা বলিলেন, "গাড়ীতে উঠে এস না, আর কত হাঁটবে ?" গাড়ীতে মায়ের সহিত রাধুও ছিল। একটু পরে গাড়োয়ান গাড়ী হইতে নামিয়া

এবং শেষকালে রামায়ণ, মহাভারত পর্যন্ত পড়িতে ও বুঝিতে পারিতেন। রামেশ্বরেও তিনি প্রথম ভাগ ও শ্লেট সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মায়ের দেহত্যাগের ছয়-সাত বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বলিল, "আমি একটু হাঁটছি, আপনি এই সামনে বসুন।" আমি তখন গাড়ীতে উঠিয়া গরু দুটিকে একটু তাড়া দিয়া জোরে চালাইতেই মা খুব হাসিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "তুমি ত বেশ গাড়ী হাঁকাতে জান! তা সব কাজই শিখে রাখা ভাল।" যথাসময়ে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। মায়ের বাতের শরীর; গরুর গাড়ীতে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেদার বাবুর মা হাত ধরিয়া তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসাইলেন। মা একটু বিশ্রাম করিয়া স্নান করিলেন। আমাকে বলিলেন, "বাবা, কেদারের মার সঙ্গে আর বকতে পারি না। (ইনি একটু কালা ছিলেন)। তুমি কাপড়খানা ছেড়ে গামছা পরে আমার পূজার যোগাড়টা করে দাও ত।"

আমি না জানিয়া মায়েরই ভিজা গামছাখানি পরিয়া সাজি লইয়া ফুল তুলিতে যাইতেছি। কেদার বাবুর মা তাহা দেখিয়া একেবারে অস্থির হইয়া বলিলেন, "ওরে, মার গামছা পরেছিস যে রে, ছাড়্ ছাড়্।" তখন মা বলিতেছেন, "তাতে কি? ছেলে মানুষ—আমার গামছা পরেছে ত কি হয়েছে? যাও, যাও, ফুল নিয়ে এস।"

কেদার বাবু গল্প করিতে করিতে মাকে বলিলেন, "মা, আপনার সব ছেলেরাই বিদ্বান, আমরা এই কয়টি আপনার

একেবারে মূর্খ সন্তান। শরৎ মহারাজ ঠাকুরের বই লিখে তাঁর কথা ও ভাব প্রচার করছেন। অন্যান্য ছেলেরা সব বক্তৃতা দিচ্ছেন—কত কাজ হচ্ছে।" মা শুনিয়া বলিতেছেন, "সে কি গো ? ঠাকুর যে লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। ভগবানে মতি হওয়াই আসল। তোমার দ্বারা এদেশে অনেক কাজ হবে। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভিতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি ? তোমরা আমার আপনার লোক। তবে কি জান, বিদ্বান সাধু যেন হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান।" এই কথা বলিয়া পূজা করিতে উঠিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মা পাল্কিতে জয়রামবাটী রওয়ানা হইলেন।

জগদ্ধাত্রীপূজায় কোয়ালপাড়া হইতে যে লোকটির ভাণ্ডারী হইয়া যাইবার কথা ছিল তাহার হঠাৎ অসুখ হওয়াতে আমিই ওই কাজের ভার লইয়া পূজার পূর্ব্বদিন জয়রামবাটী উপস্থিত হইলাম। মা আমাকে বলিলেন, "তা বেশ, তুমিই পারবে। আজ সব দেখে শুনে রাখ। কাল খুব সকালে স্নান করে ভাঁড়ারে এস। একটু আলগোছ রেখে কাজগুলি করো, তা হলেই হবে এখন।"

ঐ অঞ্চলে সমাজের বাঁধাবাঁধি খুব বেশী বলিয়া মা শেষের কথাগুলি বলিলেন। *

জগদ্ধাত্রীপূজার দিন সকাল হইতে মা ভাণ্ডারে আসিয়া একটি বস্তার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিলেন এবং কেহ কিছু চাহিতে আসিলে আমি তাঁহাকে দেখাইয়া উহা দিতে লাগিলাম। পূজাশেষ হইলে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য মা স্নান করিয়া মামীদের লইয়া মণ্ডপে গেলেন। তিনবার দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে জোড়হাতে একধারে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পূজা নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইল। মধ্যাহ্নে গ্রামে স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই অন্নপ্রসাদ পাইলেন। দ্বিতীয় দিন (মা তিনদিন প্রতিমা রাখিতেন) আমার জ্বর হওয়ায় মা নিজেই ভাঁড়ারের সব কাজ করিলেন।

সন্ধ্যারতির পর সাধু-ভক্তেরা সকলে মিলিয়া ভজন গান আরম্ভ করিলেন। "মাকে দেখবে বলে ভাবনা কেউ করো না গো আর; সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়, জগতের মা সবাকার।" —এই গানটি বার বার গাহিতে লাগিলেন। মা পাশের ঘরে বসিয়া মেয়েদের সহিত

---

* একবার ভগিনী নিবেদিতা মার দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "না, মা, আমি বেঁচে থাকতে তোমরা সেখানে যেও না। তা হলে আমায় তারা ঠেকো (একঘরে) করবে।"

একমনে শুনিতেছেন। রাত্রে আমাকে বলিলেন, "আহা, গানটি বেশ জমেছিল। ভক্তের আবার জাত কি? সব ছেলে এক। আমার ইচ্ছে হয় সকলকে এক পাত্রে বসিয়ে খাওয়াই। তা এ পোড়া দেশে জাতের বড়াই আবার আছে। যাই হোক, মুড়িতে ত আর দোষ নেই, কাল এক কাজ কর। খুব সকালে কামারপুকুরের সত্য ময়রার দোকান থেকে বড় বড় জিলিপি দু সের নিয়ে এস।" পর-দিন বেলা নয়টা আন্দাজ আমি জিলিপি লইয়া ফিরিলাম। মা উহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে একবার দেখাইয়া একখানি বড় থালাতে বিস্তর মুড়ি ও তাহার চারিপাশে জিলিপিগুলি সাজাইয়া ভক্তদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমরা সকলে মহানন্দে উহা খাইতে লাগিলাম। পাশের ঘর হইতে মা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

একবার বর্ষাকালে জয়রামবাটীতে খুব ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ের প্রকোপ হয়। মাও কয়েকদিন রক্তামাশয়ে খুব ভুগিয়া ডাক্তার কাঞ্জিলালের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন। জল-কাদার মধ্যে হাঁটাহাঁটির ফলে কোয়ালপাড়া আশ্রমে আমাদের সকলেরও অল্পবিস্তর জ্বর হয়। দশ-পনর দিন আমাদের কেহ জয়রামবাটী আসিতেছে না দেখিয়া মা আমাদের সংবাদ লইতে একটি ঝিকে পাঠাইলেন। তাহার পরের দিনই রাধুকে দিয়া আমাদিগকে

এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন—"শ্রীমান কেদার, ওখানকার আশ্রমে আমি ঠাকুরকে বসিয়েছি। তিনি সিদ্ধ চালের ভাত খেতেন, মাছও খেতেন। অতএব আমি বলছি, ঠাকুরকে সিদ্ধ চালের ভোগ ও অন্ততঃ শনি-মঙ্গলবারে মাছভোগ দেবে। রবিবারে দিও না। আর যেমন করেই হোক, তিন তরকারী ছাড়া ভোগ দিতে পারবে না। অত কঠোরতা করলে দেশের ম্যালেরিয়ার সঙ্গে জুঝবে কি করে!"

মা ইহার কয়েকদিন পরে কেদার বাবুকে রাধুর সম্বন্ধে বলিতেছেন, "অত বড় মেয়ে হল, কোন জ্ঞান হল না। ঠাকুর ওকে দিয়ে কি বন্ধনেই রেখেছেন! তাঁর শরীর-ত্যাগের পর দেশে এসে যখন উদাসভাবে এইখানটিতে বসে থাকতাম, তখন দেখতাম লাল কাপড় পরে ছোট মেয়েটির রূপ ধরে সামনে ঘুরত।" কেদার বাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়াছেন দেখিয়া মা বলিলেন, "ও কেদার, শুন্‌ছ? ও হল যোগমায়া।" কেদার বাবু বলিলেন, "না, মা, আমি সব শুনি নি—আবার বলুন।" মা তখন বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন সংসারে আর কিছুই ভাল লাগছে না, মন হু হু করছে, আর প্রার্থনা করছি, 'আর আমার এ সংসারে থেকে কি হবে?' সেই সময় হঠাৎ দেখলাম, লালকাপড়পরা

দশ-বার বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখিয়ে বললেন, 'একে আশ্রয় করে থাক। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে।' পরক্ষণেই তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন, মেয়েটিকেও আর দেখতে পাই নি। তারপর একদিন ঠিক এই জায়গাটিতে বসে আছি, ছোট বউ (রাধুর মা) তখন বদ্ধ পাগল, কতকগুলো কাঁথা বগলে করে টানতে টানতে ঐ দিকে যাচ্ছে, আর রাধু হামা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার পেছনে যাচ্ছে। তাই দেখে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। ছুটে গিয়ে রাধুকে তুলে নিলাম। মনে হল, তাইত, একে আমি না দেখলে কে আর দেখবে ? বাবা নেই, মা ঐ পাগল। এই মনে করে যাই ওকে কোলে তুলে নিয়েছি, অমনি ঠাকুরকে সামনে দেখলাম। তিনি বলছেন, 'এই সেই মেয়েটি, ওকে আশ্রয় করে থাক, এটি যোগমায়া।' কি জানি বাবা, আগে আগে ও বেশ ছিল। আজকাল নানা রোগ, আবার বিয়েও হল। এখন ভয় হয় পাগলের মেয়ে শেষে পাগল না হয়! শেষটায় কি একটা পাগলকে মানুষ করলাম !"

কলিকাতা হইতে মা একবার কেদার বাবুকে পত্র লেখেন, "তোমরা যদি কোয়ালপাড়ায় আমার জন্যে একখানা ঘর করে রাখতে পার, তা হলে দেশে গিয়ে

মাঝে মাঝে তোমাদের ওখানে থাকি।” এই পত্র পাইয়া আমরা নিজেরা চেষ্টা করিয়া তাঁহার জন্য একটি বাড়ী প্রস্তুত করি। উহাই ‘জগদম্বা আশ্রম’। মা তথায় প্রথম বার প্রায় একপক্ষ কাল বাস করিয়া জয়রামবাটী যান। শেষে একদিন বিকালে তাঁহার দ্বিতীয়বার আসিবার দিন স্থির হইল। আমরা পাল্কি ঠিক করিয়া রাখিলাম। কিন্তু ঐ দিন সকাল হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নদীতে খুব জল বাড়িয়াছে, খবর আসিল। তথাপি কেদার বাবু বলিলেন, “তোমরা তাঁর আদেশ মত পাল্কি নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হও, তারপর মা যেমন বলেন তেমনি করো।” নদীতে আসিয়া দেখিলাম সাঁতার জল। রাজেন মহারাজ সাঁতার দিয়া ওপার হইতে ডোঙ্গা লইয়া আসিলেন এবং পাল্কিসহ আমরা পার হইয়া বেলা তিনটা আন্দাজ জয়রামবাটী পৌঁছিলাম।

কালী মামা আমাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, “তোমরা এই বাদলে কি বলে দিদিকে নিতে এলে?” মা একটু একটু হাসিতেছেন। রাজেন দাদা বলিলেন, “আমাদের কি সাধ্য আছে যে মাকে নিয়ে যাই বা সেবা করি! আজ পাল্কি নিয়ে আসব বলে গেছি, তাই এসেছি।” মা তখন হাসিয়া বলিলেন, “তোমরা কথা রাখতে পার, আর আমি বুঝি পারি নে? আমি একাই পাল্কিতে যাচ্ছি।

আমাকে নিয়ে চল। ওরা সব পরে যাবে।” তখন আমরা হার মানিয়া বলিলাম, “না, মা, তা কি হয়? এই বাদলে কেউ বাড়ীর বার হতে পারছে না, আর আপনাকে ভিজিয়ে নিয়ে গিয়ে কি অসুখ করাব?” তখন কালী মামা ও মা খুব হাসিতে লাগিলেন। আমরা পাল্কি লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু মা তাহার পরেই অসুস্থ হইয়া পড়ায় কয়েক মাস পরে কোয়ালপাড়া আসেন। একদিন বেলা এগারটা আন্দাজ 'জগদম্বা আশ্রমে' গিয়া দেখি মেয়েরা সব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কেদার বাবুর মা আস্তে আস্তে বলিতেছেন, “মায়ের ভাবসমাধি হয়েছে। 'ঠাকুর'—এই কথাটি বলেই অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন।” মেয়েরা মাথায় ও চোখে জল দিতে লাগিলেন। কিছু পরে মা সুস্থ হইলে নলিনী দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিসীমা, অমন হলে কেন?” মা বলিলেন, “কই, কি হল? ও কিছু না, তোদের ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।” মায়ের এই কথা শুনিয়া আর কেহ উচ্চবাচ্য করিলেন না।

পরে এই ভাবসমাধির ঘটনাটি মা উদ্বোধনে তাঁহার শেষ অসুখের সময় আমাকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন। সেদিন বেলা দেড়টা-দুটার সময় জ্বর বাড়িতেছে; আমি নিত্যকার মত তাঁহার বিছানার পাশে বসিয়া তাঁহাকে

হাওয়া করিতেছি ও কপালে ভিজা হাত বুলাইয়া দিতেছি। মা আমার পিঠে ও বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "শরীরটা চলে গেলে তোমাদের খুব কষ্ট হবে, বুঝতে পাচ্ছি।" আমি বলিলাম, "মা, ও কি সব কথা বলছেন? ওষুধেও যখন তেমন ফল হচ্ছে না, আপনি ঠাকুরকে শরীরটার জন্যে একটু জানান না। তা হলেই ত সব সেরে যায়।" মা সামান্য হাসিয়া বলিতেছেন, "কোয়ালপাড়াতে অত জ্বর হত, বেহুঁশ হয়ে বিছানাতেই অসামাল হয়ে পড়তাম; কিন্তু হুঁশ হলে শরীরটার জন্যে যখনই তাঁকে স্মরণ করতাম তখনই তাঁর দর্শন পেতাম। দুর্ব্বল শরীরে একদিন বারান্দায় বসে আছি; নলিনীরা কি সেলাই করছে; খুব রোদ, চার দিক খাঁ খাঁ করছে। দেখি যেন সদর দরজা দিয়ে ঠাকুর এসে ঠাণ্ডা বারান্দায় বসে শুয়ে পড়েছেন। আমি তাই দেখে তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল পেতে দিতে গেছি। পেতে দিতে গিয়ে কেমন হয়ে গেলাম। কেদারের মা-টা সব নানারকম গোলমাল করতে লাগল। তাই তাদের বলেছিলাম, 'ও কিছু না, ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে মাথাটা কেমন হয়ে গেল!' তোমাদের দিকে চেয়ে শরীরটার জন্যে ঠাকুরকে কি মাঝে মাঝে না জানাচ্ছি? কিন্তু শরীরটার জন্যে যখন তাঁকে স্মরণ করি, কিছুতেই তাঁর দর্শন

পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছা নয় যে শরীরটা থাকে। শরৎ রইল।” পরে কোয়ালপাড়ায় ফিরিয়া আসিয়া কেদার মহারাজের মায়ের নিকটও ঠিক ঐরূপ শুনিলাম। মা তাঁহাকেও ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

একদিন বেলা দুইটার সময় কোয়ালপাড়া পোঁছিয়াছি। খুব গরম। মা একটু মিষ্টি ও জল আনাইয়া দিয়া বলিতে-ছেন, “বড় রোদ বাবা, একটু ঠাণ্ডা হও; বেলা পড়লে বেরিও। গোপেশ কেমন আছে? আজ কি খেলে? কি রান্না করলে? যাবার সময় কিছু ফল ও আনাজ নিয়ে যেও।” আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, “গোপেশদার কথামত কাঁচকলা আলু প্রভৃতি খোসাসুদ্ধ সব একসঙ্গে মিশিয়ে ঝোল ও আলুভাতে রেঁধেছিলাম। কিন্তু আন্দাজ করতে না পারায় আট-দশ জনের মত তরকারি রাঁধা হয়েছিল।” শুনিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন। এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় আকাশে খুব মেঘ হইল। মা বলিতেছেন, “আঃ, একটু বৃষ্টি হলে ধরিত্রীটা ঠাণ্ডা হয়।” কিয়ৎক্ষণ পরেই ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। মা আনন্দ করিতে করিতে দু’-একটি শিল মুখে দিলেন। কিন্তু উহাতেই ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার আবার জ্বর হয় এবং সেই জ্বর পরে খুব ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল।

রাসবিহারী মহারাজ ও আমি একদিন তাঁহার বিছানার

দুই পাশে বসিয়া আছি। মা আমাদের বুকে পিঠে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, "আঃ, এতগুলো মেয়ে, কারো গা ঠাণ্ডা নয়। এরা বেটা ছেলে, কেমন ঠাণ্ডা দেহ। আমার হাত জুড়াল!" অসুখের ঘোরে মা পূজনীয় শরৎ মহারাজকে খুব খুঁজিতেন। তিনি সংবাদ পাইয়া ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং একেবারে মায়ের শয্যাপার্শ্বে গেলেন। মা তখন গাত্রদাহের জন্য ছটফট করিয়া হাত বাড়াইতেছেন। তাহা দেখিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ গায়ের জামা খুলিয়া তাঁহার বিছানাতে গিয়া বসিলেন। মা তাঁহার পিঠে হাত দিয়া বলিতেছেন, "আঃ, আমার সমস্ত দেহটা ঠাণ্ডা হল। শরতের গাটি যেন পাথর।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "এই ত, মা, আমরা সব এসে পড়েছি, এখন সেরে উঠুন।" মা বলিলেন, "হাঁ, বাবা, কাঞ্জিলাল একটু ওষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাব।" এই কথা শুনিয়া শরৎ মহারাজের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কয়েক দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িয়া গেল ও মা অন্নপথ্য করিলেন। শরৎ মহারাজ একদিন মাকে বলিলেন, "মা, এবার আর আপনাকে ছেড়ে যাব না; আমি সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যাব।" মাও বিশেষ আপত্তি না করিয়া বলিলেন, "কিন্তু বাবা, একবার জয়রামবাটী গিয়ে যাত্রাটা বদলে আসতে হবে।"

শরৎ মহারাজ তাহাতেই রাজী হইলেন ও জয়রামবাটী যাত্রার দিন দেখিতে লাগিলেন।

মায়ের অসুখের সময়েই উদ্বোধনে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের দেহত্যাগ হয়। পরে ঐ প্রসঙ্গে মা একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহার ভগিনী ও নিবেদিতা স্কুলের পরিচালিকা শ্রীমতী সুধীরা সে সময় স্থিরভাবে পাশেই বসিয়াছিলেন। শুনিয়া মা বলিলেন, "আহা, একটু ডাক ছেড়ে কাঁদলে শোকটার কিছু লাঘব হত। দেখ, ওর আবার কোন অসুখ-বিসুখ না হয়। একেই হার্টের দোষ আছে।"

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পরিতেছে। আমি তখন মায়ের নিকট জয়রামবাটীতে আছি। একদিন কোয়ালপাড়া হইতে কতকগুলি জিনিস এক বৃদ্ধা মজুরনীর মাথায় দিয়া বেলা দশটা আন্দাজ জয়রামবাটী ফিরিয়াছি। বৃদ্ধা মোট নামাইয়া মাকে প্রণাম করিল। মা বলিতেছেন, "মাঝি বউ, কই অনেক দিন তুমি আর আস নি কেন?" তখন বৃদ্ধা করুণস্বরে বলিল, "মা, আজকাল বড় কষ্টে পড়েছি। নানা স্থানে অন্নের চেষ্টায় বেড়াই। এখানে মোট নিয়ে আসবার দরবার হলে বাবুরা সব সময়ে আমার দেখা পায় না। কিছুদিন হল আমার জোয়ান রোজগারী ছেলেটি মারা গেছে।"

মা তাহা শুনিয়া বলিলেন, "বল কি মাঝি বউ!" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা মায়ের সহানুভূতি পাইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাও তাহার কাছে বসিয়া পড়িয়া বারান্দার খুঁটিতে মাথা রাখিয়া তাহার সহিত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্না শুনিয়া বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিলেন এবং এই দৃশ্য দেখিয়া দূরে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিল। পরে কান্নার বেগ কমিয়া আসিলে মা ধীরে ধীরে নবাসনের বউদিদিকে নারিকেল তেল আনিতে বলিলেন। তেল আনা হইলে তিনি উহা বৃদ্ধার মাথায় ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা এক-মাথা তেল মাখিলে পর মা তাহার কাপড়ে মুড়ি ও গুড় দিয়া বিদায় দিবার সময় ছলছল নেত্রে বলিলেন, "আবার এসো, মাঝি বউ।" মায়ের এই করুণ ব্যবহারে বৃদ্ধা কিরূপ সান্ত্বনা পাইয়া গেল তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

একটু বল পাইলে মা নির্দ্দিষ্ট দিনে শরৎ মহারাজ প্রভৃতিকে লইয়া জয়রামবাটীতে পৌঁছিলেন। গ্রামের সব স্ত্রী-পুরুষ মাকে দেখিতে আসিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "মা, আমরা যে আর আপনাকে দেখতে পাব,

এ আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।” মা বলিলেন, “হাঁ, খুব অসুখটায় ভুগলাম। শরৎ, কাঞ্জিলাল, সব এসে পড়ল ; মা সিংহবাহিনীর কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলাম। শরৎ বলছে কলকাতায় যেতে। তা তোমরা সকলে মত কর ত গিয়ে শরীরটা একটু সেরে আসি।” সকলে আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইলেন। সাত-আট দিন পরে মা কলিকাতা রওয়ানা হইলেন।

কয়েক মাস পরে বেলুড় মঠে আসিয়া আছি। ‘উদ্বোধনে’ রাধুর অসুখ। কোনও শব্দ সহ্য হয় না। সেই জন্য মা তাহাকে লইয়া নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-বাড়ীতে আছেন। প্রায়ই সেখানে গিয়া দেখা করিয়া আসি। তিনি খুবই চিন্তিত। বলেন, “তাই ত, একে নিয়ে কোথায় যাই? দেশে নির্জ্জন হলেও ডাক্তার-কবিরাজের ত তেমন সুবিধা নেই।”

স্বামিজীর উৎসবের দিন দুপুরবেলা হঠাৎ শুনিলাম, মা কল্য সকালে দেশে চলিয়া যাইতেছেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজের আদেশে তাড়াতাড়ি মায়ের সঙ্গে যাইবার জন্য সন্ধ্যার সময় ‘উদ্বোধনে’ আসিলাম। উপরে গিয়া দেখি মা কিছু নারিকেল-দড়ি গুছাইতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, “এই অগাধ দরিয়া নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তোমার আমার সঙ্গে যাবার কি হবে? তোমরাই

সেখানে আমার ভরসা।” আমি প্রণাম করিয়া বলিলাম, “আপনি যখন যা আদেশ করবেন তাই হবে। আপনার সঙ্গে যাব, তাতে আর আপত্তি কি?” মা বলিলেন, “তাই বল, বাবা। এই দড়ি-টড়ি দেখে নিয়ে জিনিস-পত্র সব গুছিয়ে বেঁধে ফেল, এখনও কিছুই গোছান হয় নি। তোমার অপেক্ষায় বসে থেকে দড়ি গোছাচ্ছিলাম।” রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত মায়ের সহিত বিছানাপত্র সব বাঁধিলাম। পরদিন খুব সকালে তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলাম।

বিষ্ণুপুরে তিন দিন বিশ্রাম করিয়া আমরা প্রত্যূষে ছয়খানি গরুর গাড়ীতে রওয়ানা হইলাম। আট মাইল দূরে জয়পুর গ্রামে এক চটিতে রন্ধনের ব্যবস্থা হইল। উনুন হইতে নামাইবার সময় হাঁড়িটি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভাত ও ফেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। মা কিন্তু আদৌ বিচলিত না হইয়া একটি খড়ের নুড়ো লইয়া ফেনগুলি সব সরাইয়া দিতে লাগিলেন। তারপর হাত ধুইয়া বাক্স হইতে ঠাকুরের ছবিখানি বাহির করিয়া একধারে বসাইলেন এবং একটি শালের কাঠির দ্বারা উহা হইতে কতকগুলি ভাত পৃথক করিয়া একখানি শালপাতায় ডাল, তরকারি সাজাইয়া ঠাকুরকে জোড়হাতে বলিতেছেন,

"আজ এইরূপেই মেপেছ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির গরম গরম দুটি খেয়ে নাও।" আমরা সকলে মায়ের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যখন যেমন তখন তেমন ত করতে হবে। নাও, তোমরা সব এখন বসে যাও দেখি।" তখন আমরা সকলে চারিধারে বসিয়া গেলাম। মা কাঠিতে করিয়া আমাদের পাতায় পাতায় পরিবেশন করিয়া নিজেও একধারে পা মেলিয়া বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন ও বলিলেন, "বেশ রান্না হয়েছে।" আহারাদি সারিয়াই গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। রাত্রি প্রায় এগারটায় আমরা কোয়ালপাড়া পৌঁছিলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একবার পূজনীয়া গৌরী-মা মাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যাইতেছেন। কোয়ালপাড়া হইতে আমাকে সঙ্গে লইয়া বিকালে রওয়ানা হইলেন। জয়রামবাটীর কাছে নদীর ধারে পৌঁছিয়া কিছু বেলা আছে দেখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার একটু পরে মায়ের সদর দরজায় পৌঁছিয়া আমাকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি একটু ভিতরে ঢুকিলেন ও ভিখারীদের অনুকরণে বলিয়া উঠিলেন, "মা, দুটি ভিক্ষা পাই, মা।" তাহা শুনিয়া ছোট মামী বাহিরে আসিয়া বলিতেছেন, "কে গো?"

তখন গৌরী-মা আবার বলিয়া উঠিলেন, "দুটি ভিক্ষা পাই, মা।" ছোট মামী তখন খুব ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া একেবারে মায়ের কাছে ছুটিয়া গেলেন। মা চীৎকার শুনিয়া ধীরভাবে বাহির হইয়া আসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন, "কে রে?" গৌরী-মা পূর্ব্ব স্থানেই দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দুটি ভিক্ষা পাই মা, আমি রাতভিখারী।" অন্ধকারে মা গৌরী-মার গলার আওয়াজ পাইয়া বলিলেন, "ও গৌরদাসী, এস এস, কখন এলে?" তারপর খুব রহস্য হইতে লাগিল।

কোয়ালপাড়ায় দুই-এক দিন থাকিবার পর রাধুর ঐ স্থানটি বেশ নির্জ্জন বলিয়া পছন্দ হওয়ায় মা ছয় মাস তাহাকে লইয়া থাকিয়া যান। জগদম্বা আশ্রম হইতে কিছু দূরে অপর একটি নির্জ্জন বাড়ীতে রাধুর থাকিবার ব্যবস্থা হয়। উহার তিনদিকে কাঁটাগাছের জঙ্গল ছিল। মা একদিন আমাকে বলিলেন, "আজকাল মনের কি যে হয়েছে, যা চিন্তা ওঠে তাই উপস্থিত হয়—তা ভালই হোক, আর মন্দই হোক। রাধুর ত এই জঙ্গলটাই পছন্দ, নির্জ্জন কিনা। আমার কদিন থেকে মনে হচ্ছে, সারাদিন কাজকর্ম্মে বাইরে যাওয়া-আসা কর, সন্ধ্যার সময় থেকে কিন্তু এইখানে এসে আমার কাছেই থেকো। বড় ভয় হয়, বাবা। রাজেনকেও

বলেছি। সে রাত দশটা-এগারটার পর আসবে।” সেই দিন হইতে রাধুর বাড়ীর বাহিরে একটি কদ্‌বেল-গাছের তলায় সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত চৌকী পাতিয়া বসিয়া থাকিতাম। মাও বসিয়া থাকিতেন এবং খুব আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন। মা একদিন বলিতেছিন, “যে জঙ্গল! কোন্ দিন ভালুক না বেরিয়ে পড়ে।” আমি বলিলাম, “কই মা, এদিকে ত কখনও ভালুক দেখি নি।” কিন্তু সত্যই দুই-এক দিন পরে দুপুরবেলায় শোনা গেল, এক মাইল দূরে দেশড়ার মাঠে একটি প্রকাণ্ড ভালুক গোবর কুড়াইবার সময় একটি বৃদ্ধাকে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ভালুকটিকেও গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় মা বলিলেন, “দেখলে আজ ভালুকের কাণ্ড! অম্বিকের (জয়রামবাটীর চৌকীদার) শাশুড়ীকে নাকি মেরে ফেলেছে। তুমি যে বলছিলে এদেশে ভালুক নেই!”

সন্ধ্যার সময়ে মা একটু মিষ্টি খাইয়া জল খাইতেন। আমি ঐ গাছতলায় আসিলে আমাকেও খাইতে দিতেন। বলিতেন, “সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় একটু কিছু খেয়ে জল খেলে শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ হয়। তার পর জপতপে বা যে-কোন কাজে মনটি বেশ স্থির হয়ে বসে।” একদিন বলিতেছেন, “ঠাকুরের সেবার

জন্যে যখন নবতখানায় ছিলাম তখন কি কষ্টেই না ছোট ঘরখানিতে থাকতে হত! তারই ভিতর কত সব জিনিসপত্র। ঠাকুরের জন্যে হাঁড়িতে মাছ জিইয়ে রাখতাম। তাঁর সেবার জন্যে কোন কষ্টই গায়ে লাগত না। কোথায় দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত। আর এখন পড়েছি রাধুর জন্যে এই কষ্টে। জঙ্গলে তোমাদের নিয়ে বসে আছি। ধর্ম্মকর্ম্ম, জপতপ, সব গেল। এখন তাঁর কৃপায় ভালয় ভালয় উদ্ধার হলে হয় (রাধু তখন আসন্নপ্রসবা)।" একটু পরে নবাসনের বউদিদি আসিয়া বলিতেছেন, "ও দাদা, শুনেছেন? আজ তুপুরে এখানে মা ও আমি বসে আছি, বেশ নির্জ্জন। মা বলছেন, 'সেই কাক তুটি কদিন এই সময়ে এসে এই গাছে বড় চীৎকার করত। রাধুও বড় বিরক্ত হত। কিন্তু কই, আজ কদিন থেকে তাদের দেখতে পাচ্ছি নি। কোথায় গেল সে তুটি, বল ত?' মা এই কথা বলতে না বলতে কাক তুটি এসে গাছে ডেকে উঠল।" মাও হাসিয়া "হাঁ, বাবা" বলিয়া ঐ কথার সমর্থন করিলেন।

আর একদিন আষাঢ়ের প্রথম ভাগে মা ও আমরা কয়েক জন গাছতলায় বসিয়া আছি। রাত্রি দশটা হইবে। মা হঠাৎ বলিতেছেন, "দেখ, সেই পাগলটি কই অনেক দিন আসে নি। বদ্ধ পাগল। গান-টানগুলি কিন্তু বেশ গায়।

তবে বড় ভয় করে, বাবা, পাছে এখানে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ওঠে !” তখন নবাসনের বউদিদি বলিতেছেন, “আর তার নাম কেন, মা ? যদি এখন এসে পড়ে এই রাত্রিবেলায় !” মা বলিতেছেন, “কে জানে, মা।” “হাঁ, তুমিও যেমন ; এই বাদলে নদী পার হবে কি করে, যে আসবে ?”—আমি এই কথা বলিতে না বলিতে পাগলটি একটি তালপাতার পেখে মাথায় দিয়া এক বোঝা সজিনাশাক বগলে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও মাকে বলিল, “তোমার জন্য সজনেশাক নিয়ে এলাম।” নবাসনের বউদিদি ভয় পাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। মা বলিলেন, “যা, যা, এত রাতে গোল করিস নি।” সে বলিল, “যাব কি করে ? নদীতে বান যে।” আমি বলিলাম, “এলি কি করে ?” সে বলিল, “সাঁতরে পার হয়ে এসেছি।” মা তাহাকে বলিলেন, “লক্ষ্মীটি, গোল করিস নি।” সে তখন আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। মাস দুই মায়ের এই ভাবটা ছিল।

ঐ সময়ে একদিন রাধুর ঘরের বারান্দায় মার নিকট বসিয়া বাজারের ফর্দ্দ লিখিতেছি। পাশ দিয়া যাইবার সময় অসাবধানতাবশতঃ জনৈক স্ত্রীভক্তের কাপড়ের আঁচল আমার পিঠে একটু লাগিয়া যায়। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত স্ত্রীলোকটিকে বলিতেছেন, “কিগো, ছেলে আমার সামনে বসে লিখছে, বেটা ছেলে,

তোমার একটু হুঁশ নেই—ওর পিঠে আঁচল লাগিয়ে যাচ্ছ! ওরা ব্রহ্মচারী, তোমরা মেয়েমানুষ, ওদের সমীহ করে চলতে হয়, প্রণাম কর” ইত্যাদি। কথাগুলি মা এমন তেজের সহিত বলিলেন যে বাড়ীর সকল মেয়েরাও সন্ত্রস্ত হইলেন।

একটি নূতন ব্রহ্মচারী কোয়ালপাড়ায় মায়ের কাছে কিছু দিন থাকিতে চাহিলে মা বলিলেন, “তুমি থাকতে চাচ্ছ; কিন্তু তোমার এখানে থেকে কষ্ট হবে। আমার এখানে বড় কাজকর্ম্ম। রাধুকে নিয়ে এই জঙ্গলে পড়ে আছি।” ছেলেটি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় মা বলিলেন, “আচ্ছা, কেদারকে বলে আশ্রমে দিন কতক থাক, তার পর দেখা যাবে।” ঐ সময়ে যে সেবকটি রাধুর পথ্য তৈয়ার করিত তাহাকে কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় যাইতে হইল। মা ঐ ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এটি পারবে, বাবা?” সে সম্মত হইলে বলিলেন, “ওদের কাছে সব দেখে শুনে নাও।” প্রথম দিনেই পথ্য প্রস্তুত করিয়া মায়ের নিকট লইয়া যাইবার সময় তাহার হাত হইতে সব পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তখন কি করা উচিত ঠিক করিতে না পারিয়া সে খালি পাত্রগুলি মায়ের নিকট উপস্থিত করে। সে দিন আর রাধুর খাওয়া হইল না। মা বিরক্ত হইলেন। পরে বলিয়াছিলেন,

"সাধু হিসাবে ত ছেলেটি বেশ ভালই। তবে আমার এখানে কাজকর্ম্মে চৌকশ লোক চাই। 'গাছতলার সাধু' দিয়ে আমার কাজ হবে না। আবার হুজুগে পড়েও অনেকে অনেক বড় বড় কাজ করে ফেলে। কিন্তু মানুষের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজটিতে শ্রদ্ধা দেখলে ঠিক ঠিক মানুষটি চেনা যায়।" দুই-এক দিন পরেই সেবকটি ফিরিয়া আসায় ছেলেটির ওখানে থাকা হইল না।

আর একদিন কোয়ালপাড়ায় একটি ছেলে পুলিশের নজরবন্দি হইতে মুক্তি পাইয়া মার নিকট সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হয় ও দীক্ষা লইবার অভিপ্রায় জানায়। তখন ওখানকার আশ্রমের উপর পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকায় আশ্রমাধ্যক্ষ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। মা এই সংবাদ পাইয়া আমাকে বলিলেন, "আহা, ছেলেটি কত কষ্ট পেয়ে ব্যাকুল হয়ে এসেছে! তুমি যদি আজ রাত্রিটা গ্রামের কোন লোকের বাড়ীতে তাকে রাখবার ব্যবস্থা করতে পার তবে কাল সকালে আমি ওকে দীক্ষা দিয়ে চলে যেতে বলব।" তাঁহার ইঙ্গিত মত আমি তাহাকে একস্থানে রাখিয়া দিলাম।

পরদিন খুব সকালে মায়ের সহিত রাধুর বাড়ী যাইতেছি। ছেলেটি স্নান করিয়া মাঠের মাঝপথে মায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মা আমাকে নিকটবর্ত্তী

পুকুর হইতে একটু জল আনিতে বলিলেন। আমি একটা গেলাসে জল আনিয়া দিলে মা যেন আসন খুঁজিতেছেন মনে হওয়ায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আসন এনে দেব কি?" মা বলিলেন, "থাক্, আর যেতে হবে না, তুটো খড় দাও, আমরা তুজনে বসি।" আমি ঐরূপ করিলে তাঁহারা ঐ খড় পাতিয়া মাটীতে বসিলেন এবং আমাকে একটু তফাতে থাকিতে বলিয়া মা আচমন করিয়া ছেলেটিকে দীক্ষা দিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় মা কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন, "আমি আর কারও দোষ দেখতে শুনতে পারি নে, বাবা, প্রারব্ধ কর্ম্ম যার যা আছে। যেখানে ফালটি যেত সেখানে ছুঁচটি ত যাবে? আমার কাছে —র দোষের কথা বললে। তখন এরা সব কোথায় ছিল? সে আমার কত সেবা করেছে। আমি ত তখন ভাইদের ঘরে ধান সিদ্ধ করি। বউরা সব ছোট। সে শীত-বর্ষা গ্রাহ্য না করে সকাল থেকে গায়ে কালি মেখে আমার সঙ্গে বড় বড় ধানের হাঁড়ি নামাত। এখন ত অনেকে ভক্ত হয়ে আসে। তখন আমার কে ছিল! আমরা কি সেগুলো সব ভুলে যাব? তা লোকেরই বা দোষ কি? আমারও আগে লোকের কত দোষ চোখে ঠেকত। তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে 'ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারি নে' বলে কত প্রার্থনা

করে তবে দোষ-দেখাটা গেছে। মানুষের হাজার উপকার করে একটু দোষ কর, মুখটি তখনই বেঁকে যাবে। লোক কেবল দোষটি দেখে। গুণটি দেখা চাই।"

জয়রামবাটীতে একদিন মহাপুরুষদের সেবকগণের দুর্ব্বুদ্ধি-প্রসঙ্গে মা বলিলেন, "দেখ, সেবাপরাধ একটা আছে বটে। সেটা হচ্ছে—সেবা করতে করতে অধিকার পেয়ে অহংবুদ্ধি বেড়ে গেলে সে তখন পুতুলের মত নাচাতে চায়। উঠতে, বসতে, খেতে, সব তাতেই কর্ত্তা। সেবার ভাব আর থাকে না। যারা নিজের দেহসুখ ভুলে তাঁর সুখদুঃখ নিজের সুখদুঃখ জ্ঞান করে সেবা করে, তাদের ওরূপ হবে কেন? আর পতনের কথা বলছ? অনেক মহাপুরুষদের চারদিকে ঐশ্বর্য্যের ভাব থাকে। তাই দেখে অনেকে তাঁদের সেবা করতে এসে ওতেই মত্ত থাকে, আর পরে ওতেই ডুবে মরে। ঠিক ঠিক তাঁর সেবা করে কজন, বল?" তারপর মা একটি গল্প বলিলেন, "দেখ, কথায় আছে যে, পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাই দেখে ছোট ছোট মাছেরা আনন্দে সেইখানে খুব লাফালাফি করে খেলা করছে—ভাবছে আমাদেরই একজন। কিন্তু যখন চাঁদ অস্ত গেল তখন তাদের সেই পূর্ব্ব অবস্থা। লাফালাফির পর অবসাদ এল—কিছুই বুঝতে পারলে না।" আমি বলিলাম, "কেদার মহারাজ বলেন যে, গুরুর কাছে

বেশী দিন থাকতে নেই। গুরুর অলৌকিক আচরণ দেখে অনেক সময়ে শিষ্যের নাকি ভক্তিশ্রদ্ধা কমে যায়।" মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "তোমরা বাবা, ওসব কথায় মন খারাপ করো না। তা হলে আমার কাজ চলে কি করে? অত ভগবানবুদ্ধি না করে মানুষবুদ্ধিতে আমি যা বলি দেখে শুনে, কাজগুলি যা করছ করে যাও। তোমাদের কোন ভয় নেই।"

একদিন ভক্তদের অনেকগুলি পত্র আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় মাকে পড়িয়া শুনাইলাম। পত্র শুনিয়া মা বলিতেছেন, "কতরকম সব ছেলেরা কত কি ইচ্ছা লিখেছে, দেখলে? কেউ বলছে, 'এত করে প্রার্থনা, জপধ্যান করছি, কিছুই হচ্ছে না'; কেউ বা সংসারে নানা অশান্তি, অনটন, রোগশোকের কথা লিখেছে। আর এ সব শুনতে পারি নে। ঠাকুরকে বলি, 'ঠাকুর, এদের ইহকাল পরকাল তুমিই রক্ষা করো।' আমি মা হয়ে আর কি বলব? কজন তাঁকে ঠিক ঠিক চায়? সে ব্যাকুলতা কোথায়? এত ত ভক্তি, আগ্রহ—এদিকে সামান্য একটু ভোগ্যবস্তু পেলেই সন্তুষ্ট! বলে, 'আহা, তাঁর কি দয়া!' বলে, 'রাধু কেমন আছে?' আমার মন ভেজাবার জন্যে রাধুর খোঁজ আগে। আমি চোখ বুঁজলে রাধুর দিকে কেউ ফিরেও চাইবে না।" নবাসনের বউদিদি

বলিতেছেন, "মা, আপনার ত সব ছেলেরা সমান; যে বিয়ে করার মতামত চেয়েছে তাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন, আর যে সংসারত্যাগ করতে চায় তাকে সেইমত ত্যাগের প্রশংসা করে উপদেশ দিচ্ছেন। আপনার ত উচিত যেটি ভাল সেই পথেই সকলকে নিয়ে যাওয়া।" মা বলিতেছেন, "যার ভোগবাসনা প্রবল, আমি নিষেধ করলেই কি সে শুনবে? আর যে বহু সুকৃতিবলে এই সব মায়ার খেলা বুঝতে পেরে তাঁকেই একমাত্র সার ভেবেছে, তাকে একটু সাহায্য করব না! সংসারে দুঃখের কি অন্ত আছে?"

নলিনী দিদি প্রভৃতি কয়েকজন কিছুক্ষণ তর্কের পর মাকে বলিতেছেন, "পিসীমা, বল ত কোন্ অপবাদ ভাল?" মা বলিতেছেন, "অপবাদের আবার ভাল মন্দ!" এইরূপ একটু কথাবার্ত্তার পর বলিতেছেন, "তবে ধনের অপবাদই ভাল। কোন লোককে যদি বলা যায়, 'তুমি বেশ ধনী,' সে তা শুনে মুখে দীনতা বা অসন্তোষ যাই দেখাক না কেন, তার অন্তরটি বেশ খুশী হয়।" এই কথা বলিয়া মা বলিতেছেন, "এ ত হল। আচ্ছা, তোরা বল্ দেখি কোন্ জিনিসটা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়?" নলিনী দিদি বলিতেছেন, "কেন, পিসীমা, জ্ঞান, ভক্তি, মানুষ যাতে সংসারে সুখে থাকে, এই

সব প্রার্থনা করতে হয়।” মা বলিতেছেন, “এক কথায় বলতে গেলে, নির্ব্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেননা বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বারবার জন্মমৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।”

শ্রাবণ মাসে মা রাধুকে লইয়া কোয়ালপাড়া হইতে জয়রামবাটী আসিয়াছেন। তখন তাঁহার সংসারে আমরা পনর-কুড়ি জন লোক। সকলের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সব বিষয় মা নিজেই তত্ত্বাবধান করিতেছেন, একদিন কথাপ্রসঙ্গে মা আমাকে বলিতেছেন, “বাবা, সেদিন — আমাকে কি কথাটাই বললে। আমি জানতাম ওর খুব উদার মন। ওর মত লোকের ও কথাটা বলা মোটেই ভাল হয় নি। আমি তার মনের ভাব বুঝে আসবার সময় এক মরাই ধান আশ্রমের খরচের জন্যে দিয়ে এলুম।* তা তখন আর নিতে চায় নি—নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এল।” এই বলিয়া মা সমস্ত ঘটনাটি বলিলেন, “সেদিন সকালে প্রণাম করতে এসে বলছে, ‘মা, এরা সব আগে আমার খুব বাধ্য ছিল, এখন চোখ ফুটেছে, আমার কথা সব সময় মেনে থাকতে চায় না। আর শরৎ মহারাজ বা আপনাদের কাছে গেলে

* পরে ঐ ধানগুলির চাউল করিয়া মাকেই পাঠান হয়, এবং— অনুতপ্ত হইয়া মায়ের নিকট বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

আপনারা আদরযত্ন করে কাছে রেখে দেন। ভাল খাবারও সুবিধা পায়। আপনারা যদি স্থান না দেন, একটু বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেন, তবে আমার বাধ্য থাকবে।' আমি বললাম, 'সেকি গো? ও সব কি কথা বলছ? ভালবাসাই ত আমাদের আসল। ভালবাসাতেই ত তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে। আর আমি মা, আমার কাছে তুমি ছেলেদের খাওয়া-পরার খোঁটা দিয়ে কি করে বললে?' আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে ত আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর সব ছেলেরা সংসারত্যাগ করে কয়েক দিন একটা আশ্রয় করে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তা হলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর ত অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে

বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসার-তাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এই জন্যই ত তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ান দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠে।' তার পর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এই সব করলে।"

জয়রামবাটীতে দুর্গাপূজার সময় অষ্টমীর দিন একটি ভক্ত কতকগুলি পদ্মফুল একটি ঝুড়িতে লইয়া আসিতেছেন। দূর হইতে আমাকে দেখিয়া ফুলসমেত হাত তুলিয়া আমাকে নমস্কার করিলেন। মা দূর হইতে উহা দেখিয়া-ছিলেন। পরে আমাকে বলিলেন, "ঐ ফুল দিয়ে আর ঠাকুরের পূজো হবে না; ওগুলি ফেলে দিও।"

আমাদের দুজনের পরিধানে সাদাপাড় কাপড় দেখিয়া মা বলিলেন, "এ কি! সাদাপেড়ে কাপড় কেন পরেছ? তোমরা ছেলে মানুষ, পাড়দেওয়া কাপড় পরবে। নইলে মন বুড় হয়ে যাবে। মনে সর্ব্বদা উৎসাহ রাখতে হয়।" এই বলিয়া বাক্স হইতে দুজনকে দুখানি কাপড় বাহির করিয়া দিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার একটু পরেই সন্ধিপূজা। মায়ের

পায়ে পদ্মফুল দিয়া অনেকে পুষ্পাঞ্জলি দিলে মা বলিতেছেন, "আরও ফুল আন; রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, যোগেন, গোলাপ—এদের সব নাম করে ফুল দাও। আমার জানা-অজানা সকল ছেলেদের হয়ে ফুল দাও।" আমি ঐরূপ করিলে মা জোড়হাতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিতেছেন, "সকলের ইহকাল-পরকালের মঙ্গল হোক।"

কেদার মহারাজ একদিন সকালে জয়রামবাটীতে মায়ের নিকট বসিয়া বলিতেছেন, "মা, আমাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাদের অবস্থা ভাল তারাও সব ওষুধ নিতে আসে। আমরা ত গরীবদের জন্যেই করেছি। ঐ সমস্ত লোককে ওষুধ দেওয়া কি উচিত?" মা একটু থামিয়া বলিলেন, "বাবা, এদেশের সকলেই গরীব। তবে ওরা এই সব জেনেশুনেও যদি প্রার্থী হয়ে এসে দাঁড়ায়, সামর্থ্য থাকলে দেবে বই কি। যে প্রার্থী সেই গরীব।"

কেদার মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এবার কি ঠাকুর একটা নতুন জিনিস দিয়ে যাবার জন্যেই এসেছিলেন যে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করে গেলেন?" মা বলিলেন, "দেখ, বাবা, তিনি যে সমন্বয়-ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্ম্মমত সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু আমার মনে হয় নি। তিনি সর্ব্বদা ভগবদ্ভাবেই বিভোর থাকতেন। খ্রীষ্টানরা,

মুসলমানরা, বৈষ্ণবরা যে যে ভাবে তাঁকে ভজনা ক'রে বস্তুলাভ করে, তিনি সেই সেই ভাবে সাধনা ক'রে নানা লীলা আস্বাদ করতেন ও দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, কোনও হুঁশ থাকত না। তবে কি জান, বাবা, এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব। ও রকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখনও কেউ দেখেছে? সর্ব্বসমন্বয়-ভাবটী যা বললে, ওটিও ঠিক। অন্যান্য বারে একটা ভাবকেই বড় করায় অন্য সব ভাব চাপা পড়েছিল।"

সেদিন সন্ধ্যার পর নিত্যকার মত রুটি ইত্যাদি করিয়া ভক্তদের চিঠি পড়িয়া শুনাইতে মায়ের ঘরে গিয়াছি। একটি স্ত্রী-ভক্ত প্রায়ই পত্র দেন—মায়ের নানারূপ স্তবস্তুতিতে ভরা, তাহার পত্রের মর্ম্ম মাকে বলিলাম। মা সব শুনিয়া বলিতেছেন, "দেখ, অনেক সময় ভাবি যে আমি ত সেই রাম মুখুয্যের মেয়ে, আমার সমবয়সী আরও ত অনেক মেয়ে জয়রামবাটীতে আছে, তাদের সঙ্গে আমার তফাৎ কি? ভক্তেরা সব কোথা থেকে এসে প্রণাম করে। জিজ্ঞাসা করলে শুনি, কেউ হাকিম, কেউ উকীল। এরাই বা এমন আসে কেন?" মা ইহা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছু পরে আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আপনাদের কি সব সময়ে নিজের স্বরূপ মনে থাকে না?" মা বলিতেছেন, "তা কি সব সময়ে থাকে?

তাহলে কি এই সব কাজকর্ম্ম করা চলে? তবে কাজকর্ম্মের ভেতর যখন ইচ্ছা হয়, সামান্য চিন্তাতে দপ করে উদ্দীপনা হয়ে মহামায়ার খেলা সব বুঝতে পারা যায়।” একজন বলিলেন, “কই মা, আমরা ত এত চেষ্টাতেও কিছুই বুঝতে পারছি না।” মা বলিতেছেন, “হবে গো হবে, তোমাদের ভাবনা কি? কালে সব হবে।” সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। আমি বলিলাম, “মা, কেদার মহারাজ বলেন, এই সব কাজে কর্ম্মে খুব খাট, তাহলেই যা হবার আপনি হবে।” মা বলিলেন, “কাজকর্ম্ম করবে বই কি, কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে সমস্ত দিন ভালমন্দ কি করলাম না করলাম তার বিচার আসে। তারপর গতকালের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা করতে হয়। পরে জপ করতে করতে ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান করতে হয়। ধ্যানে প্রথমে মুখটি আসে বটে কিন্তু পা থেকে সমস্ত অঙ্গটি সাক্ষাৎ ধ্যান করতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা জপধ্যান না করলে কি করছ না করছ বুঝবে কি করে?” আমি বলিলাম, “কেউ কেউ আবার বলেন, কাজকর্ম্মে কিছু হবে না, সর্ব্বদা

জপধ্যান করতে পারলেই হবে।” মা বলিলেন, “তারা কি করে বুঝলে, কি করলে হবে, আর কি করলে হবে না? কয়েকদিন একটু জপধ্যান করলেই কি সব হয়ে গেল? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কিছুতেই কিছু হবার নয়। সেদিন দেখলে ত, একজন জোর করে জপধ্যান বেশী করে করতে গিয়ে মাথাটি বিগড়ে এলেন? মাথাটি যদি বিগড়াল ত আর রইল কি? ইস্ক্রুপের প্যাচের একটু এধার আর ওধার। এক প্যাঁচ আলগা হলেই হয় পাগল হল, না হয় মহামায়ার ফাঁদে পড়ে নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে মনে করে, আমি বেশ আছি। আর উলটো দিকে এক প্যাঁচ কসা হলেই ঠিক পথে চলে শান্তি ও আনন্দ পায়। সর্ব্বদা তাঁর স্মরণ মনন করে প্রার্থনা করতে হয়, ‘প্রভু সদ্বুদ্ধি দাও।’ সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে কজন? প্রথমটা একটু করে। শেষে ন—র মত বসে থেকে থেকে নীচের গরম মাথায় ওঠে (অহঙ্কারী হয়)। গাছ পাথর ভেবে নানা অশান্তি। মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার এই সব দেখেই ত নিষ্কাম কর্ম্মের পত্তন করলে।” মা ন—কে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিলেন, “দেখনা, বসে থেকে থেকে কি অশুদ্ধ মনই না হয়ে গেছে! কেবল

শুচিবাই বাড়ছে।' আর বলে, অশান্তি। অত অশান্তি কেন? এত দেখেশুনেও চৈতন্য হল না?"

পরদিন বেলা দশটা-এগারটার সময় মা সদর দরজার রোয়াকে বসিয়া আছেন। আমরা বৈঠকখানায় আছি। কালী মামা ও বরদা মামার মধ্যে রাস্তা লইয়া বচসা হইতে হইতে ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। মা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঁহাদের নিকট গেলেন। কখনও একজনকে বলিতেছেন, "তোর অন্যায়," কখনও অপরকে ধরিয়া টানিতেছেন। খুব মাতিয়া গিয়াছেন। ঐ সময় আমরাও গিয়া পড়ায় ঝগড়া একটু কমিল, এবং বকিতে বকিতে যে যার বাড়ী চলিয়া গেলেন। মাও সক্রোধে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিলেন। বসিয়াই হাসিতেছেন ও বলিতেছেন, "মহামায়ার কি মায়া গো! অনন্ত পৃথিবীটা পড়ে আছে, এও পড়ে থাকবে! জীব এইটুকু আর বুঝতে পারে না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মা হাসিয়া অস্থির—হাসি আর থামে না।

ছয়মাস হইল রাধুর সন্তান হইয়াছে, কিন্তু দুর্ব্বলতা-বশতঃ সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না। বসিয়া বসিয়াই চলাফেরা করে। আবার খুব আফিম খাওয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইদানীং মারও শরীর ভাল নয়, মাঝে মাঝে জ্বর হইতেছে। তিনি রাধুর আফিম

খাওয়াটা একটু কমাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা লইয়া রাধু সব সময়ে খুব জিদ করে। সেদিন সকালে মা তরকারি কুটিতেছেন। রাধু আফিমের জন্য আসিয়া বসিয়াছে। মা বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন, "রাধি, আর কেন, উঠে দাঁড়া না। তোকে নিয়ে আর পারি নে। তোর জন্যে আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সব গেল। এত খরচপত্র কোথা থেকে জোগাই বল্ ত?" এই সকল মৃদু রোষবাক্য বলাতে রাধু রাগিয়া গিয়া সামনের চুবড়ী হইতে একটা বড় বেগুন লইয়া মায়ের পিঠে জোরে ছুড়িয়া মারিল। গুম্ করিয়া শব্দ হইতেই দেখি, মা পিঠটা বাঁকাইয়া উঠিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটি ফুলিয়া উঠিল। মা ঠাকুরের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে বলিতেছেন, "ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না, ও অবোধ।" নিজের পায়ের ধূলা লইয়া রাধুর মাথায় দিতেছেন ও বলিতেছেন, "রাধি, এই শরীরকে ঠাকুর কোন দিন একটি শাসনবাক্য বলেন নি, আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস! তুই কি বুঝবি আমার স্থান কোথায়? তোদের নিয়ে পড়ে আছি বলে তোরা কি মনে করিস বল্ দেখি?" রাধু তখন কাঁদিয়া ফেলিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন ছোট মামী (রাধুর পাগলী মা) মনের খেয়ালে জামাই মন্মথকে নানা

স্থানে—এমন কি পুকুরে নামিয়া—খুঁজিয়া না পাইয়া স্থির করিলেন যে সে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। পরে ভাবিলেন, এ সব ঠাকুরঝির কাজ। তখন ছুটিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে মায়ের পায়ে পড়িয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া বলিতেছেন, "ওগো, ঠাকুরঝি গো, আমার জামাই বাঁড়ুয্যে পুকুরে ডুবে গেছে গো। কি হবে গো!" মা হঠাৎ ইহা শুনিয়া আমাদের ডাকিয়া কলিলেন, "শীগ্‌গির এস, পাগলী কি বলছে শোন," এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমরা ছুটিয়া আসিলাম। হরি বলিল, "মন্মথ বেণেদের দোকানে তাস খেলছে, দেখে এলাম।" মা বলিলেন, "শীগ্‌গির ছুটে খবর দিয়ে তাকে নিয়ে এস।" আমরা তৎক্ষণাৎ মন্মথকে লইয়া আসিলাম। তাহাকে দেখিয়া ছোটমামী অপ্রস্তুত হইয়া ক্রোধভরে বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন।

বিকালে মা রাত্রের কুটনো লইয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ ছোটমামী তাঁহার কাছে বসিয়া বলিতেছেন, "তুমিই ত রাধুকে আফিম খাইয়ে পঙ্গু করে বশ করে রেখেছ। আমার নাতিকে, আমার মেয়েকে আমার কাছে পর্য্যন্ত যেতে দাও না।" মা বলিতেছেন, "নিয়ে যা না তোর মেয়েকে, ঐ ত পড়ে আছে। আমি কি লুকিয়ে রেখেছি নাকি?" এইরূপ দুই-এক কথা হইতেই মামীর পাগলামি চরম

সীমায় উঠিয়াছে। মাকে মারিবার জন্য তিনি একখানি জ্বালানি কাঠ আনিতে ছুটিয়াছেন। মা তখন চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "ওগো কে আছ, পাগলী আমায় মেরে ফেললে!" আমি দৌড়িয়া গিয়া দেখি, কাঠখানি প্রায় মায়ের মাথায় ফেলেন আর কি! তাড়াতাড়ি উহা দূরে ফেলিয়া দিয়া মামীকে সদর দরজা পার করিয়া দিলাম। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে ভৎ´সনা করিয়া পুনরায় সে বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিলাম। মাও তখন উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "পাগলী, কি করতে বসেছিলি? ঐ হাত তোর খসে পড়বে।" ইহা বলিয়াই জিব কাটিয়া মা শিহরিয়া উঠিলেন। ঠাকুরের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে বলিতেছেন, "ঠাকুর, একি করলাম! এখন উপায় কি হবে? আমার মুখ দিয়ে কোনদিন ত কারও ওপর অভিসম্পাত-বাক্য বেরোয় নি; শেষটায় তাও হল? আর কেন?" মায়ের অপার করুণার ভাব দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

কয়েক মাস পূর্ব্বে ব্যাঙ্গালোরের শ্রীযুত ন— কিছুদিনের ছুটি লইয়া কোয়ালপাড়ায় মায়ের নিকট ছিলেন, এবং রাধুর জন্য মায়ের খুব খরচ হইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে প্রতি মাসে প্রচুর অর্থসাহায্য করিতেন। যাইবার সময় মাকে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, "মা, খরচপত্রের যখনই

অনটন পড়বে, কোনরূপ দ্বিধা না করে আমাকে যেন একটু জানান।" আজকাল জয়রামবাটীতে খরচ খুব বাড়িয়াছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন, যোগাড়যন্ত্র করিয়া সময়মত টাকা পাঠাইতে দেরী হইয়া যাইতেছে। এই পত্র শুনিয়া মা বলিতেছেন, "তাহলে শরতের হাতে আর বেশী টাকা নেই; নইলে সে অমন কথা লিখবে কেন? ন— সেদিন ঐ কথা বলে গেল। হাঁ গা, আমি তার কাছে কি বলে টাকা চাইব? ঠাকুর, তোমার শেষ আদেশটি কি রক্ষা করতে পারব না? রাধি, তোর জন্যে আমি সব খোয়াতে বসেছি। ঠাকুর বলেছিলেন, 'দেখ, কারও কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিৎহাত করো না; তোমার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। একটি পয়সার জন্যে যদি কারও কাছে হাত পাত, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে। বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয়। তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজেদের বাড়ীতে আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট করো না।' .

মনসা নামে একটি ছেলে মায়ের কাছে আসিয়াছে। দীক্ষা ও গৈরিক লওয়ার খুব ইচ্ছা। মাও তাহাকে আনন্দের সহিত উহা দিলেন। সে খুব আহ্লাদিত হইয়া

সন্ধ্যার সময় কালী মামার বৈঠকখানায় বসিয়া, "আর কিছু নাই সংসারের মাঝে, কেবল শ্যামা সার রে" এবং "মনছাঁচে তোমারে ফেলে, শ্যামা"—এই দুইটি গান গাহিল। মার খুব ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার কাছে বসিয়া রাধু, মাকু, নলিনী, মামীরা দু-এক জন এবং আরও অনেকে শুনিতেছিলেন। মামীদের মধ্যে একজন বলিলেন, "ঠাকুরঝি ঐ ছেলেটিকে সাধু করে দিলেন।" মাকু তাহাতে সায় দিয়া বলিল, "তাই বটে, পিসীমার যেমন কাজ! অমন সব ভাল ভাল ছেলেদের সাধু করে দিচ্ছেন। বাপ মা কত কষ্ট করে মানুষ করে মুখ চেয়ে আছে। তাদের কত আশা! সে সব চুরমার হয়ে গেল। এখন উনি হয় হৃষীকেশে গিয়ে ভিক্ষে করে খাবেন, না হয় রোগীর সেবায় মলমূত্র ঘাঁটবেন! বে থা করা—সেও ত একটা সংসারধর্ম্ম। তুমি যদি এ রকম সাধু করে দাও, মহামায়া তোমার উপর চটে যাবেন। সাধু হয়, নিজেরা হোকগে। তোমার নিমিত্ত হতে যাওয়া কেন, পিসীমা?" মা তখন বলিতে লাগিলেন, "মাকু, ওরা সব দেবশিশু। সংসারে ফুলের মত পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের কি আছে বল দেখি? সংসারে যে কি সুখ তা ত দেখছিস। স্বামী-সুখও দেখলি। এখন লজ্জা হয় না, আবার স্বামীর কাছে

যাস? এতদিন আমার কাছে থেকে কি দেখলি? এত আকর্ষণ, পশুভাব কেন? কি সুখ পাচ্ছিস? ফের যদি স্বামীর কাছে যাবি, দূর করে দেব। পবিত্র ভাবটা কি স্বপ্নেও তোদের ধারণা হয় না? এখনও কি ভাই-বোনের মত থাকতে পারিস নে? খালি শূয়োরের মত থাকতে চাস? তোদের সংসারের জ্বালায় আমার হাড় জ্বলে গেল।"* সকলে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

মা আবার বলিতেছেন, "ভগবানকে ডাকুক আর না ডাকুক, যে বে না করে সে ত অর্দ্ধমুক্ত। যে সময়ে ভগবানে একটু মন হবে, সে সময়ে হু-হু করে এগুতে থাকবে। আর যাদের মহাপাপ তারাই বিয়ে করে সংসার করে। ভগবানে মন হলেও কিছুতেই আর উঠতে পারে না। হাত-পা সব বাঁধা।"

আজকাল প্রায় প্রত্যহ মার সামান্য সমান্য জ্বর হইতেছে। শরীর খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ মাকে শীঘ্র কলিকাতায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তিনি বিশেষ কার্য্য উপলক্ষ্যে ৺কাশী গিয়াছেন। সেই সময় মাকে কলিকাতা যাইবার

* ইহার অল্প দিন পূর্ব্বে মাকুর একটি শিশুপুত্র মারা গিয়াছে এবং সম্প্রতি একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। রাধু তখনও অসুস্থ।

কথা বলাতে মা বলিতেছেন, "শরৎ কলকাতায় না থাকলে আমার সেখানে যাবার কথা উঠতেই পারে না। কার কাছে যাব? আমি সেখানে আছি আর শরৎ যদি বলে, 'মা, কয়েক দিন অন্যত্র যাচ্ছি,' তা হলে আমি বলব, 'একটু থাম বাবা, আমি আগে এখান থেকে পা বাড়াই, তারপর তুমি যাবে।' শরৎ ছাড়া আমার ঝক্কি কে পোয়াবে?"

তখন শীতকাল, মায়ের শরীরও এত খারাপ; তথাপি পূর্ব্ব অভ্যাস মত ভোর তিনটায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বিছানায় লেপমুড়ি দিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িতেন। সেই সময়ে আমরা তাঁহার ঘরে গিয়া অন্ধকারে দরজা বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতাম। মা হয়ত বলিতেছেন, "এই সময় এই দেবতার মন্ত্রটি এইভাবে জপ কর দেখি," ইত্যাদি। কিছু পরে কথা উঠিয়াছে, আমাদের সাধুরা অসুস্থ হইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে থাকে। মা বলিতেছেন, "অসুস্থ হয়েছে বলে গৃহস্থ-বাড়ীতে সন্ন্যাসী কেন থাকবে? মঠ রয়েছে, আশ্রম রয়েছে। সন্ন্যাসী ত্যাগের আদর্শ। কাঠের স্ত্রী-মূর্ত্তি পুতুল যদি রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, সন্ন্যাসী কখনও পায়ে করেও উলটে দর্শন করবে না। আর সন্ন্যাসীর অর্থ থাকা একান্ত খারাপ। চাকি (টাকা)

না করতে পারে এমন জিনিস নেই—প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত। পুরীতে একটি সাধু থাকত, সমুদ্রের ধারে। তার কিছু টাকা ছিল। তাই টের পেয়ে দুজন চেলা লোভ সামলাতে না পেরে সাধুটিকে খুন ক'রে টাকা নিয়ে চলে গেল।"

একদিন মা বেলা নয়টা-দশটার সময় বসিয়া তেল মাখিতেছেন। ঐ সময়ে একজন ঝাঁট দিয়া ঝাঁটাটি ছুড়িয়া একদিকে ফেলিয়া রাখিলেন। মা তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, "ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা করে ছুড়ে দিলে? ছুড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীর হয়ে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে। আবার ত ওটি দরকার হবে? তা ছাড়া, এ সংসারের ওটিও ত একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও ত ওর একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।"

একদিন রাধুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় মিনি বিড়ালটি উঠানের ধারে শুইয়া আছে। জনৈকা মহিলা দাঁড়াইয়া পা দিয়া তাহাকে অদর করিতেছেন। ক্রমে তাহার মাথায়ও পা দিয়াছেন। মা তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, "ও মা, ওকি করছ? মাথা যে গুরুর স্থান, মাথায় কি পা দিতে আছে?

নমস্কার কর।” উক্ত মহিলা বলিলেন, “তা ত কোন দিন জানি নি, মা। আজ জানলাম।”

সকালে কলিকাতা হইতে কয়েকটি ভক্ত আসিয়াছেন, বেশ ফিট্‌ফাট্‌। কাপড়-জামার খুব প্রাচুর্য্য। মায়ের জন্য ফল প্রভৃতি অনেক জিনিষ আনিয়াছেন। মা বিকালে আপন মনে বলিতেছেন, “সব জ্বালিয়ে খেলে! আর পারিনে। এক একটি ছেলে আসে, আমার সংসারটি যেন শান্তিপূর্ণ হয়ে যায়। কোথা থেকে সব তরিতরকারি জিনিষপত্রের যোগাযোগ হয়ে যায়। আমাকে কোন ভাবনা চিন্তা করতে হয় না। যা হল, মুখটি বুঁজে খেয়ে পাতাটি গুটিয়ে নিয়ে উঠে গেল। আহা, তাদের মুখের কথাটিতেও যেন প্রাণটি শীতল হয়! আর এই দেখ না, সকাল থেকে যেন উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। একগাদা ফল নিয়ে এল। তার অর্দ্ধেক পচে গোবর হয়ে গেছে। সেগুলি ফেলি কোথায় তা খুঁজে পাই নে। এদিকে অমন ফরসা কাপড়-চোপড়, বলে, ‘গামছা আনতে ভুলে গেছি।’ আমি গামছা পাই কোত্থেকে? তখন ত একটা দেখেশুনে দিলাম। এখন ভাবনা, রাত্রে কি যে তরকারি করি! আবার শুনছি, মশারির দড়ি নেই; হরি দড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর, তোমার সংসার তুমি দেখ গিয়ে। আমি ত আর পেরে উঠছি না। এদিকে রাঁধি, আর ওদিকে এই সব।”

ভক্তদের কেহ কেহ মাকে কত উত্যক্ত করিত তদ্বিষয়ে দুই-একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে।

মা তখন জয়রামবাটীতে। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে শ্যাম-বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বারান্দায় একখানা মাদুর পাতিয়া মা শুইয়া আছেন। আমি যাইতেই মা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা সব থাক, কিন্তু কাজকর্ম্মে বাইরেও যেতে হয়। আজ —র সঙ্গে একটা লোক এসেছিল ; বুড়ো গোছের। তাকে দূর থেকে দেখেই আমি ঘরের ভিতর চৌকিতে বসে রইলাম। সে বাইরে থেকে প্রণাম করল বটে, কিন্তু পায়ে ধূলো নিতে ব্যস্ত। আমি যত সঙ্কোচ করি, 'না, না' করি, সে কিছুতেই ছাড়ল না ; শেষে একরকম জোর করেই পায়ের ধূলো নিলে। সেই থেকে অসহ্য পায়ের জ্বালা আর পেটের ব্যথায় মরছি। তিনবার চারবার পা ধুলুম, তবুও সে জ্বালা যাচ্ছে না। তোমরা কাছে থাকলে আমার ইসারা বুঝে তাকে নিষেধ করতে পারতে। কলকাতায় ওরা ভক্তদের সম্বন্ধে যে কড়াক্কড় করে সেটি না করলেও চলে না। কত রকমের লোক যে আসে! তোমরা ছেলেমানুষ বুঝতে পার না।"

বাহিরের কাজকর্ম্ম সারিয়া আমি সন্ধ্যাকালে মার কাছে আসিয়াছি। মা বলিলেন, "আজ বিকালে বি—

একজন পুলিশের বড় কর্ম্মচারীকে (তাহার নাম করিয়া) আমার কাছে আনিয়াছিল। লোকটি কি রকম প্রকৃতির— গোঁফ পাকাতে পাকাতে এসে প্রণাম করে আমার পায়ের ধূলো নিতে চায়! আমি সঙ্কুচিত হয়ে কিছুতেই পায়ের ধূলো দিতে পারলাম না। কি রকম চনমনে স্বভাব! অথচ বি— আমার সামনে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার কত প্রশংসা করছে! এদিকে আমি ত ব্যতিব্যস্ত, ভাবছি কি ভাবে তার অভ্যর্থনা করতে হবে, না হবে। শেষে কিছু হালুয়া করে সদরে পাঠিয়ে দিলুম।"

একদিন 'উদ্বোধনের' বাটীতে মা পূজা সারিয়া উঠিয়াছেন এমন সময় একটি ভক্ত কতকগুলি ফুল লইয়া মাকে দর্শন করিতে যান। মা ত অপরিচিত ভক্তটিকে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ চাদর মুড়ি দিয়া বউ-মানুষটির মত তক্তাপোশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তটি মায়ের পায়ে ফুলগুলি দিয়া প্রণাম করিয়া সামনে আসন করিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া ন্যাস ও দীর্ঘ প্রাণায়াম আরম্ভ করিলেন। বাড়ীর সকলে কাজে ব্যস্ত, মায়ের কাছে কেহই নাই। বসিয়া থাকিেত থাকিতে মায়ের সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

ভক্তটি মাকে পূজা করিতেছে দেখিয়া গোলাপ-মা কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া

আসিয়াও সেই ব্যক্তিকে তদ্রূপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চগলায় বলিতে লাগিলেন, "এ কি কাঠের ঠাকুর পেয়েছ যে ন্যাস-প্রাণায়াম করে তাকে চেতনা করবে? আক্কেল নেই? মা যে ঘেমে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন।"

একবার একটি ভক্ত মাকে প্রণাম করিতে গিয়া মায়ের পায়ের বুড় আঙ্গুলের উপর জোরে মাথা ঠুকিয়া দেয়। মা ব্যথা পাইয়া 'উঃ' করিয়া উঠিলেন, নিকটে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি করলে?" তখন ভক্তটি জবাব দিল, "মায়ের পায়ে মাথা ঠুকে ব্যথা রেখে দিলাম। যতদিন এই ব্যথা থাকবে, ততদিন মা আমাকে স্মরণ করবেন।"

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা দুইটি মা অনেকবার আমাদের নিকট হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ ৺কাশী হইতে কলিকাতা আসিয়াই মাকে আনিতে জয়রামবাটীতে লোক পাঠাইয়াছেন। যথাসময়ে সকালবেলায় সকলকে লইয়া মা কলিকাতা রওয়ানা হইতেছেন। সকলের শেষে কি— মহারাজ ও হ— প্রণাম করিলেন। মা তাঁহাদিগকে তাঁহার ব্যবহৃত একখানি কাপড় ও চাদর দিয়া "এগুলি রেখো" বলিয়া

মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সজলনয়নে যাত্রা করিলেন। আমি পাল্কির সঙ্গে সাইকেলে চলিলাম, পথে শিহোড়ে শান্তিনাথ মহাদেবের মন্দিরের নিকট পাল্কি নামাইয়া মা দুই টাকার সন্দেশ, চিনি ও নবাত (সরাগুড়) কিনিয়া শিবের পূজা দেওয়াইলেন। উপস্থিত সকলকে এবং আমাদিগকেও কিছু প্রসাদ দিয়া নিজে সামান্য গ্রহণ করিলেন ও কিছু রাধুর জন্য আঁচলে বাঁধিয়া লইলেন। যথাসময়ে সকলে কোয়ালপাড়া পৌঁছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যায় রাধু প্রভৃতি মেয়েরা সকলে গরুর গাড়ীতে বিষ্ণুপুর রওয়ানা হইলেন। পরদিন ভোর পাঁচটার সময় আমি জগদম্বা আশ্রমে মায়ের কাছে গিয়া দেখি, তিনি ফুল মিষ্টি দিয়া ঠাকুরপূজা সারিয়া ঠাকুরের ফটোখানি কাপড়ে জড়াইয়া বাক্সের মধ্যে লইতেছেন এবং ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "ওঠ, এবার যাত্রার সময় হল।" আমাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "এসেছ ? এত দেরী করলে যে ? রোদ হবে। এই যাত্রার ফুলটি নাও।" এই বলিয়া ঠাকুরের পূজার একটি ফুল নিজের মাথায় ঠেকাইয়া আমার হাতে দিলেন। পরে সকলের নিকট বিদায় লইয়া পাল্কিতে উঠিলেন। কিছুদূর গিয়া মা বলিতেছেন, "সর্ব্বদা আমাদের কাছে কাছে এবং সাবধানে চল। রাধু ও মাকুর গহনাগুলি সব মাকুর

পাল্কিতে আছে।" জয়পুরে আসিয়া মা পাল্কি নামাইতে বলিলেন। পাল্কি হইতে নামিয়া যে চটিতে মা ও আমরা সেবার জয়রামবাটী যাইবার পথে রান্না করিয়া খাইয়াছিলাম সেখানি ভগ্নপ্রায় দেখিয়া মা হাসিয়া বলিতেছেন, "আহা, আমাদের সেই চটিখানি গো।" উহার নিকটে গিয়া কম্বল পাতিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "বেহারাদের কিছু খাওয়াও।" দুটি টাকা দিয়া মুড়ি কিনিয়া দিতে বলিলেন। পরে মাকুর ছেলের দুধ গরম করিয়া দিয়া মা সামনের পুকুরটিতে হাত পা ধুইয়া আসিয়া বলিতেছেন, "আমার জন্যে এক পয়সার মুড়ি এনে দাও, আমিও দুটি চিবুই। আর তোমার ও মাকুর জন্যে কিছু তেলেভাজা পাও তো নিয়ে এস।" আমি ঐসব আনিয়া দিলে মা অল্প দুটি খাইয়া আমাদের দিয়া দিলেন। বলিলেন, "আর চিবুতে পারি না।" বেহারাদের সকলের খাওয়া হইলে আবার পাল্কি ছাড়িয়া দিল। চার মাইল জঙ্গল পার হইয়া তাঁতি-পুকুরে আসিয়া দেখি, কতকগুলি মজুরশ্রেণীর লোক একটি ছোট দোকানের পাশে বসিয়া জটলা করিতেছে। আমি ভাবিতেছি, এই জায়গাটা শীঘ্র পার হইয়া যাইতে পারিলে আর দু মাইল পরে কিছু কিছু লোকালয় পাওয়া যাইবে এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। কিন্তু মা পাল্কি হইতে উকি মারিয়া দোকানটি দেখিয়াই

বলিতেছেন, "একটু নামাতে বল দেখি, আমার পাল্কিতে বসে পাটা ধরে গেছে। ঐ দোকান থেকে আধ পয়সার তেল একটা শালপাতায় করে এনে দাও। পাটায় মালিশ করি।" আমি ত এই কথা শুনিয়া ভয়ে অস্থির! শেষে মাকে বলিলাম, "এইখানে কারা সব রয়েছে। আপনার আর নেমে কাজ নেই। আপনি পাল্কিতেই বসে থাকুন, আমি তেল এনে দিচ্ছি।" মাকু সেই সময়ে বলিতেছে, "আমার মুড়ি খেয়ে খুব তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাব।" মা বলিলেন, "খা না, ঐ পুকুরটায় খেয়ে আয়।" আমি বলিলাম, "ও জল কি খাবে? খুব খারাপ।" মা বলিলেন, "রাস্তায় ওই কত লোক খাচ্ছে। কিছু হবে না, যা। তুমি যাও ওর সঙ্গে, খাইয়ে আন।" মাকে তেল কিনিয়া দিয়া মাকুর সহিত গিয়া তাহাকে জল খাওয়াইয়া আসিয়াই রওয়ানা হইলাম। বেলা বারটা আন্দাজ বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বর বাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম। সুরেশ্বর বাবু কয়েক মাস পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মা তাঁহার কথা বলিতেছেন, "আহা! আমি এখানে এলে সুরেশ আমার সর্ব্বদা জোড়-হাত করে ঐখানটিতে দাঁড়িয়ে থাকত। কখনও বারান্দাটিতে পর্য্যন্ত উঠত না। কি ভক্তিই ছিল!"* সেই দিন বিষ্ণুপুরে থাকিয়া পরের দিন মধ্যাহ্নে আহারাদির

* মা মাঝে মাঝে বলিতেন, "সুরেশ যেন দ্বিতীয় গিরীশ বাবু।"

পর মাকে লইয়া আমরা সকলে একটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম এবং রাত্রি প্রায় দশটায় 'উদ্বোধনে' পৌঁছিলাম।

যোগেন-মা ও গোলাপ-মা মায়ের শরীর দেখিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, "তোমরা কি মাকেই নিয়ে এলে গো! ভূতের মতন কাল। কেবল চামড়া ও হাড় কখানি এনে হাজির করলে গা? মায়ের শরীর যে এত খারাপ তা আমরা মোটেই বুঝতে পারি নি।" পরের দিন হইতেই পূজনীয় শরৎ মহারাজ মায়ের চিকিৎসার সকল রকম ব্যবস্থা করিলেন।

মা শ্রীযুত শ্যামাদাস কবিরাজের চিকিৎসায় কয়েকদিন একটু ভাল আছেন। ঐ সময়ে একদিন বিকালে কয়েক জন স্ত্রী-ভক্ত দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের অলঙ্কার ও বেশভূষার খুব পারিপাট্য। একটু চঞ্চল। মা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "দেখ, স্ত্রীলোকের লজ্জাই হল ভূষণ। ফুলটি দেবসেবায় লাগলেই সব চেয়ে সার্থক; না হয় গাছেই শুকিয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু আমার দেখে বড় কষ্ট হয়, যখন বাবুরা ফুলটি কখনও তোড়া করে, কখনও বা এমনি হাতে নিয়ে নাকের কাছে একবার ধরে বলে, 'বাঃ, বেশ ত গন্ধটি!' ও মা, পরক্ষণেই হয়ত মেঝেয় ফেলে দিয়েছে!

জুতোয় মাড়িয়েই হয়ত চলেছে! চেয়েও দেখলে না।”*

ঐ সময়ে একদিন ইটালিতে উৎসব দেখিতে যাইবার পথে রামলাল দাদা, লক্ষ্মী দিদি ও রামলাল দাদার কন্যা দক্ষিণেশ্বর হইতে মায়ের নিকট আসিয়াছেন। রামলাল দাদা মাকে প্রণাম করিয়া নীচে শরৎ মহারাজের নিকট গেলেন। মা ও অন্যান্য সকলের অনুরোধে লক্ষ্মী দিদি চাপাগলায় কীর্ত্তন গাহিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে মুখে খোলের বোলের অনুকরণ করিয়া শুনাইলেন। তারপর কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান, মন্দির ও বিষয়সম্পত্তির কথা উঠিল।

লক্ষ্মী দিদি— ও হলে সেটি আমাদের হেফাজতে থাকবে ত? এদের (রামলাল দাদা ও শিবু দাদার) ছেলেপিলেরাই সব পূজাদি করবে, থাকবে।

মা— তা কি করে হবে? এরা সব সাধুভক্ত; এদের কি জাতের বিচার আছে? কত দেশের লোক সাহেব-সুবো সব যাবে, ঐখানে থাকবে, প্রসাদ পাবে। আমাদের ত সব ভক্ত নিয়েই কারবার। তোরা হলি সংসারী।

* পরে শুনিয়াছিলাম ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামী নাকি বহুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

তোদের সমাজ আছে, ছেলেমেয়েদের বে থা আছে। তোদের কি ওদের সঙ্গে থাকলে চলবে ?

এইরূপ আরও কিছু কথাবার্ত্তার পর মা আবার বলিতেছেন, "তোদের এখন যেমন ঘরগুলি আছে ঐ ধরনের, তবে করগেটের ছাউনি দিয়ে, যুগীদের খামারের কাছে, অথবা পশ্চিম দিকে যেখানে হোক একটু জায়গা নিয়ে বাড়ী আলাদা করে দেবে।"

লক্ষ্মী দিদি— তবে রঘুবীর ও শীতলা কি ঠাকুরের যে মন্দির হবে তাতেই থাকবেন ?

মা— তা কি হয়! ও তোদের গৃহদেবতা; পাল-পার্ব্বণে তোদের বউঝিরা পূজা-অর্চ্চনা করবে। তা হয় না। রঘুবীরের জন্য মন্দির আলাদা পাকা করে দেবে; পাশ দিয়ে একটু রাস্তা থাকবে; মেয়েরা যাতায়াত করবে। তুই, রামলাল বা শিবু যখন যাবি, তোরা মন্দিরেই ভক্তদের সংসারে খাবি থাকবি; তোদের আর কি ?

উপরে শরৎ মহারাজের ঘরে রামলাল দাদা প্রভৃতি আসিলেন। শ্রীশ্রীমার প্রস্তাব রামলাল দাদা ও লক্ষ্মী দিদি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন ও শরৎ মহারাজও সকল কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী দিদি এবং রামলাল দাদা প্রভৃতি চলিয়া গেলে মা আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "দেখ, তখন লক্ষ্মীর সঙ্গে

কথা কইতে কইতে ওকে কাপড় ও টাকা দিতে ভুলে গেছি। তুমি কৃষ্ণলালের সঙ্গে ইটালীতে গিয়ে উৎসব দেখে এস, আর লক্ষ্মীকে টাকা ও কাপড় দিয়ে এস। ইটালীতে ওরা ঠাকুরকে বেশ সাজায়।” এই বলিয়া ছুটি টাকা ও একখানি কাপড় বাহির করিয়া দিলেন। পরে বলিতেছেন, “লক্ষ্মী ঠাকুরের কাছে কীর্ত্তনিয়াদের অনুকরণ করে গাইতে গাইতে নেচে অঙ্গভঙ্গী করে দেখাত। ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, ‘ওর ওই ভাব। তুমি যেন ওর লয়ে লয় দিয়ে লজ্জা ভেঙ্গো না।’ ”

একদিন জয়রামবাটী হইতে চিঠি আসিল যে ঐ অঞ্চলের একটি লোক ডাকাতি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। মা শুনিয়াই বলিতেছেন, “ও বাবা, দেখলে ? অমি জানতাম তার ডাকাতি-বৃত্তিটা নষ্ট হয় নি। আমি কি সাধ করে তাকে অত আদর করতাম, অত জিনিসপত্র দিতাম ? তাই আমার বাধ্য থাকত। আমার কাছে এলে কেঁচোটির মত থাকত। এই সব মেয়ের পাল নিয়ে, ওদের অত গয়নাগাঁটি নিয়ে বাস করি। তোমরা ত কে কখন আছ, কিছুই ঠিক নেই। দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার, তা যে ভাবেই হোক।”

মায়ের অসুখ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। জ্বর মাত্র দুই-আড়াই পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু হাত-পা-জ্বালার জন্য

অত্যন্ত অস্থিরতা। আজকাল সর্ব্বদা বলিতেছেন, "আমাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে চল, গঙ্গার ধারে আমি ঠাণ্ডা হব।" পূজনীয় শরৎ মহারাজ সেইজন্য চেষ্টাও করিতেছেন। কিন্তু ডাক্তাররা এই অবস্থায় নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ করিতেছেন। একদিন মা আমাকে বলিতেছেন, "তুমি রাধুটাধু ওদের সবাইকে জয়রামবাটী রেখে এস।" আমরা ভাবিতেছি, মা রাধুগত-প্রাণ, তাহাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না, আর আজ এই অবস্থায় তাহাদিগকে জয়রামবাটী পাঠাইয়া দিতে বলিতেছেন। একি ব্যাপার! মা ক্রমশঃই উহাদের উপর এত বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন যে নলিনী দিদি প্রভৃতি তাঁহার কাছে যাইতে সাহস করেন না। পূজনীয় শরৎ মহারাজ মাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "আপনার এই অসুখ দেখে ওদের যেতে কষ্ট হবে। আপনি একটু সেরে উঠলে ওরা যাবে।" মা বলিতেছেন, "পাঠিয়ে দিলেই ভাল হত। তবে যেন আমার কাছে আর না আসে। আমার আর ওদের ছায়া দেখতেও ইচ্ছে নেই।"

একদিন দুপুরে রাধু পাশের ঘরে ঘুমাইতেছে, তাহার খোকা হামা দিতে দিতে মায়ের বিছানার নিকট আসিয়া তাঁহার বুকের উপর উঠিতেছে। মা তাহা দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোদের মায়া একেবারে

কাটিয়েছি। যা, যা, আর পারবি নে।" আমাকে বলিলেন, "একে তুলে নিয়ে গিয়ে ওদিকে রেখে এস। এসব আর ভাল লাগে না।" আমি খোকাকে কোলে করিয়া তাহার দিদিমার নিকট দিয়া আসিলাম।*

জয়রামবাটীতে একদিন একজন ছোট মামীকে একটু রূঢ় কথা বলায় মা বলিতেছেন, "ওকি গো, মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? কথা সত্য হলেও অপ্রিয় করে বলতে নেই। শেষে ঐরূপ স্বভাব হয়ে যায়। মানুষের চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেলে আর মুখে কিছু আটকায় না। ঠাকুর বলতেন, 'একজন খোঁড়াকে যদি জিজ্ঞাসা করতে হয়, তুমি খোঁড়া হলে কি করে?—তাহলে বলতে হয়, তোমার পাটি অমন মোড়া হল কি করে?' "

শেষাশেষি মায়ের শরীর খুব দুর্ব্বল থাকায় বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু দেখিতাম, তিনি এই শুইয়া থাকার সময়েও জপ করিতেছেন। জয়রাম-বাটীতে রাত্রি একটা-দুইটার সময় হঠাৎ কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে তাঁহাকে ডাকিয়া দেখিয়াছি, তিনি এক ডাকেই সাড়া দিতেন এবং "আপনি কি ঘুমান নাই?" জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "কি করি, বাবা, সব ছেলেরা ব্যাকুল হয়ে

* মা এইবারই স্বধামে প্রস্থান করেন।

এসে ধরে, দীক্ষা নিয়ে যায়। কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত—নিয়মিত কেন, কেউ বা কিছুই করে না। তা যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে ত? তাই জপ করি। আর ঠাকুরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, 'হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও। এই সংসারে বড় দুঃখকষ্ট। আর যেন তাদের না আসতে হয়।'" বলিতে বলিতে অতি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিতেন। আবার বলিতেন, "এত আগ্রহ করে মন্ত্রটি ত নিয়ে গেল, কিন্তু কিছু করে না কেন? এমন আর কি শক্ত? একটু অভ্যাস করে করতে থাকলেই কেমন আনন্দ আসে। আহা, যোগেন ও আমরা বৃন্দাবনে কি আনন্দে কত জপ করতাম! চোখে মুখে মাছি বসে ঘা করে দিত—হুঁশ হত না!"

একদিন মা বলিতেছেন, "এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।" এই বলিয়া কামারপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের জীবনের একটি ঘটনা বলিলেন, "একবার কামারপুকুরে জ্যৈষ্ঠমাসের দিন বৈকালে খুব বৃষ্টি হয়ে মাঠ সব জলে উপছে গেছে।

ঠাকুর ডোমপাড়ার কাছে নীচু সদর রাস্তা দিয়ে এতখানি জল ভেঙ্গে মাঠে শৌচে যাচ্ছেন। সেখানে অনেকে মাগুর মাছ উঠেছে দেখে লাঠি দিয়ে মারছে। একটি মাগুর মাছ ঠাকুরের পায়ে পায়ে কেবল ঘুরছে। তাই দেখে তিনি বলছেন, 'এটিকে মারিসনে রে, এটি আমার পায়ে পায়ে শরণাগত হয়ে কেমন ঘুরছে। কেউ যদি পারিস ত একে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে আয়।' তার পর নিজেই সেটিকে ছেড়ে দিয়ে এসে বাড়ীতে বলছেন, 'আহা, কেউ যদি এই রকম শরণাগত হয় তবেই সে রক্ষা পায়।' "

—**স্বামী ঈশানানন্দ**

(৩)

জয়রামবাটীতে জনৈক ভক্ত জপ সম্বন্ধে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "যখন রাস্তায় রেলে ষ্টীমারে থাকিতে হয়, তখন কিভাবে জপ করিব?" মা তাহাতে বলিয়াছিলেন, "তখন মনে মনে করিবে।" আরও বলিয়াছিলেন, "বাবা, ক্রমে হাত মুখ সব বন্ধ হয়ে যাবে, কেবল মনে চলবে। মনই শেষে গুরু হবে।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মঠের মহারাজদের সম্বন্ধে মা বলিয়াছিলেন, "জীবের মুক্তির চাবি এদের হাতে আছে।"

কাশীতে একবার শ্রীশ্রীমার জন্মদিনে স্বামী কেশবানন্দের মাতা তাঁহার কোন আত্মীয়ের বিয়োগ-কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। তাহাতে মা বলিলেন, "ছি! আজ কি কাঁদতে আছে, আজ যে আনন্দের দিন।"

কোয়ালপাড়ায় রথের দিন আমাদের জনৈক গুরু-ভ্রাতা মাকে বলে, "মা, মন বড়ই চঞ্চল। কিছুতেই ঠিক হয় না।" তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন, "যেমন ঝড়ে মেঘ উড়িয়ে নেয়, তেমনি তাঁর নামে বিষয়-মেঘ কেটে যাবে।"

আমি মাকে ঐদিন মনের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে নিবেদন

করায় মা উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কাম কি একেবারে যায় গা, শরীর থাকলেই কিছু না কিছু থাকে। তবে কি জান, সাপের মাথায় ধূলপড়া পড়লে যেমনটি হয়, তেমনটি হয়ে যাবে।"

মা একবার বলিয়াছিলেন, "ভয় কি ? সর্ব্বদা জানবে, তোমাদের পিছনে একজন আছেন।" আরও বলিয়াছিলেন, "যতদিন (এ) শরীর আছে, আনন্দ করে চলে যাও।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মা বলেন, "ঘাস আর বাঁশ ছাড়া সকলকেই এখানে আসতে হবে।" ইহার অর্থ আমি এই বুঝিয়াছি যে, যাহাদের কিছুমাত্র সার নাই তাহারাই কেবল এবার বাদ পড়িবে, নতুবা আর সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব গ্রহণ করিবে। স্বামী কেশবানন্দ ও বিগ্যানন্দের নিকটও মা এইরূপ বলিয়াছিলেন।

জনৈক স্ত্রী-ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, অনেকে ত শিবপূজা করে, আমরাও শিবপূজা করতে পারি কি-না ?" তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন, "আমি যে মন্ত্র দিয়েছি তাতেই সব—দুর্গাপূজা, কালীপূজা সব ঐ মন্ত্রে হয়। তবে কারও ইচ্ছা হলে শিখে নিয়ে করতে পারে। তোমাদের ওসবের দরকার নেই, ওসব করলেই হাঙ্গাম-বাড়ান।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ নিবেদন করা সম্বন্ধে মাকে বলা হইয়াছিল, "মা, পূজাপদ্ধতি-মতে নিবেদন করবার মন্ত্র ত কিছুই জানি না।" তাহাতে মা বলেন, "পূজাপদ্ধতির অত দরকার নেই। ইষ্টমন্ত্রেতেই সব কাজ হয়।"

—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী, পাটনা

(৪)

ধ্যানজপের কথা উঠায় মা বলিলেন, "ধ্যানজপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দরকার। কারণ কখন যে ক্ষণ * বয়, বলা যায় না। ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়—টের পাওয়া যায় না। সেজন্য যতই গোলমাল হোক, নিয়ম রাখা খুব দরকার।"

আমি— কাজের ঝঞ্ঝাট বা অসুখ প্রভৃতি আছে; সেজন্য সকল সময় নিয়ম রাখা সম্ভব হয় না।

মা— অসুখ হলে ত আর আয়ত্ত নেই। আর নেহাৎ যদি কাজের ঝঞ্ঝাট থাকে, তবে স্মরণ প্রণাম করলেও হয়।

আমি— কখন সময় করা কর্ত্তব্য?

মা— সন্ধিক্ষণেই তাঁকে ডাকা প্রশস্ত। রাত যাচ্ছে, দিন আসছে, দিন যাচ্ছে, রাত আসছে—এই হল সন্ধি। এই সময় মন পবিত্র থাকে।

মনের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিয়াছিলেন, "বাবা, ওটা প্রকৃতির নিয়ম; যেমন অমাবস্যা, পূর্ণিমা

---

* ক্ষণ অর্থাৎ অনুকূল সময়। কার্য্যের সফলতাপ্রসঙ্গে মা একদিন একটি বচন বলেন, "যা না করে ধনে জনে, তা করে ক্ষণের গুণে।"

আছে না? তেমনি মনও কখন ভাল, কখনও মন্দ হয়।”

মা যখন জয়রামবাটী হইতে বাগবাজার যাইতেন, তখন আমাকে মাঝে মাঝে জয়রামবাটী যাইয়া সংবাদাদি রাখিতে বলিয়া যাইতেন। আমি তাঁহার এই আদেশ যথাসাধ্য পালন করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তিনি জয়রামবাটী না থাকায় যাইতে তেমন আনন্দ হইত না। ইহা পত্রে মাকে জানাইয়াছিলাম। তিনি জয়রামবাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কথাচ্ছলে আমাকে বলিলেন, “ও ন—, রান্নী (রাঁধুনী) কি বলে শোন।” মা এবারে কলিকাতা যাইবার সময় রাঁধুনীকে বিদায় না দিয়া বড় মামীর সাহায্যার্থ রাখিয়া আসেন। গ্রীষ্মকাল; রাধুনী মায়ের ঘরের (পুরাতন বাটীতে) দরজার সামনেই বারান্দায় মশারি খাটাইয়া শুইয়াছিল। স্বপ্নে দেখে, মা এক হাতে ফুলের সাজি ও অন্য হাতে জলের ঘটী লইয়া যেন স্নান করিয়া আসিতেছেন। আসিয়া বলিতেছেন, “ওঠ্, ওঠ্ এখান থেকে!” এই বলিয়া দুয়ার জুড়িয়া শোওয়ার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন। রাঁধুনীর এই বর্ণনা শেষ হইলে মা হাসিয়া বলিলেন, “শোনো, কে জানে বাবা, কি বলে!”

একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম, “মা,

সংসারে থেকে কোন কাজ হয় না।" তদুত্তরে তিনি বলেন, "বাবা, সংসার মহা দঁক (পাঁক), দঁকে পড়লে ওঠা মুস্কিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু খাবি খান, মানুষ কোন ছার! তাঁর নাম করবে। নাম করতে করতে তিনিই একদিন কাটিয়ে দিবেন। তিনি না কাটালে কি উদ্ধার হওয়া যায়, বাবা? তাঁতে খুব বিশ্বাস রাখবে। সংসারে যেমন মা-বাপ ছেলেদের আশ্রয়স্থল, তেমনি ঠাকুরকে জ্ঞান করবে।"

একদিন ভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে কথা উঠিলে মা বলেন, "বাবা, শুধু পড়লে কি আর বিশ্বাস হয়? বেশী পড়লে গুলিয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, 'জগৎ মিথ্যা, তিনিই সত্য—এইটি শাস্ত্র পড়ে জেনে নিতে হয়।' এই যেমন তোমাকে চিঠি লিখলাম, এই এই জিনিসগুলি নিয়ে তুমি আসবে। তা চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ তাতে কি আছে না জান। যাই জানা হয়ে গেল, আর চিঠির দরকার কি? সেই সব জিনিষ নিয়ে ত আমার সঙ্গে দেখা করবে। না হলে, দিনরাত চিঠি পড়ে লাভ কি?"

একদিন আবেগভরে বলিলাম, "মা, এত যে আসা-যাওয়া করছি, আপনার কৃপালাভও করলাম, তবু কেন কিছুই হচ্ছে না? আমার ত মনে হয়, আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি।"

তদুত্তরে মা বলিলেন, "বাবা, তুমি যদি একটা খাটে

ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ সেই খাটখানাসমেত তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যায়, তাহলে তুমি ঘুম ভাঙ্গতেই কি বুঝতে পারবে যে স্থানান্তর হয়েছ ? না, যখন বেশ পরিষ্কারভাবে ঘুমের ঘোর কেটে যাবে, তখন দেখবে যে অন্যত্র এসেছ ।"*

একবার বেলুড় মঠের উৎসবদর্শনার্থ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় মেদিনীপুরে একটু প্রয়োজনবশতঃ নামিয়াছিলাম। তাহাতে সেইদিন রাত্রের গাড়ী ধরিতে না পারায় পরদিন যাইতে হয়। সন্ধ্যার সময় কলিকাতা পৌঁছিয়া মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। মা দেখিয়াই বলিলেন, "উৎসব দেখনি ত ?" "না, মা, উৎসব দেখা হয় নাই" বলিয়া রাস্তার ঘটনা বলিলাম। তাহা শুনিয়া মা বলিলেন, "যো সো করে আগে উদ্দেশ্যসাধন করে নিতে হয়। এইত, বাবা, এত সব দেখতে পেলে না। আগের কাজ আগে করতে হয়।" পরে বলিলেন, "কালকে এখানে এসে ঠাকুরের প্রসাদ পেও।"

আহারসম্বন্ধে মা বলিতেন, "যখনই যা-কিছু আহার করবে, তা ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ

---

* মা বলিতেন, "আমার যা করে দেবার, আমি সেই এক সময় (দীক্ষাকালে) করে দিয়েছি। তবে যদি সদ্য শান্তি চাও, সাধনভজন কর, নতুবা দেহান্তে হবে।"

করবে। তা হলে রক্ত শুদ্ধ হবে, রক্ত শুদ্ধ হলে মনও শুদ্ধ হবে।”

একদিন কোন কারণে মা তাঁহার ভাইদের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমি ঐ সময়ে গিয়া উপস্থিত হইলে আমাদের ঐ সম্পর্কে দু-একটি কাহিনী বলিয়া বলিলেন, “বাবা, ওরা কেবল টাকা টাকা করেই গেল! কেবল ‘ধন দাও, ধন দাও’—ভুলেও কখন জ্ঞান ভক্তি চাইলে না। যা চাচ্ছিস, তাই নে!”

জয়রামবাটীতে শেষ অসুখের পূর্ব্ববার মা যখন কঠিন জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন একদিন আমি তাঁহার পদসেবা করিতেছিলাম, এমন সময়ে বলিলেন, “দেখ, বাবা, কদিন ধরে ডাকছি, কেউ শুনতে পায় নি; কত কেঁদেছি, তবুও কেউ আসে নি। আজ অবশেষে মা এসেছিলেন—জগদ্ধাত্রী, কিন্তু মুখটি ঠিক মায়ের মুখের মত। এবার আমার অসুখ সেরে যাবে। আর একবার ছোটবেলায় দক্ষিণেশ্বর যেতে আমার খুব জ্বর। কোন জ্ঞান নেই। এমন অবস্থায় দেখি যে একটি কাল কুচ্‌কুচে মেয়ে এক-পা ধূলো নিয়ে আমার বিছানার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলুচ্ছে। এক-পা ধূলো দেখে বললুম, ‘মা, কেউ কি পা ধূতে জল দেয় নি?’ সে বললে, ‘না, মা, আমি এক্ষুণি চলে যাব। তোমাকে দেখতে এসেছি।

ভয় কি? ভাল হয়ে যাবে।' তা পরদিন থেকে আমি ক্রমে সেরে উঠি! এবার, বাবা, বড় কষ্ট দিয়েছে; কত ডাকবার পর তবে আজ দেখা পেয়েছি। এবারও আমি সেরে গেলুম। ভয় কি, বাবা, তাঁকে খুব ডাকলেই সব বিষয়ে তিনি এসে রক্ষা করবেন।"

—**শ্রীনলিনবিহারী সরকার, চন্দ্রকোণা**

(৫)

জয়রামবাটীতে মা একদিন বলিলেন, "দেখ, বাবা, ছেলেবেলা দেখতুম, আমারই মত একটি মেয়ে সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল কাজের সহায়তা করত, আমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত। দশ-এগার বছর বয়স পর্য্যন্ত এ রকম হত।"

একদিন মা বলিলেন, "ঠাকুর চলে যাবার কিছুকাল পর থেকে প্রায়ই দেখতুম দাড়িটাড়িওয়ালা এক সন্ন্যাসী আমাকে পঞ্চতপা করবার কথা বলতেন। প্রথম প্রথম আমি তেমন খেয়াল করি নি। পঞ্চতপা কি, তাও তত জানতুম না। তিনি ক্রমেই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তারপর যোগেনকে (যোগেন-মা) পঞ্চতপার কথা জিজ্ঞাসা করায় যোগেন বললে, 'বেশ ত, মা, আমিও করব।' পরে পঞ্চতপার যোগাড় করা হল। তখন বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে। চারিদিকে ঘুঁটের আগুন, উপরে সূর্য্যের প্রখর তেজ। প্রাতে স্নান করে কাছে গিয়ে দেখি আগুন গম গম করে জ্বলছে। প্রাণে বড়ই ভয় হল, কি করে ওর ভিতর যাব, আর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সেখানে বসে থাকব। পরে ঠাকুরের নাম করে ঢুকে দেখি,

আগুনের কোন তেজ নেই। এভাবে সাতদিন কাজ করি। কিন্তু বাবা, শরীরের বর্ণ যেন কাল ছাই হয়ে গিছল। এর পর আর সে সন্ন্যাসীকে দেখি নাই।”

আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মা, ঠাকুর বলেছেন, যারা তাঁর কাছে যাবে তাদের শেষ জন্ম। আপনার কাছে যারা আসবে তাদের কি হবে?”

মা— কি আর হবে, বাবা? এখানেও তাই হবে।

আমি— মা, আপনার কাছ থেকে যারা মন্ত্র নিয়েছে, তারা যদি কোনরকম জপতপ না করে, তবে তাদের পরিণাম কি হবে?

মা— কি আর হবে? তোমরা অত ভাবনা কর কেন? মনের বাসনা-কামনা যা আছে পূরণ করে নাও, পরে রামকৃষ্ণ-লোকে গিয়ে চিরশান্তিভোগ করবে। ঠাকুর তোমাদের জন্য নূতন রাজ্য তৈরী করেছেন।

কোন ভক্ত মন্ত্র কিভাবে অঙ্গুলিতে জপ করিতে হইবে ভুলিয়া যাওয়ায় উহা মার কাছে জানিয়া লইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। মা উহা শুনিয়া বলিলেন, “ওতে আর কি আসে যায়? এক রকমে করলেই হয়। এ সকল ত মন আনবার জন্য।”*

---

* একটি ভক্ত একদিন 'উদ্বোধনে' মাকে প্রণাম করিবার সময় বলিলেন যে তাঁহার স্ত্রী মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতা আনাও

মুক্তি ও ভক্তি সম্বন্ধে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মা বলিলেন, "মুক্তি ত প্রতিক্ষণে দেওয়া যায়। কিন্তু ভক্তি ভগবান সহজে দিতে চান না।" কথাগুলি এমন-ভাবে বলিলেন, যেন মুক্তি তাঁহার হাতের মুঠার ভিতর। কথাটা বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

শুচি-অশুচি-বিষয়ে মা একদিন বলিলেন, "দেখ, বাবা, ঠাকুর বড়ই পেটরোগা ছিলেন। আমি নবতে থেকে ঠাকুরের ইচ্ছামত সুক্ত, ঝোল, এসব রেঁধে দিতুম। মাসের মধ্যে যে তিন দিন মেয়েরা ওসব করতে পারে না, সে কয়দিন মায়ের (মা কালীর) ওখান হতে প্রসাদ আসত। তা খেলেই ঠাকুরের অসুখ বাড়ত। একদিন ঠাকুর আমাকে বললেন, 'দেখ, তুমি এই তিন দিন রান্না না করাতে আমার অসুখটা বেড়েছে। তুমি ও কদিন কেন রাঁধলে না?" আমি বললুম, 'মেয়েদের অশুচির তিন দিন কাউকে রেঁধে দিতে পারে না।' ঠাকুর বললেন, 'কে বললে পারে না? তুমি আমাকে দেবে, তাতে দোষ হবে না। বল ত, অশুচি তোমার শরীরের কোন জিনিসটা? চামড়া, না মাংস, না হাড়, না মজ্জা? দেখ, মনই শুচি-অশুচি।

তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য। মা শুনিয়া বলিলেন, "তা ভুলে গেছে, তাতে আর কি হয়েছে? ঠাকুরকে স্মরণমনন করলেই হবে।"

বাইরে অশুচি বলে কিছু নেই।' এর পর হতে আমি সর্ব্বদা রান্না করে দিতুম।"*

কোয়ালপাড়ায় মায়ের অসুখের সময় তাঁহার জন্য সরবৎ প্রস্তুত করিয়া ঠিক হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য আমি উহা চাখিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম। মা কিন্তু তাহা জানিতেন না। উহার দুই-তিন দিন পরে মা নিজেই বলিলেন, "দেখ, বাবা, ভালবাসার জনকে কোন কিছু খেতে দিতে হলে আগে নিজে চেখে দেওয়া খুব ভাল।" তখন আমি বলিলাম, "মা, আমি ত আপনার সরবৎ চেখে দেখেছিলাম।" তিনি বলিলেন, "বেশ করেছিলে, বাবা, ভালবাসার পাত্রকে ঐ ভাবেই দিতে হয়। শোন নি, রাখালরা শ্রীকৃষ্ণকে ফল খেতে দেবার আগে নিজেরা চেখে দিত?"

একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, রাস্তাঘাটে কোন কোন লোককে দেখামাত্র মনে হয় যেন তাঁরা বিশেষ পরিচিত। পরে পরিচয়ে জানতে পারি তাঁরা ঠাকুরের বা আপনার ভক্ত। হঠাৎ দেখলে অত পরিচিত বলে বোধ হয় কেন?" মা বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন,

---

* একবার ঐ সময়ে পূজাদি না করায় মায়ের মন কেমন করে। তিনি ঠাকুরকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। ঠাকুর বলেন, "যদি পূজা না করলে মনে কষ্ট হয় তবে করবে, নতুবা নয়।"

'কলমীর দল, একটি ধরে টানলেই সবগুলি নাড়াচাড়া পড়ে'। সব যে একগাছের শাখা-প্রশাখা।"

আর একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এবার আপনাকে রাখিয়া ঠাকুর পূর্ব্বে চলিয়া গেলেন কেন?" মা বলিলেন, "বাবা, জান ত ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল? সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"

—ডাঃ **উমেশচন্দ্র দত্ত, ময়মনসিংহ**

(৬)

উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

সকালবেলা মা পূজার যোগাড় করিতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে আমি বলিলাম, "মা, আপনার কেন এত আসক্তি? রাতদিন 'রাধী, রাধী' করছেন, ঘোর সংসারীর মত। অথচ এত ভক্ত আসছে, তাদের দিকে একটুও মন নেই। এত আসক্তি! এগুলো কি ভাল?" পূর্ব্বে কখনও কখনও এরূপ বলিয়াছি। তাহাতে মা কখনও দীনতা করিয়া বলিতেন, "আমরা মেয়েমানুষ, আমরা এই রকমই।" আজ কিন্তু মা বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এরকম কোথায় পাবে? আমার মত একটি বের কর দেখি? কি জান, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মত মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, তখন শার্শীতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।"

একদিন বলিলাম, "মা, আমার মনে খারাপ ভাব আসে না।" মা অমনি চমকিয়া উঠিয়া আমাকে বাধা দিয়া বলিতেছেন, "বলো না, বলো না, ওকথা বলতে নেই।"

আর একদিন তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি যে এত

লোককে মন্ত্র দিচ্ছেন, তাদের ত কখনও কোন খোঁজখবর রাখেন না। এদের কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোন খেয়াল নেই। গুরু শিষ্যের কত খোঁজ রাখেন, উন্নতি হচ্ছে কিনা দেখেন। আপনার এত লোককে মন্ত্র না দিলেই হয়। যে কয়টির খবর রাখতে পারবেন, সে কয়টিকে দেওয়াই ভাল।” মা বলিলেন, “তা ঠাকুর আমাকে ত নিষেধ করেন নি। তিনি আমাকে এত সব বুঝিয়েছেন, আর এটা তাহলে কি কিছু বলতেন না? আমি ঠাকুরের উপর ভার দিই। তাঁর কাছে রোজ বলি, ‘যে যেখানে আছে, দেখো।’ আর জান, এসব ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র, তিনি আমাকে দিয়েছিলেন— সিদ্ধমন্ত্র।”

একদিন বীজমন্ত্রের প্রসঙ্গে সব মন্ত্র আমাকে বলিয়া বলিলেন, “আমার সব থলে ঝেড়ে দিলুম। তুমি মন্ত্র দেবে নাকি?

আমি— না মা, নিজেরই হল না।

মা— তা দিলেই বা। দোষ কি? তোমরা দিতে পার।

আমি— মা, আমাকে সর্ব্বত্যাগী করে দিন, যেন কিছুতেই টান না থাকে।

মা— সর্ব্বত্যাগী ত আছই, আবার কি দুটো শিং বেরুবে?

আর একদিন জয়রামবাটীতে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলাম, "কি করে ভগবানলাভ হয়? পূজা, জপ, ধ্যান— এসবে হয়?"

মা— কিছুতেই না।

আমি— কিছুতেই না?

মা— কিছুতেই না।

আমি— কিছুতেই না?

মা— কিছুতেই না।

আমি— তবে কিসে হয়?

মা— শুধু তাঁর কৃপাতে হয়। তবে ধ্যানজপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপ, ধ্যান— এ সব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘসতে ঘসতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্ব্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি হয়।

একদিন জয়রামবাটীতে খাইবার পর উচ্ছিষ্ট লইতে যাইতেছি, মা আমার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া উচ্ছিষ্ট-থালা নিজেই লইলেন। আমি বলিলাম, "আপনি কেন? আমিই নিচ্ছি।" মা তাহাতে বলিলেন, "আমি তোমার আর কি করেছি? মার কোলে ছেলে বাহ্যে করে, কত কি করে! তোমরা দেবের দুর্লভ ধন।"

—স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ

(৭)

কলিকাতা

১৩১১ সালের ২রা শ্রাবণ, রবিবার, সকালে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া পূজনীয়া গৌরী-মা, তাঁহার দুর্গা ও আমি বাগবাজারে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমার (ভাড়াটিয়া) বাড়ীতে যাই। মায়ের শ্রীচরণদর্শন করিবার আমার এই প্রথম সুযোগ ঘটিল। গাড়ীতে আসিবার সময়, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবার জন্য গৌরী-মার নিকট কাতরভাবে কাঁদিয়া জানাইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমার বাটীতে পৌঁছিয়া সর্ব্বপ্রথমে গৌরী-মা দোতলায় যান ; আমরা তাঁহার পরে যাই। উপরে গিয়া দেখিলাম, গৌরী-মা আস্তে আস্তে মার সহিত কি বলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কি কথা হইল জানি না, শ্রীশ্রীমা গৌরী-মাকে বলিলেন, "তুমি সেদিন সুরেনের বৌকে নিয়ে এসেছিলে, আজ এই বৌমাকে এনেছ, তোমার এই কাজ।" এই কথা শুনিয়া গৌরী-মা জোরে বলিলেন, "দেবে না ত কি ? এসেছ কিসের জন্যে ?" তাহা শুনিয়া মা আস্তে আস্তে বলিলেন, "তবে এস মা, এখন সময় ভাল আছে।" পরে দুর্গাকে লইয়া ঠাকুরঘরে

গিয়া মা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। গৌরী-মা ও আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুর্গার দীক্ষা হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে সে বাহিরে আসিল। এইবার আমি ঠাকুরঘরের ভিতর গেলাম। মা ভিতরেই ছিলেন। আমি ভিতরে গেলে দরজা বন্ধ করা হইল। গৌরী-মা ও দুর্গা বাহিরে বারান্দায় রহিলেন। মা আমাকে পূজার আসনে বসাইলেন এবং আমাকে দিয়া ঠাকুরের পূজা করাইলেন। দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কুলগুরু আছে?" আমি বলিলাম, "আছে।" মা বলিলেন, "আবার দীক্ষা নেবে না ত?" আমি বলিলাম, "না।" পরে ঘরের ভিতর হইতে গৌরী-মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরদাসি, কোন্ ঠাকুর দেব?" গৌরী-মার কথামত আমার দীক্ষা হইল। আমি পূর্ব্ব হইতেই জপ করিতাম। মা আমাকে জপ করিতে বলিলেন; কিন্তু তখন আমার শরীর ও মনের অবস্থা এমন হইল যে, আমি জপ করিতে পারিলাম না। মা নিজে আমার কর ধরিয়া জপ করাইলেন। তারপর ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হইল। গৌরী-মা ভিতরে আসিলেন ও আমাকে মার পায়ে ফুল দিতে বলিলেন। আমিও তাহাই করিলাম।

আমরা যখন মার বাড়ীতে পৌঁছাই, তখন মা গঙ্গাস্নানে

যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমরা যাওয়ায় তাঁহার আর গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইল না। আমরা তথায় প্রসাদ পাইলাম ও সমস্ত দিন থাকিলাম।

মা ঐ দিন একটি চাবি খুঁজিতেছিলেন। চৌকীর নিকট একটি চাবি দেখিতে পাইয়া মাকে বলিলাম, "এখানে একটি চাবি রয়েছে।" মা যে সেই চাবিটিই খুঁজিতে-ছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। চাবিটিতে হাত দিতেও আমার সাহস হইল না। মা চাবিটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া আমায় বলিলেন, "জন্ম-এয়োস্ত্রী হও, মা।"

মাকে ছাড়িয়া আসিতে আমার যেন ইচ্ছা হইতেছিল না। আসিবার সময় মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। মা বলিলেন, "আবার এসো মা, চিঠি দিও।"

ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর দিন সেজদিদি ও আমি কাঁকুড়-গাছির যোগোদ্যানে উৎসব দেখিতে গিয়াছি। তথায় গিয়া দেখিলাম শ্রীশ্রীমা আসিবেন বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন হইতেছে। ঠাকুরঘরের নিকট তাঁহার বসিবার জন্য একটি স্থান ভাল করিয়া ঘেরা হইয়াছে। মা আসিবেন, তাঁহার দর্শন পাইব, ভাবিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইতেছে। মা আসিলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। রাস্তায় নূতন কাপড় পাতা হইল, শাঁখ বাজিতে লাগিল। সেই কাপড়ের উপর দিয়া মা

আসিলেন, সঙ্গে লক্ষ্মীদিদি। মাকে দেখিবার জন্য অনেকে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমরাও তাঁহাকে দর্শন করিতে সেই-দিকে গেলাম। দেখিলাম, মা ধীরভাবে আসিতেছেন, তাঁহার ঘোমটা দেওয়া রহিয়াছে। ঘোমটার মধ্য হইতে আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এসেছ, মা?" অনেক লোকের ভিড় হইল; আমি কিছু বলিতে পারিলাম না, ঘাড় নাড়িলাম মাত্র। সেজদিদি পুত্রশোকে বড় কাতর ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি মাকে কখনও দেখি নি, তুমি মাকে বলো যেন আমায় কৃপা করেন।" বহুলোকের ভিড়ের ভেতর আমি মাকে বলিবার সুযোগ পাইতেছিলাম না। একটু ফাঁকা হইলেই মাকে বলিলাম, "মা, এই আমার জা।" এই কথা বলিতেই মা সস্নেহে বলিলেন, "সব জানি, মা।" আমার আর কোন কথা মাকে বলা হইল না।

একদিন সেজদিদি ও আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরঘরে ঠাকুরদর্শন করিয়া আসিলাম। মা বলিলেন, "বস।" আমরা বসিলাম। নানা কথাবার্ত্তার পর আমি কথায় কথায় মাকে বলিলাম, "মা মহামায়া, বাপ-মা স্বামি-পুত্র দিয়ে বেশ ভুলিয়ে রেখেছেন!" তাহা শুনিয়াই মা বলিলেন, "ও কথা বলো না। আমি ভুলিয়ে রেখেছি! সংসারীদের দুঃখকষ্ট

দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। কি করব, মা, তারা চায় না।”

আর একদিন সেজদিদির সহিত মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। নানা কথার পর সেজদিদি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, ঠাকুর কোথায় ?” মা বলিলেন, “মা, ঠাকুর আর কোথায় ? তিনি ভক্তের নিকটে। যেখানে সাধুরা শৌচাদি করে সেখানেও যদি সংসারীরা যায়, সেই বাতাসে তাদের মনের মলিনতা কেটে যায়।”

একদিন সেজদিদি, নদিদি, মানি ও আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। সেজদিদি মার নিকট মানি ও নদিদির দীক্ষার কথা বলিলেন। তাহাতে মা কোন কথা বলিলেন না। পরে সেজদিদি আবার দীক্ষার কথা তুলিলেন। মা বলিলেন, “কুলগুরু ত আছে, সেখানে নিলেই হয়।” কথাগুলি মা যেন একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন। একটু পরেই সেজদিদি সে ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। আমি বসিয়া ছিলাম। তখন মা বলিলেন, “দীক্ষা দেওয়া কি অমনি কথা, তার পাপের ভার সব নিতে হয় !”

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, ঠাকুরের জপ ত আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনার জপ কি বলে করব ?” তাহা শুনিয়া মা বলিলেন, “রাধা বলে পার, কি অন্য কিছু

বলে পার, যা তোমার সুবিধা হয় তাই করবে। কিছু না পার, শুধু মা বলে করলেই হবে।"

একদিন আহারাদি পর সেজদিদি ও আমি মাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া দেখিলাম সকল ঘরের দরজা বন্ধ। শুনিলাম মা বিশ্রাম করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা খোলা হইল। আমরা ঘরে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এলে, মা ?" আমরা বলিলাম, "এই খানিক্ষণ হল এসেছি। আপনি ঘুমুচ্ছেন, সেজন্য বাইরে ছিলাম।" অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আমি মাকে বলিলাম, "মা, লোকে কত দর্শন পায়, আমার ত কিছু হল না!" তাহাতে মা বলিলেন, "ওসব নীচের কথা।" ইহা শুনিয়া আমার মনে খুব আশা হইল। মনে হইল, ঐ সকল দর্শনের অপেক্ষা আমার আরও ভাল হইবে। আমি মাকে বলিলাম, "মা, আমার কিছু হবে না ?" মা বলিলেন, "হবে বই কি, মা, হবে।"

একদিন মাকে ঠাকুরের পূজা করিবার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে মা বলিলেন, "তোমরা সংসারী, ঠাকুরের পূজা পেরে উঠবে না।"

শ্রীশ্রীমাকে কোনও কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "তোমরা ঠাকুরকে ডাক, তিনি সব করবেন। চাঁদামামা সকলের মামা।"

একদিন আমার মা ও আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেছি। সুধীরা দিদি মাকে দর্শন করিয়া ফিরিতেছিলেন; পথে তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হইল। মায়ের নিকট সুধীরা দিদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে মা বলিলেন, "ঐ এক মেয়ে। বে করলে না। কেমন নিজের জোরের উপর রয়েছে, গাড়ী চড়ে বেড়াচ্ছে।"

আর একদিন মা ও আমি শ্রীশ্রীমার বাটীতে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মা, অনেকক্ষণ আসবার জন্য চেষ্টা করছি, কিন্তু গাড়ীর জন্য আসতে দেরী হল।" মা বলিলেন, "ঠাকুরদর্শন করবে, কেন গাড়োয়ানকে পয়সা খাওয়াবে? পায়ে হেঁটে আসবে।"

আমার মা ও আমি একদিন দুপুরবেলা শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। গোলাপ-মা আমাদিগকে অসময়ে যাইতে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "মাকে দর্শন করা ত নয়, মাকে বিরক্ত করা। এখন সকলের রান্না হয়ে গেছে। যদি আসবে, সকালে খবর দিতে হয়। এখন তোমাদের না দিয়ে ওরা খায় কি করে?" গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমাকেও বলিলেন, "তোমার যেমন হয়েছে—যে আসবে মা বলে, অমনি পা বাড়িয়ে দেবে!" মা বলিলেন, "কি করব, গোলাপ? মা বলে এলে আমি যে থাকতে পারি নে।"

আমার মার সঙ্গে আমি যখনই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতাম, মার ঘরকন্নার কাজ সারিয়া যাইতে রোজই বেলা হইয়া পড়িত। শ্রীশ্রীমার বাড়ী যাইবার আগেই ভয় হইত, পাছে গোলাপ-মার সামনে পড়ি। বেলায় যাইতাম বলিয়া তিনি বকিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন, "কি করবে গা? ওরা সকল দিক সেরে ত আসবে।" মাকে প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইতেছি; মা বলিলেন, "অমনি যাবে?" আমরা বলিলাম, "বাড়ীতে ভাত রান্না আছে, আপনাকে দর্শন করে চলে যাব।" মার ইচ্ছা আমাদের প্রসাদ খাওয়ান। শেষে বলিলেন, "আচ্ছা, মা, এস; গোলাপ আবার রাগ করে।" নারিকেলের মালায় করিয়া আমাদের একটু অন্ন প্রসাদ দিলেন। তাহা লইয়া আমরা বাটী ফিরিলাম।

শ্রীশ্রীমার পাদপদ্মে দিবার মানসে আমার মা ও আমি একদিন ফুল, বিল্বপত্র ও তুলসী লইয়া মায়ের বাটীতে যাই। গোলাপ-মা ত আমাদের দেখিয়াই রাগিয়া উঠিলেন। আমরা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে মাকে বলিলাম, "মা, এই ফুল এনেছি আপনার পায়ে দেব বলে।" মা বলিলেন, "দাও।" আমি বলিলাম, "মা, জল কোথা পাব?" মা বলিলেন, "ঐ যে, নাও না।" জল লইয়া সামান্যভাবে শ্রীশ্রীমার পায়ে একটু দিয়া ফুল,

বিল্বপত্র ইত্যাদি দিতে যাইতেছি, এমন সময়ে মা বলিলেন, "তুলসী-বিল্বপত্র দিও না, শুধু ফুল দাও।" শুধু ফুল মার পায়ে দেওয়া হইয়া গেলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, এ ফুল কি করব?" মা বলিলেন, "নিয়ে যাও।"

কোনও ভক্তদ্বারা আমার পূর্ব্বেকার জপকরা হরিনামের একছড়া মালা ও একছড়া নূতন রুদ্রাক্ষের মালা শ্রীশ্রীমার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। মা নূতন মালাটি নিজ হাতে জপ করিয়া দিয়াছিলেন। পুরাতন মালাটি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ও পুরান মালা।" কিন্তু ভক্তটি বলাতে উহাও জপ করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর যখন মার নিকট যাই তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "রুদ্রাক্ষের মালা কি বলে জপ করব?" মা বলিয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরিনামের মালাটিও কি ঐ বলে জপ করব?" মা বলিলেন, "ও ত হরিনামের মালা।" হরিনামের মালা জপ করিতে দেরী হয়। মা রুদ্রাক্ষের মালায় যে মন্ত্র জপ করিতে বলিলেন, সেই মন্ত্র জপ করিলে জপ তাড়াতাড়ি হইবে, ইহা মনে করিয়া আমি মাকে আবার হরিনামের মালাজপের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মা তাহা অন্তরে জানিতে পারিয়া বলিলেন, "তাই করো, শীগ্‌গির হবে।"

শ্রীশ্রীমাকে লালপেড়ে শাড়ীকাপড় দিবার জন্য সেজদিদি এক রাত্রে স্বপ্ন পান। সে জন্য তিনি একখানি লালপেড়ে শাড়ীকাপড় কিনিয়া শ্রীশ্রীমার বাটীতে যান। আমিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলাম। সেজদিদি মাকে প্রণাম করিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন ও কাপড়খানি মার পদতলে রাখিলেন। মা একটু হাসিয়া কাপড়খানি হাতে করিয়া লইলেন এবং পরিলেন। অল্পক্ষণ পরে কাপড়খানি ছাড়িয়া বলিলেন, "কি করে পরব, মা? লোকে বলবে, 'পরমহংসের স্ত্রী লালপেড়ে কাপড় পরেছে!' থাক্, এনেছ, ঐ কাপড় প'রে নাইতে যাব।" মা শীঘ্রই উড়িষ্যা যাইবেন শুনিয়া আমরা সেদিন চলিয়া আসিলাম।

তারপর তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, আমি ও সেজদিদি তাঁহার শ্রীচরণদর্শন করিতে বাগবাজারে গেলাম। পুরীর কথা অনেক হইল। তারপর মা সেই কাপড় পরিয়াছিলেন কিনা, সেজদিদি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, "হাঁ মা, পরেছিলাম, দিন কতক পরার পর একজনকে দিয়ে দিয়েছি।"

আর একবার সেজদিদি ও আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মার সহিত অনেক প্রকার কথা হইতেছে। আমরা মাকে বলিলাম, "মা, আমাদের কি হবে?" মা বলিলেন, "ঠাকুরকে ডাক।" সেজদিদি বলিলেন, "আমরা

ত ঠাকুরকে দেখি নি, আমরা আপনাকে জানি।” মা বলিলেন, “তোমরা কি আমায় ডুবে মরতে বল? যেমন, একজন ‘জয় গুরু’ বলে গুরুনামে বিশ্বাস করে নদী পার হয়ে গেল। গুরু তা দেখলেন। দেখে ভাবলেন, ‘আমার নামের এত জোর!’ তিনি ‘আমি, আমি’ করে জলে নামলেন, পরে ডুবে মরলেন।”

—শ্রীমতী শৈলবালা চৌধুরী, বসিরহাট

(৮)

একদিন আমার পুত্র হরিচরণকে লইয়া শ্রীশ্রীমার বাটীতে যাই। তখন হরিচরণের মাথা খারাপ হইয়াছে। মার কাছে গিয়া সে নানাপ্রকার এলোমেলো কথা কহিতেছে—যেমন, "ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দে" ইত্যাদি। মা প্রসাদ দিলেন। সে খাইতে খাইতে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ এদিক-ওদিক ছড়াইতে লাগিল। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "ঠাকুরবাড়ী, এঁটো ছড়াচ্ছে।" মা অমনি স্নেহভরে বলিলেন "থাক, ওর খাওয়া হলে তুমি এঁটো পেড়ে দিও।"

আমি মাকে বলিলাম, "মা, ওর কি হয়েছে—বামুন দেখলে প্রণাম করে, গরু দেখলে প্রণাম করে!" মা বলিলেন, "জীবে দয়া হয়েছে।"

এক কোজাগরী পূর্ণিমার দিন মায়ের পাদপদ্মে ফুল দিবার মানসে উপবাস করিয়া হরিচরণ ও আমি 'উদ্বোধনের' বাটীতে যাই। মার পায়ে ফুল দিয়া আমরা প্রণাম করিলাম। মা হরিচরণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীশ্রী হোক, দীর্ঘায়ু হও।"

শ্রীশ্রীমা আমাকে বলিলেন, "সকলকে দেখলে আমি শান্তি পাই ; তোমার মুখের গ্রাস উপযুক্ত ছেলে চলে গেছে, তোমাকে দেখলে বড় কষ্ট হয়।"

একদিন মাকে বলিলাম, "মা, ঠাকুরের পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।" মা বলিলেন, "ভক্তি করতে করতে হবে।" যেদিন আমি সকালে মার ওখানে যাইতাম, মা রাধুর খাওয়ার পর ঠাকুরের ভোগের আগেই আমাকে ভাত খাওয়াইতেন। বলিতেন, "পুত্রশোকে তোমার বুক শুকিয়ে গেছে, তুমি আগে খাও।" আমি বলিলাম, "একে অন্নের কষ্ট, আবার ঠাকুরের ভোগের আগেই খাব ?" মা বলিলেন, "তুমি কখনও অন্নের কষ্ট পাবে না।"

একদিন মা বলিলেন, "তোমার ছেলে কি-না দেখবার জন্য আমি অনেক পাগলকে ডেকে দেখেছি। আমি বলছি, তোমার ছেলে বেঁচে আছে। শরৎও (শরৎ মহারাজ) বলেছে, বেঁচে আছে।"

আমার ছেলে ফিরিয়া আসিবে কি-না মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, "আসবে।" তারপর মা ঠাকুরের ছবির সম্মুখে আগ তুলিলেন। কতকগুলি কাঠির উপর অনেকগুলি কাপড়ের ফালি বেশ শক্ত করিয়া জড়াইলেন। সেটি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "ওর ছেলে আসবে কি-না যদি সত্যি করে না বল, তোমার ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও গোহত্যার পাপ লাগবে।" ইতোমধ্যে কাপড়ের ফালির মধ্যস্থিত কাঠিগুলি আলগা হইয়া উপরে উঠিয়াছিল এবং মা উহা ধরিতেই ঝরিয়া পড়িয়া গেল। মা বলিলেন,

"এই দেখলে, মা, আগ তোলা হল। তোমার ছেলে আসবে। তুমিও বাড়ীতে নিজে করে দেখ।" আমি মার কথামত বাড়ীতে আসিয়া ঐরূপ আগ তুলিলাম। তাহাতেও ঐরূপ ফল হইল।

আমার মাকে সঙ্গে লইয়া একদিন শ্রীশ্রীমার জন্য একখানি কাপড় লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। একটি লোককে ঐ কাপড় কিনিতে দিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভাল কাপড় আনিতে পারে নাই। কাপড়খানি মাকে দিয়া আমি বলিলাম, "মা, এ কাপড়খানি ভাল নয়, আমার পছন্দ হয় নাই।" মা তৎক্ষণাৎ নিজের কাপড় ছাড়িয়া আগ্রহ করিয়া ঐ কাপড়খানি পরিলেন ও বলিলেন, "দেখ, আমি তোমার কাপড় পরলাম। দুঃখ করো না। আমি এই কাপড়খানা পরে গঙ্গাস্নান করব।"

একদিন বলরাম বাবুর বাড়ীতে আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে চাই। সেই সময় একজন লোক মার নিকটে টাকা রাখিয়া বলিল, "মা, অমুকের অসুখ, যাতে সে ভাল হয় তাই করবেন।" মা বলিলেন, "টাকা নিয়ে যাও, জন্মালেই মৃত্যু আছে। আমি কি করব?" কিছুদিন পরে শুনা গেল ঐ লোকটি মারা গিয়াছে।

শ্রীমতী—

(৯)

আমি একদিন মাকে বলিয়াছিলাম, “মা, ঠাকুরকে আমি যে দিন প্রথম দর্শন করি, তাঁর দেহ থেকে একটা জ্যোতি বেরুচ্ছিল। কাচের উপর রোদ পড়লে যেমন আভা বেরোয় তেমনি।” ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, “মা, তুমি ঠিক দেখেছ। আমি যখন তাঁকে তেল মাখাতুম, মাঝে মাঝে ঐরূপ জ্যোতি দেখতে পেতুম।”

একদিন তাঁহার ভাইঝি নলিনী রাগ করিয়া সমস্ত দিন উপবাসী ছিল। মার অনেক চেষ্টাতে কোন ফল হয় নাই। শেষে মা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমাকে তোমার পিসীমা মনে করো না। আমি মনে করলে এক্ষুনি এ দেহ ছেড়ে দিতে পারি!”

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে মা একদিন নিজের বুকে হাত রাখিয়া ললিতকে (কমলেশ্বরানন্দকে) বলিয়াছিলেন, “আমি যদি ঠাকুরের কাছে যাই তোমরাও নিশ্চয় যাবে।”

শ্রীমতী—

উদ্বোধন

আমি তখন কলিকাতার ১৭নং বোসপাড়া লেনে সিষ্টার নিবেদিতার স্কুলে পড়ি। একদিন স্কুলের ছুটির পর সুধীরা দিদি আমাদের চার-পাঁচ জনকে সঙ্গে লইয়া মার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মা ঠাকুরঘরে আসনে বসিয়া আছেন। কুসুম দিদি একখানি বই পড়িতেছেন। আমরা প্রণাম করিলে মা বলিলেন, "বস মা।" সুধীরা দিদিকে বলিলেন, "ভাল আছ, মা? স্কুলের এই ছুটি হল? এই মেয়েরা তোমার কাছে পড়ে?"

সুধীরা দিদি— হাঁ, মা, এরা আমাদের কাছে পড়ে।

মা— মেয়েগুলি বেশ। (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) এটি কাদের মেয়ে? বেশ মেয়েটি।

সুধীরা দিদি— এটি বামুনের মেয়ে, কাছেই বাড়ী।

এই সব কথার পর মা বলিলেন, "কুসুম, পড়, এরা শুনবে।" পড়া আরম্ভ হইল। বইখানি বোধ হয় 'কৃষ্ণচরিত' ছিল। কৃষ্ণের দই, দুধ কাড়িয়া খাওয়ার বর্ণনা শুনিয়া মা এবং অপর সকলেই খুব হাসিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "কি দুষ্ট ছেলে!"

একটু পরেই আমাদের গাড়ী আসিল। মা বলিলেন, "তোমরা এখনই যাবে? একটু বসলে হত না?" সুধীরা দিদি উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "তবে সকাল করে এস, মা।" প্রসাদগ্রহণান্তে আমরা মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম। মা বলিলেন, "এস মা, আবার এস।"

আর একদিন বৈকালে সুধীরা দিদি আমাকে লইয়া মায়ের বাড়ী গেলেন। মা তক্তাপোশের উপর একখানি মাতুর পাতিয়া শুইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "বস, মা।" আমরা প্রণাম করিয়া বসিলাম।

মা— তোমাদের স্কুলের ছুটি হল? কটা বেজেছে?

সুধীরা দিদি— আজ আমাদের সকাল সকাল ছুটি হয়েছে, এখন সাড়ে-তিনটে বেজেছে। তাই এদের নিয়ে এলুম।

মা— তা বেশ করেছ।

পরে একটি মেয়ের কথা উঠিল। মা বলিলেন, "দেখ না, মা, শ্বশুরঘর করবে না, আমার কাছে এসেছে। জামাই কাল বলে মনে ধরে নি। কাল বলে কি তুই তাকে নিবি নে? সে তোর স্বামী। এ সব কি রকম মেয়ে, মা, তা জানি নে। আবার শুনি তার স্বভাব খারাপ; সেই জন্যেও যেতে চায় না। তা হলেই বা, তোকে ত অযত্ন করে নি। স্বামী ত বটে। কি জানি মা, এ সব মেয়ে

কি রকম! লোকে শুনলে ভাববে কি? যা মন চায় করুকগে।" ইহা বলিয়া তিনি কাপড় কাচিতে গেলেন। বিদায় লইবার সময় আমরা প্রণাম করিয়া বলিলাম, "যাই, মা।" মা বলিলেন, " 'যাই' বলতে নেই, 'আসি' বলতে হয়। সময় পেলেই আবার এসো, মা।"

এক শনিবার সুধীরা দিদি আমাদের কজনকে লইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিবার পথে মার বাড়ীতে আসিলেন। মা তক্তাপোশের উপর শুইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া যোগেন-মা বলিলেন, "এত রাত্রে তোমরা কোথা থেকে?" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এসেছে?" যোগেন-মা বলিলেন, "সুধীরা এসেছে।" মা শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম।

মা— এত রাত্রে কোথা থেকে এলে?

সুধীরা দিদি— আজ এদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলুম, আরতি দেখে ফিরতে রাত হয়ে গেল। মনে করলুম, এত কাছে এসে চলে যাব? তাই এখানে একবার এলুম।

মা "বেশ করেছ" বলিয়া আবার শুইলেন। সুধীরা দিদি তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। আমি কাছে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। সুধীরা দিদি মার কাছে দক্ষিণেশ্বরের গল্প করিতে লাগিলেন।

মা— তোমরা নবত দেখেছ ত? আমি ঐ নবতের নীচের ঘরে থাকতুম। সিঁড়ির নীচে রান্না করতুম।

সুধীরা দিদি— হাঁ, মা, দেখে এলুম। এখনও সামনের দিকে দরমা দিয়ে ঘেরা সিঁড়ির নীচে একটা উন্নুন রয়েছে; আর মেছুনীদের ঝুড়িগুলি আপনার সেই বারান্দায় বসান রয়েছে। আমি মেয়েদের আপনার কথা বলছিলুম —আপনি কি ভাবে ঐ ঘরে ছিলেন। আচ্ছা, মা, আপনি কি করে ঐ ঘরে থাকতেন? কোন কষ্ট হত না?

মা— শৌচের আর নাওয়ার জন্যই যা কষ্ট হত। বেগধারণ করে করে শেষে পেটের রোগ ধরে গিয়েছিল। আর ঐ মেছুনীরা ছিল আমার সঙ্গী। তারা গঙ্গা নাইতে এসে ঐ বারান্দায় চুবড়ি রেখে সব নাইতে নাবত; আমার সঙ্গে কত গল্প করত। আবার যাবার সময় চুবড়ী-গুলি নিয়ে যেত। রাতে জেলেরা সব মাছ ধরত আর গান গাইত, শুনতুম। ঠাকুরের কাছে কত ভক্ত আসত, গানকীর্ত্তন হত, তাই শুনতুম আর ভাবতুম—আমি যদি ঐ ভক্তদের মত একজন হতুম ত বেশ ঠাকুরের কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম। ঐ যোগেন, গোলাপ সব জানে। ওরা আমার কাছে যেত, আর কখনও কখনও থাকত।

মা যোগেন-মার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কি

আনন্দই তখন ছিল, যোগেন !" বলিয়া যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন।

যোগেন-মা বলিলেন, "সে যে কি আনন্দ তা কি মুখে বলা যায় গো ? মনে করলে আজও প্রাণ কি রকম করে ওঠে !"

এইবার মা আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাত হয়ে গেল, বাড়ীতে বকুনি খাবে না ?"

সুধীরা দিদি— তা আজ একটু বকুনি খাবে। ওদের বাড়ীর লোকেরা এখানকার উপর ভারী চটা। যদি শোনে যে এখানে এসেছে, তা হলে মাথা আর রাখবে না।

মা— তাই ত, মা, বাছারা কত বকুনি খাবে ! কত রকমের লোক আছে তার কি ঠিক আছে ? যারা সমাজ নিয়ে চলে, তাদের কেবলই ভয়। তোমরা এস, মা। আহা, কত বকবে !

সুধীরা দিদি— এইটুকু যদি সহ্য না করতে পারে তাহলে ওরা করবে কি ? আপনার আশীর্ব্বাদে ওদের ভয় থাকবে না।

মা— ঠাকুরের কৃপায় সব সোজা হয়ে যাবে। যদি বকে কোন কথাটি বোলো না। সংসারে কতরকম লোক থাকে। সব সহ্য করে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স—তিনটে স। যে সয় সেই রয়।'

আমাদের জন্য ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রক্ষা কর।" আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। ছুটির ভিতর একদিন দুপুরবেলায় সুধীরা দিদি এবং আমরা তিন জন মার বাড়ী গিয়াছি। মা আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঘরে বস। আমি ভোগ দিয়া আসি।" কিছুক্ষণ পরে মা ফিরিয়া আসিলে আমরা প্রণাম করিলাম। মা আমাদের কুশলপ্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন বাড়ীতে বকেছিল?" আমরা বলিলাম, "বেশী খাই নি। সে আমাদের গায়েও লাগে নি।"

আহারান্তে মা সুধীরা দিদিকে হাতেমাখা প্রসাদ দিলেন। আমাদের মধ্যে দুইজন বিধবা। তাহারা সেই প্রসাদ খাইতে একটু ইতস্ততঃ করাতে মা বলিলেন, "প্রসাদে দোষ নেই, তোমরা খাও, মা।"

তারপর মা একটু শুইলেন এবং আমাদেরও মেজেয় মাদুর পাতিয়া শুইতে বলিলেন। বৈকালে মা ঠাকুর তুলিয়া আমাদের প্রসাদ দিলেন এবং বারান্দায় বসিয়া সুধীরা দিদির সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। একটি বউ একখানি কর্পেটের তৈয়ারী গোপালের ছবি মার হাতে দিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। সেখানি দেখিয়া মা বলিলেন, "বউ মা, তুমি এখানি করেছ?" বউ বলিল, "হাঁ, মা।"

মা বলিলেন, "আহা, বেশ হয়েছে। কি সুন্দর মুখের ভাব! কেমন করেছে দেখ।" বলিয়া আমাদের সকলকে দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "বেশ হয়েছে, না?" আমরা বলিলাম, "হাঁ।" তিনি সেখানি আবার দেখিয়া মাথায় স্পর্শ করিয়া তুলিয়া রাখিতে বলিলেন এবং পরে বউটির বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে প্রসাদ দেওয়াইলেন।

গোলাপ-মা আসিতেই মা তাঁহাকে ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন, "কেমন সুন্দর হয়েছে দেখ!" সেই বউকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই বউমা করেছে।" গোলাপ-মা সেখানি দেখিয়া বলিলেন, "সবই বেশ ভাল হয়েছে, কেবল বাঁ হাতটা একটু মোটা হয়েছে।" আমরা হাসিতে লাগিলাম। মাও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গোলাপ এসে খুঁত বার করলে। ওদের পছন্দ আলাদা, মা। গোলাপ অনেক দেখেছে শুনেছে কি-না, তাই পছন্দ হয় না। গোলাপের কাজ বড় পরিষ্কার; আবার অনেক রকম কাজ জানে। ঠাকুরের যত সব জিনিস, সব গোলাপের তৈরী। আবার ভক্তদের মশারি, বালিশ, তার ওয়াড়, সব গোলাপ করে। শরীরে একটুও আলস্য নেই।"

সন্ধ্যার একটু আগে বউটি মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছে। মা বলিলেন, "আবার এস, মা।"

যোগেন-মা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। অন্যান্য কথার পর মা তাঁহাকেও সেই ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন, "কেমন করেছে দেখ! কি সুন্দর মুখের ভাব!" যোগেন-মা বলিলেন, "বেশ ত করেছে! কে করেছে? বড় চমৎকার হয়েছে ত!" মা সেই বউয়ের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "গোলাপ বলেছে বাঁ হাতটা মোটা হয়েছে।" যোগেন-মা বলিলেন, "ওর কথা ছেড়ে দাও।"

সন্ধ্যা হইলে মা ঠাকুর প্রণাম করিয়া, "হরিবোল, হরিবোল, গুরুদেব, গুরু ভরসা" এই সব বলিয়া গঙ্গার দিকে ফিরিয়া প্রণাম করিলেন। মা ঘরে আসন পাতিয়া বসিলেন ও একটু গঙ্গাজল লইয়া জপ করিতে বসিলেন। আরতি আরম্ভ হইল। যোগেন-মা ঠাকুরের আরতির সঙ্গে মাকেও আরতি করিতে লাগিলেন। একঘর লোক বসিয়া জপ করিতেছে। কি চমৎকার দৃশ্য!

অক্ষয়তৃতীয়ার দিন আমার সঙ্গীদের মধ্যে দুইজনের দীক্ষা হইয়া গেল। আমার ভাগ্যে সেদিন আর হইল না, কারণ আমি কলিকাতায় ছিলাম না। ইহার কিছু পরে একদিন বিকালে আমি সুধীরা দিদির সহিত মার বাড়ী যাইলাম। মার দেশে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়া হয় নাই। আমরা প্রণাম করিয়া বসিতেই মা বলিলেন, "এস মা।" সুধীরা দিদির প্রশ্নের উত্তরে মা অন্য কথার

পর বলিলেন, "ছোট বউয়ের মাথাটা বড় গরম হয়েছে। ও দেশে গেলেই ভাল থাকে। আর রাধুর বিয়ে। এই সবের জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে। সেই দিনই যাওয়ার সব ঠিক ছিল। কিন্তু দিনটা তত ভাল নয় বলে পেছিয়ে গেল।" আরতির পর মা একটু শুইলেন। সুধীরা দিদি তাঁহার পা টিপিয়া দিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "একটু জোরে জোরে দাও, মা। কাল পূর্ণিমা কি-না, তাই পায়ের বাতটা বেড়েছে। দেখনা, এই বাতটা এমন আশ্রয় করেছে যে যাবার নাম নেই। কত দিন হয়ে গেল তার ঠিক আছে কি? যখন দক্ষিণেশ্বরে থাকি তখন থেকে হয়েছে।"

পা টিপিয়া দিতে মা একটু ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমাদের গাড়ী আসিতেই আমরা ঠাকুর প্রণাম করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় মা উঠিয়া বলিলেন, "তোমরা যাচ্ছ? আবার এসো।" যোগেন-মা আমার মন্ত্র লইবার কথা মাকে বলায় তিনি বলিলেন, "কাল সকালে এসো।"

পরদিন সকালে মার বাড়ী গিয়া দেখি, মা ঠাকুরপূজা শেষ করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইবার যোগাড় করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এস মা, তাড়াতাড়ি তোমাকে মন্ত্র দিয়ে আমি নাইতে যাব।" মন্ত্র দেওয়া শেষ হইলে মা বলিলেন, "ঐ ফুলগুলি আমার পায়ে দাও।" আমি

ভাবিতেছি, কি বলিয়া দিব। মা তখন ফুলগুলি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, " 'আমার যা কিছু সব তোমায় দিলুম' বলে ফুলগুলি আমার পায়ে দাও।" আমি ঐরূপ করিলে তিনি ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই তোমার সর্ব্বস্ব। এঁকে ডেকো, তাহলেই তোমার সব হবে।"

মায়ের আদেশে তাঁহার পায়ে আমি তেল মাখাইয়া দিলাম। স্নানাদির পর সুধীরা দিদি আমাদের যাওয়ার কথা বলিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা এখনই যাবে কি, মা? প্রসাদ পেয়ে বিকালে যেও।" যোগেন-মা উপরে আসিতেই মা তাঁহাকে বলিলেন, "এরা বাড়ী যেতে চাচ্ছে।" যোগেন-মা বলিলেন, "এখুনি যাবে কি? মন্ত্র নিয়ে প্রসাদ পেয়ে যাবে। আমি ওদের খাবার কথা বামুনকে বলে এলুম।" মা বলিলেন, "আমিও বলেছি বিকালে যেতে।"

যোগেন-মা বাড়ী যাইবেন, মাকে প্রণাম করিলেন। মা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বড় বেলা হয়েছে। এখানে খেলে হত না? আবার গিয়ে রান্না করে খেতে কষ্ট হবে।"

যোগেন-মা বলিলেন, "না, মা। মা রয়েছেন, আর তিনি সব যোগাড় করে রেখেছেন। আমি খালি একটু রাঁধব।" মা বলিলেন, "আর বেলা করো না, মা, এস গিয়ে। বড় রোদ ফুটেছে, অতটা রাস্তা যেতে হবে।"

তারপর ললিত বাবুর স্ত্রী আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মেয়েটি মারা গিয়াছে, সেজন্য বড় কাতর আছেন। মা তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "আহা, মা, তিনটিই গেল! একটিও কি থাকতে নেই? আবার ললিতটির কি রকম অসুখ! ঠাকুরের কৃপায় ভাল হলে হয় মা। ললিতটি বেঁচে থাকে, তবু সান্ত্বনা।" মা তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া বলিলেন. "খাও মা, কি রোগাই হয়ে গেছ! শরীরে আর কিছু নেই।" বিদায় লইবার সময় সুধীরা দিদি মাকে বলিলেন, "আবার কতদিনে আপনাকে দেখব?" মা বলিলেন, "আমি শীঘ্রই ফিরব। তুমি রাধুর বিয়েতে যেও না।" সুধীরা দিদি কিছু না বলিয়া বলিলেন, "আজ আসি, মা।" মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি এলে আবার এসো।"

মা দেশ হইতে ফিরিলে আমি ও সুধীরা দিদি একদিন বিকালে মার বাড়ী গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম। সুধীরা দিদি বলিলেন, "মা, আপনি বড় কাল ও রোগা হয়ে গেছেন।" মা বলিলেন, "আমাদের দেশটা মেঠো দেশ কি-না, তাই রং কাল হয়ে যায়। আর খাটুনিও পড়েছিল।"

সিষ্টার নিবেদিতা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। মা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি ছোট পশমের

তৈয়ারী পাখা তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, "আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।" সিষ্টার উহা পাইয়া আনন্দে একবার মাথায় রাখেন, একবার বুকে ঠেকান, আর বলেন, "কি সুন্দর, কি চমৎকার!" আবার আমাদের দেখান এবং বলেন, "কি সুন্দর মা করেছেন দেখ!" মা বলিলেন, "কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ! আহা, কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে (স্বামিজী) কি ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্ব্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা!"

সিষ্টার দার্জ্জিলিং যাইবেন সেই কথা মাকে বলিতেছেন। রাধু আসিলে মা তাহাকে বলিলেন, "দিদিদের প্রণাম কর, রাধু।" সুধীরা দিদি বলিলেন, "না, না, থাক্। ও আবার আমাদের নমস্কার করবে কি?" মা বলিলেন, "তোমরা দিদি, তোমাদের নমস্কার করবে না?" একটি ব্রহ্মচারী আসিয়া ভক্তদের মাকে প্রণাম করিবার কথা বলিয়া গেলেন। "তাদের আসতে বল" বলিয়া মা একখানি চাদর ঢাকা দিয়া বসিলেন। যথাসময়ে আমরা মার আশীর্ব্বাদ লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

একদিন সিষ্টার আমাদের বলিলেন, "মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ

কর।” সকালের পরিবর্ত্তে চারটার সময় মার গাড়ী আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ী হইতে নামিতেই সিষ্টার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুর-দালানে বসাইলেন। মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিষ্টার একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, “বেশ পদ্যটি।” তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিষ্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, “বেশ ত শিখেছে মেয়েরা!” পরে সিষ্টার বিশ্রামের জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।

যেবার সিষ্টার নিবেদিতার দেহত্যাগ হয়, সেবার সুধীরা দিদির খুব অসুখ হয়। তাঁহার জন্য মার কি ভাবনা! বলেন, “ও ঠাকুর, সুধীরা যাবে কি? তার যে কত কাজ বাকী।” বলেন আর কাঁদেন।

শ্যামপুকুরের পিসীমাকে মা বলিলেন, “তুমি একবার সুধীরার খবরটা এনে দিতে পার, মা? আহা, তার বড় অসুখ।” তিনি স্বীকৃতা হইলে মা তাঁহার হাতে ঠাকুরের

চরণামৃত, বেদানা ইত্যাদি দিয়া বলিলেন, "এগুলি তাকে দিও ; আর খবরটা আমাকে এনে দেবে, কেমন আছে। আমি ঠাকুরের কাছে তার জন্য তুলসী দিচ্ছি।"

সুধীরা দিদি আরোগ্যলাভ করিলে তিনি, আমি ও সিষ্টার কৃষ্টীন একদিন সন্ধ্যার সময় মার বাড়ী যাইলাম। আরতির পর আমরা প্রণাম করিয়া বসিতেই মা সুধীরা দিদিকে বলিলেন, "সেরেছ, মা ?" সুধীরা দিদি বলিলেন যে অনেকটা সারিয়াছেন, তবে সাবধানে আছেন। মা বলিলেন, "তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়েছিল। যা হোক, ঠাকুরের কৃপায় সেরেছ, মা। এই নিবেদিতাটি গেল, আবার তোমার অসুখ—শুনে ভাবি, সুধীরা গেলে স্কুল চালাবে কে ? (সিষ্টার কৃষ্টীনকে লক্ষ্য করিয়া) আহা, দুটিতে একসঙ্গে ছিল, এখন একলা থাকতে কত কষ্ট হবে ! আমাদেরই তার জন্য প্রাণ কেমন করে, তোমার ত আরও বেশী হবে, মা। কি লোকই ছিল ! তার জন্য আজ কত লোক কাঁদছে।" বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। পরে মা সিষ্টার কৃষ্টীনকে স্কুল সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সুধীরা দিদি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাইবেন বলায় মা ঐ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র যেও ; শরীরটা সারাতে হবে ত ?"

ইহার বহু দিন পর একদিন মার চরণদর্শনে যাইতেছি। সঙ্গে — ডাক্তারের স্ত্রী। এবারে সুধীরা দিদি সঙ্গে না থাকায় আমার বিশেষ ভয় হইতেছিল, মা যদি আমায় চিনিতে না পারেন। আমরা ঠাকুরঘরে গিয়া দেখি, মা পূজা করিয়া উঠিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি মা, এসেছ? অনেকদিন আসনি যে? তোমার জন্য কত ভাবছি। কোথায় আছ?" আমি প্রণাম করিতেই মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া সুধীরা দিদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "তিনি কলকাতায় এসেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি।" মা আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া আমার প্রাণটা আনন্দে ভরিয়া গেল।

সেদিন বলরাম বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল, সকলেই যাইবেন। রাধুর শরীর ভাল নাই। সেজন্য মা বলিলেন, "এ ত যাবে না, রাধু আর এ থাকবে এখন।"

মাকে লইতে গাড়ী আসিয়াছে। যাইবার সময় মা আমাদের বলিয়া গেলেন, "তোমরা দুজনে খেলা কর। আমি শীগ্‌গির আসব।" আবার রাধুকে বলিলেন, "দিদির সঙ্গে খেলা কর মা, কেমন? আমি আসি।"

চারটার পর মা ফিরিয়া আসিলেন। আমাদেরও সেই গাড়ীতে যাওয়া স্থির হইল। মা আমাকে তাড়াতাড়ি

কতকটা প্রসাদ দিয়া বলিলেন, "আহা! মা, আমরা এলুম, আর তুমি চললে? কি করবে বল? ওদের সঙ্গে এসেছ, আবার ওদের সঙ্গে যেতে হবে ত? বৌমাটি অনেকক্ষণ এসেছে।"

রাধু— কেন, দিদি থাকুক না।

মা— থাকবার কি যো আছে, মা?

রাধু— না, থাকুক। ওরা চলে যাক্ না।

মা— পাগল আর কি! ও থাকলে তাদের চলবে কেন? না, মা, তুমি তাড়াতাড়ি এস গিয়ে, নীচে ডাকাডাকি করছে।

আমি মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি। মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "কতদিন যে তোমায় এমনি করে থাকতে হবে, মা, ঠাকুরই জানেন। আবার এসো, মা" বলিয়া সিঁড়ি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিলেন। সেদিন মায়ের কি করুণা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। "এটা কর, ওটা কর" বলিয়া কত আদেশই করিয়াছিলেন।

কাশী

পৌষমাসে বড়দিনের ছুটিতে শ্রীশ্রীমার কাছে থাকিবার ইচ্ছায় সুধীরা দিদি আমাদের কয়জনকে লইয়া কাশী

গেলেন। মার সহিত দেখা করিলে তিনি অন্যান্য কথার পর যোগেন-মার সংবাদ লইলেন ও বলিলেন, "আহা! মা, যোগেনটি আসতে পারলে না। যা অসুখ হয়েছিল! ঠাকুর ও মা রক্ষা করেছেন। যোগেনের জন্য বড় ভাবনা হয়েছিল।" কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সুধীরা দিদি প্রভৃতি আমাদের থাকিবার জন্য যে বাড়ী ভাড়া হইয়াছে তাহা দেখিতে গেলেন।

মা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বাড়ী প্রায় নিস্তব্ধ। সকলেই বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় বারান্দা হইতে একটি গান শোনা গেল—

"আমার মা কোথায় গেলে ?
অনেকদিন দেখি নাই, মা, নে আমায় কোলে।
তুই গো কেমন জননী, সন্তানে হও এত পাষাণী,
দেখা দে মা, আর কাঁদাস নে তনয়া বলে।"

গানটি এত মৃদুস্বরে শোনা যাইতেছিল যে আমার মনে হইল, কে যেন খুব দূরে কাঁদিতেছে। মা হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, "কে গান গাচ্ছে? চল ত মা, বারান্দায় গিয়ে দেখি।" গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটি মেয়ে এই গানটি গাহিতেছে এবং তাহার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। মা সেখানে বসিতেই সে মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা,

আমার অনেক দিনের আশা আজ পূর্ণ হল। আজ আমার কি আনন্দ হচ্ছে বলতে পারছি না, মা।" মা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

মেয়ে— আমি আপনার ভিখারিণী মেয়ে, মা।

মা— কোথায় থাক ?

মেয়ে— অন্নপূর্ণার দরজায়, নয় দশাশ্বমেধঘাটে বেহারী-বাবার মন্দিরের কাছে বসে থাকি।

মা— ভিক্ষাতে তোমার বেশ চলে ত ?

মেয়ে— আপনার আশীর্ব্বাদে বেশ চলে যায়। এ সবের জন্য কোন ভাবনা নেই। অন্নপূর্ণার দয়ায় এখানে কেউ ত উপোস করে থাকে না, মা। কিসে একটু ভক্তি হয় তাই ভাবি, মা।

মা—তা হবে বই কি, মা ; তুমি এমন স্থানে রয়েছ। এখানে বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ বিরাজ করছেন ; তাঁদের কৃপায় সব হয়ে যাবে।

মা তাহাকে আর একটি গান গাইতে বলিলেন। সে গাহিল—

"মা, আমারে দয়া করে
শিশুর মত করে রাখ,
শৈশবের সৌন্দর্য্য ছেড়ে
বড় হতে দিও নাক।

সুন্দর সরল প্রাণ,
মান অপমান নাহি জ্ঞান,
হিংসা নিন্দা লজ্জা ঘৃণা,
কিছুই সে জানে নাক।"

মা— আহা, কি চমৎকার গানটি!

মেয়ে— অনেক দিন ধরে আপনাকে দেখবার বড় সাধ ছিল। আপনি এখানে আছেন শুনে আসব ভাবি, কিন্তু ভয় করে পাছে কেউ-কিছু বলে।

মা— কেউ কিছু বলবে না। তোমার যখন ইচ্ছা এসো।

মা তাহাকে প্রসাদ দিতে বলিলেন। সে প্রসাদ পাইয়া বিদায় লইতেছে। মা তাহাকে বলিলেন, "আবার এসো, মা।" পরে তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "মেয়েটির বেশ ভক্তি আছে।"

কাশীতে যে কয়দিন ছিলাম, প্রত্যহ দুইবেলাই মায়ের কাছে যাইতাম। একদিন বৈকালে যাইয়া দেখি, মা অদ্বৈত আশ্রমে ভাগবতপাঠ শুনিতে যাইতেছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমরা মঠে ভাগবত শুনতে যাচ্ছি, কে একজন কথক পাঠ করবেন। তোমরা যাবে? চল না।" আমরা তাঁহার সঙ্গে গেলাম। দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠ হইল। পাঠ শেষ হইলে মা একটি টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,

"আহা, কি চমৎকার পাঠ! কথকটি বেশ বলেছেন।"

একদিন সন্ধ্যার পর সুধীরা দিদি ও আমি মার কাছে বসিয়া আছি; মা বলিলেন, "যে একবার ঠাকুরকে ডেকেছে তার আর ভয় নাই। ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে কৃপা হলে তবে প্রেমভক্তি হয়। এই প্রেমটা অতি গোপনীয় জিনিস, মা। ব্রজগোপীদের প্রেমভক্তি হয়েছিল। তারা এক কৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছুই জানত না। নীলকণ্ঠের গানে আছে, 'ও প্রেমরত্নধন রাখতে হয় অতি যতনে।'" ইহা বলিয়া মা গানটি গাহিলেন। কি মিষ্ট গলায় মা এই গানটি গাহিয়াছিলেন তাহা আজ পর্য্যন্ত যেন কানে লাগিয়া আছে। গান শেষ হইলে মা বলিলেন, "আহা, নীলকণ্ঠের গান কি চমৎকার! ঠাকুর বড় ভালবাসতেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, নীলকণ্ঠ কখনও কখনও তাঁর কাছে আসত ও গান গাইত। কি আনন্দেই ছিলাম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত!"

একদিন মার বাড়ী গিয়াছি। মা বারান্দায় বসিয়া দুইজন স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। সেই ভিখারী মেয়েটি আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। তাহার

হাতে একটা পেয়ারা। উহা মাকে দিয়া বলিল, "মা, এটি আজ ভিক্ষায় পেয়েছি, তাই আপনার জন্য এনেছি। দিতে সাহস হচ্ছে না, মা।" মা বলিলেন, "তা বেশ করেছ ; আহা ! দাও, মা।" ইহা বলিয়া পেয়ারাটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষার জিনিস খুব পবিত্র, ঠাকুর বড় ভালবাসতেন। বেশ পেয়ারাটি ত ; আমি খাব এখন।" মেয়েটি বলিল, "আমি আপনার ভিখারিণী মেয়ে, আমার উপর এত দয়া!" ইহা বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মা বলিলেন, "তোমার গান বড় মিষ্টি। তুমি একটি গান গাও।" মেয়েটি গাহিতে লাগিল—

"গোপাল, সাজিয়ে দিই বাপ তোরে।
একবার তেমনি, তেমনি, তেমনি করে
নাচরে ঘুরেফিরে॥
চরণে নূপুর দিব বাপ আমি,
বাজবে রুনুরুনু করে।
কটিতটে স্বর্ণপাটা দিব কোমর বেড়ে॥
গোপাল, খাইয়ে দিই বাপ তোরে।
স্বর্ণ-বলয় দিব বাপ আমি, তোমার যুগল দুটি করে॥"

গান শেষ হইলে সে বলিল, "মা, এই গানটি গাইলে

দশাশ্বমেধঘাটে যে বেহারীবাবা সাধু আছেন তিনি ঠিক গোপালের মত নাচতে থাকেন। তাঁর স্বভাব ঠিক বালকের মত।"

মা বলিলেন, "গানটি বেশ। আর একটি বল না।"

সে আবার একটি গাহিল। মা তাহাকে প্রসাদ দিতে বলিলেন। প্রসাদ লইয়া মাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল, "আজ তবে আসি, মা।" মা বলিলেন, "আবার এসো, মা, যখন ইচ্ছে হবে এসো।"

একদিন বেলা তিনটার সময় মা বৃদ্ধাদের আশ্রম দেখিতে যাইবার পথে আমাদের তুলিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে নামিতেই একটি বউ আসিয়া মাকে উপরে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধারা সকলে মার চরণে ফুল দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

মা— একি গো ? এরা সব কাশীবাসী, এরা আবার প্রণাম করে কেন ?

বউ— তা করবে না, মা ? আপনার অন্নে এরা প্রতিপালিত।

মা— বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণাই আছেন, মা। তুমি বুঝি এদের দেখাশুনা কর ?

বউ— হাঁ মা, যেমন করান।

মা— আহা, তা বেশ। এই অনাথা বুড়ীদের সেবা

করলে নারায়ণের সেবা করা হয়। আহা, এই সব ছেলেরা কি কাজই করেছে !

তারপর মা বৃদ্ধাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাহাদের ঘরগুলি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর আমরা সারনাথ হইতে ফিরিয়া মার বাড়ী গিয়া দেখি, মা শুইয়া আছেন। রাধুও পাশে শুইয়া আছে। সারনাথের বর্ণনা শুনিয়া সে মাকে বলিল, "মা, একদিন দেখতে যাবি ?"

মা বলিলেন, "কি করে যাব, মা ? আমার কি পা আছে যে ঘুরে ঘুরে দেখব ? এই দেখ না, মা, বিশ্বনাথ-দর্শনে যেতে পারি না। এরা সব যায় দেখে আমারও ইচ্ছা করে বিশ্বনাথদর্শন করে আসি ; কিন্তু পা নেই তা যাব কি ? কিছুই করতে পারি না। যখন পা ছিল তখন আমাদের দেশ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত হেঁটে এসেছি। তখন কত হাঁটতে পারতুম। ঠাকুরের দেহ রাখার পর বৃন্দাবন গিয়েছিলুম। তা হেঁটে হেঁটেই সব দর্শন করতুম।"

আর একদিন গিয়া দেখি একটি স্ত্রীলোক আর তাহার দশ-এগার বৎসরের একটি মেয়ে মার কাছে বসিয়া আছে। স্ত্রীলোকটি বড় গরীব।

মা— তোমার স্বামী কোথায় ?

স্ত্রীলোক— কোথায় বিবাগী হয়ে গেছে। এই মেয়ে যখন ছোট তখন গেছে।

মা— এতদিন কাজকর্ম্ম নেই, কি করে চলে ?

স্ত্রীলোক— কাজকর্ম্ম করে যা ছিল তাই দিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে চালিয়েছি। এখন আর চলে না, মা ; বড় কষ্টে পড়েছি। আপনি ওদের বলে যদি কিছু করিয়ে দেন, মা।

মা— আমি বলে দেখতে পারি। ওরা ত, মা, ভিক্ষে করে আনে। কত লোককে দিচ্ছে তার ঠিক আছে কি ? ওরা যেমন বুঝবে তেমনি দেবে ত ?

মা তাহাকে একটি টাকা ও একখানি কাপড় দিয়া বলিলেন, "আজকে এখানে দুটি খেয়ে যেও।" মা ছাদে বসিয়া আছেন। নীচে রান্না হইতেছে। স্ত্রীলোকটি বলিতেছে, "মা, খুকী বলছে, কি সুন্দর রান্নার গন্ধ !"

মা বলিলেন, "ওকি গো, ও সব কথা বলতে আছে ? ঠাকুরের ভোগ হবে।" প্রসাদ পাইবার সময় মা সেই মেয়েটিকে বেশী করিয়া মাছ তরকারি ইত্যাদি দিতে বামুন-ঠাকুরকে বলিয়া দিলেন। খাওয়া শেষ হইলে স্ত্রীলোকটি বলিল, "খুব খেয়েছি, মা, খুকী ত উঠতেই চায় না।"

মা— তা বেশ। এখন খাওয়া হয়েছে ত, নীচে গিয়ে আঁচাও।

স্ত্রীলোকটি নীচে যাইলে মা বলিলেন, "কি দারিদ্র্যের দশা! এত লোভ—এসে পর্য্যন্ত মেয়েটা খাই খাই করছে! অত বড় মেয়ের কিছু বুদ্ধি নেই। এ সব লোকের কিছু হয় না, লক্ষ্মীছাড়ার দশা।"

তাহারা উপরে আসিলে মা তাহাদের পান দিয়া বলিলেন, "এইবার এস গিয়ে।" তাহারা চলিয়া গেলে মা ঘরে তক্তাপোশের উপর শুইয়া আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কাশীতে কত রকমের লোক আছে যে তার ঠিক নেই। এই রকম কত লোক যে আসে, আর আমাকে বলে, 'আপনার ছেলেদের বলে দিন আমাকে কিছু সাহায্য করতে।' আমি আর কি বলব বল? তারা যেমন বুঝবে তেমনি করবে ত। মাগো, যত দরিদ্রের কি এখানে বাস? ওরাই বা কি করবে বল? এই দেখ না, অনাথা বুড়ীদের জন্য আশ্রম করেছে। তাদের কত সেবা, কত যত্ন! রোগীদের জন্য হাসপাতাল। আবার বাইরে যে কত লোককে সাহায্য করে তার ঠিক আছে কি? ছেলেগুলি কি খাটুনিই খাটে! সবই তাঁর ইচ্ছা, মা। কোথা থেকে কি করাচ্ছেন তিনিই জানেন।"

একদিন বিকালে যাইয়া দেখি মা বারান্দায় বসিয়া কয়েকজন বিধবার সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহাদের

মধ্যে একজন গেরুয়াপরা। তিনি মাকে একটি গান শোনাইলেন—

"থাকরে জবা, বনের শোভা,
বনের ফুল তুই বনে ফুটি,
তোরে হেরলে শিবের বক্ষে
মনে হয় মার চরণ দুটি।" ইত্যাদি

গোলাপ-মা— আহা, কি চমৎকার গানটি! আর একটি গাও।

মেয়েটি আর একটি গাহিলেন।

মা— তোমরা সেবাশ্রম দেখেছ?

সুধীরা দিদি— না, আমরা দেখি নি।

মা— তবে গোলাপের সঙ্গে গিয়ে দেখে এস।

আর একদিন বৈকালে মার কাছে গিয়াছি। মা দেবব্রত মহারাজের ও শচীনের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা হঠাৎ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

মা— আহা! মা, দেবব্রতটি আজ চলে গেল! কোম্পানী সেবাশ্রমের পাশের জায়গাটার কি সাহায্য করবে বলেছে; ওরা থাকাতে আপত্তি তুলেছে, সেই জন্য রাখাল সরে যেতে বললে। জানিস তো বাপু, তার কোন দোষ নেই, তবু একটা ফেউ লেগে থাকবে। আহা, বাছারা খেয়ে গেল না।

সুধীরা দিদি—দাদা আর শচীন আমাদের কাছে খেয়ে গেছে।

মা— আহা! মা, খেয়ে গেছে তবু ভাল, আমি তাই ভাবছিলুম।

সুধীরা দিদি— দাদা যেখানেই যায়, ওরা তাদের খোঁজ নেয়। সেইজন্য দাদা বলেন, "আমার শ্বশুরবাড়ীর লোক এসেছে, যাই দেখা করে আসি।"

মা— শ্বশুরবাড়ীর লোকই বটে, মা। কবে স্বদেশীর হাঙ্গামে ধরেছিল, এখনও তার খোঁজ রাখে! দেখ না, ছেলে দুটি খেয়ে যায় নি বলে সারাদিন মনটা কেমন করতে লাগল তার কি বলব, মা! যা হোক, তোমার কাছে খেয়ে গেছে শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা হল।

উদ্বোধন, কলিকাতা। আজ জগদ্ধাত্রীপূজা। সকাল হইতেই ভক্ত-সমাগম। যোগেন-মার বাড়ীতে পূজা; তিনি সকালে আসিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। মাকে যাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন। একটি ভক্ত আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, কৃপা করিয়া যদি এই অধম সন্তানের বাড়ীতে একবার চরণধূলি দেন।" মা বলিলেন, "আচ্ছা, দেখি বিকালে যেতে পারি কি-না, তুমি বিকালে একবার এস। যদি পারি ত যাব।"

দুপুরবেলা মা ও আমরা সকলে যোগেন-মার বাড়ী

যাইয়া ঠাকুরদর্শন করিয়া আসিলাম। মা সারাদিন উপবাসী রহিয়াছেন, কারণ তাঁহার বাড়ীতে পূজা। বেলা চারটার পর যখন সব পূজা শেষ হইল তখন মা প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করিলেন।

ভক্তটি মাকে লইতে আসিয়াছেন। মা শুনিয়া বলিলেন, "সকালে অত করে বললে, যাই একবার ঘুরে আসি।" তাঁহার বাড়ী বেশী দূর নয়, রাজবল্লভপাড়ায়। মা গাড়ী হইতে নামিতেই তাঁহারা মার পা ধোয়াইয়া সেই জল রাখিয়া দিলেন। বাড়ীখানি ছোট, আবার ভাঙ্গা। আমরা ঠাকুরপ্রণাম করিয়া ভিতরে যাইলাম। মাকে তাঁহারা ঘরে একখানি আসন পাতিয়া বসিতে দিলেন। মা ঘরের ভিতর দরজার সামনে আসনখানি পাঁতিয়া বলিলেন, "আমি এইখানেই বসি !"

একটি বৃদ্ধা মার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা—মা, আশীর্ব্বাদ কর আমার ছেলেকে। ওর পূজা করবার বড় সাধ, কিন্তু বাড়ীঘর কিছুই নেই। যা হোক করে মায়ের পূজাটি হল। নিজেই সব করেছে।

মা—আহা, তা বেশ করেছে। মা যখন এসেছেন তখন বাড়ীঘর সব হয়ে যাবে। তোমার ছেলেটি বড় ভাল, খুব ভক্তি আছে।

একটু পরে প্রসাদ আনিয়া দিলে মা একটু মুখে

ঠেকাইয়া যাইবার জন্য উঠিলেন। মা ঠাকুর দেখিয়া একটি টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রতিমাখানি বড় সুন্দর হয়েছে। চমৎকার মায়ের মুখের ভাব, ভক্তের পূজা কিনা।" বাড়ী আসিয়া নলিনী বলিতে লাগিল, "কি বাড়ী, মা! একটু বসবার জায়গা নেই। ঐ বাড়ীতে কি করে পূজো করেছে গো!" মা বলিলেন, "কি করবে বল? গরীব মানুষ, আহা, মাকে এনেছে। ব্রাহ্মণটি ভক্তলোক। মা কৃপা করে ওর বাড়ীতে এসেছেন।"

জয়রামবাটী হইতে পত্র আসিয়াছে যে মার পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে এবং অনেক লোক প্রসাদ পাইয়াছে। মা বলিলেন, "যা হোক, মার কৃপায় পূজাটি মঙ্গলমত শেষ হয়ে গেছে, মা। বড় ভাবনা হয়েছিল ওরা কি করবে। জ্ঞানটি আছে, তাই মায়ের পূজাটি ভালরকমে করেছে।"

একদিন সন্ধ্যার পর মা রাধুর কাছে বসিয়া তাহাকে সেঁক দিতেছেন। তাহার দুই পাঁজরার নীচে খুব ব্যথা হইয়াছে। একটি স্ত্রীভক্ত মাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

মা— এস মা, কেমন আছ?

ভক্ত— ভাল আছি, রাধুর কি হয়েছে, মা?

মা— রাধুর সেই ব্যথা ধরেছে, মা। দেখ না, ছেলে আমার সারা হয়ে গেল। পোড়া ব্যথা কোথা থেকে এল? এত দেখান হচ্ছে, কত ঠাকুরের মানসিক করেছি, কেউ শোনে না গা!

ভক্ত— ভাল হয়ে যাবে, মা। ভয় কি?

মা— তাই তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, মা।

অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ভক্তটি প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেলে আমি মাকে বলিলাম, "এই কি —, মা? কি হয়ে গেছেন, চেনবার যো নেই।"

মা— চেনবার যো কি করে থাকবে, মা? পাপ ঢুকলে তার কি রক্ষা আছে? আমাদের এখানে আসা ওর বারণ, তাই রাত্রে লুকিয়ে আসে।

আমি— আগে ত আপনার কাছে থাকতে দেখেছি।

মা— হাঁ, আগে আমার কাছে দিনে থাকত, রাত্রে বাড়ী যেত। রাধুর কত সেবাই করেছে! কি একটু কর্ম্মের ফেরে এমন হয়ে গেল, মা। আমার কাছে আসাই বন্ধ। ওর এ জন্মের কিছু নয়, সব পূর্ব্বজন্মের।

আর একদিন বৈকালে মা ঘরে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের ভক্ত পূর্ণ বাবুর খুব অসুখ, বাঁচিবার আশা নাই। তাঁহার মা আসিয়াছেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মা বলিলেন, "ঐ আসছে। কি রোজ রোজ এসে আমাকে বিরক্ত করে, 'মা, আশীর্ব্বাদ কর, পূর্ণকে ভাল করে দাও।' জানি ত পূর্ণ বাঁচবে না, তবু ওদের ভোলাবার জন্য বলতে হয়, 'ভাল হবে'।" পূর্ণ বাবুর মা মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার ছেলেকে ভাল করে দাও" এবং কাঁদিতে লাগিলেন।

মা— আমি কি করব, মা? ঠাকুরকে জানাও, উনি ভাল করে দেবেন।

পূর্ণ বাবুর মা— তোমরা ত ইচ্ছে করলেই পার, মা।

মা— আমি ত ঠাকুরকে জানাই।

পরে মা আমাদিগকে বলিলেন, "ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওর বিয়ে দিলে বেশী দিন বাঁচবে না।' সে তখন শুনলে না; তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে বলে।"

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যারতির পর মা, যোগেন-মা প্রভৃতি শুইয়া আছেন। মার একটু তন্দ্রার মতন আসিয়াছে। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পূর্ণ মারা গেল নাকি, যোগেন?" যোগেন-মা এ প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কে বললে, মা?" মা বলিলেন, "আমি ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ শুনতে পেলুম, কে বললে, পূর্ণ মারা গেল।" যোগেন-মা তখন বলিলেন, "হাঁ মা, আজ বিকেলে এই সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। তোমাকে শোনায় নি, মা।" সেই রাত্রিতে মা কেবল পূর্ণ বাবুর কথাই বলিতে লাগিলেন ও তাঁহার জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অসুখের সময় মা তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। পরে ভক্তেরা চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে

কলিকাতায় লইয়া গিয়াছেন। সে সময় গোলাপ-মা একদিন কথায় কথায় যোগেন-মাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ যোগেন, ঠাকুর বোধ হয় মার উপর রাগ করে কলকাতা চলে গেছেন।" যোগেন-মার কাছে ঐ কথা শুনিয়া মা গাড়ী করিয়া কলিকাতায় গিয়া ঠাকুরের কাছে কাঁদিয়া বলেন, "তুমি নাকি আমার উপর রাগ করে চলে এসেছ?" ঠাকুর বলিলেন, "না, কে তোমায় এ কথা বলেছে?" মা বলিলেন, "গোলাপ বলেছে।" তখন ঠাকুর রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "হাঁ! সে এমন কথা বলে তোমায় কাঁদিয়েছে? সে জানে না তুমি কে? গোলাপ কোথায়? আসুক না।" মা তখন শান্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। পরে গোলাপ-মা ঠাকুরের কাছে আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কি কথা বলে ওকে কাঁদিয়েছ? জান না ও কে? এক্ষুণি গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওগে।" গোলাপ-মা তখনই হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে মার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া বলেন, "মা, ঠাকুর আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছেন। আমি না বুঝতে পেরে অমন কথা বলে ফেলেছি।" মা কোন কথা না বলিয়া খালি হাসিয়া "ও গোলাপ, ও গোলাপ, ও গোলাপ" বলিয়া পিঠে তিনটি চাপড় দিতেই গোলাপ-মার সব দুঃখ যেন কোথায় চলিয়া গিয়া মন শান্ত হইয়া গেল।

এই ঘটনাটি গোলাপ-মা নিজে আমার কাছে বলিয়াছিলেন।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করিতেছেন। সেইজন্য তিনি মাকে লইয়া গিয়াছেন। মা মঠের উত্তরের বাগানে আছেন। জনৈক স্ত্রী-ভক্ত রাত্রিতে হঠাৎ মার কাছে গিয়া উপস্থিত। মা ভক্তটির আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন, "দেখ, এই রকম টান না হলে কি তাঁকে পাওয়া যায়?"

১৯১৮ সালে গোলাপ-মার কঠিন অসুখ হয়। সেই সময় দেখি, মা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন, "ঠাকুর, গোলাপকে সারিয়ে দাও। গোলাপ, যোগেন যদি না থাকে, তাহলে আমার আর এখানে থাকা চলবে না। ওরা গেলে আমি থাকব কি করে?" তারপর বলিলেন, "যোগেন ও গোলাপ আমার জীবনের সব অবস্থাই জানে। আহা, গোলাপের কোন বিকার নেই, অভিমান বলে কিছু জানে না। আবার দেখ যোগেনটিও তেমনি। তখন তখন যোগেন এমন ধ্যান করত যে চোখে মাছি ঢুকে বসে থাকলেও কোন হুঁশই থাকত না। আহা, ওদের হয়ে যারা বলবে তাদের কল্যাণ হবে।"

মার জনৈক ভক্তের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য একদিন যোগেন-মা মাকে বলিলেন, "মা, তুমি ওকে একটু সাবধান করে দাও, না হলে ও খারাপ হয়ে যাবে।" মা বলিলেন,

"আমার বলা চলবে না, যোগেন। আমি যদি ওকে কিছু বলি, ও শুনতে পারবে না। আমি ওর গুরু; ও যদি আমার কথা না রাখতে পারে, তাহলে ওর অকল্যাণ হবে।" মা এই কথা বলাতে যোগেন-মা আর কিছুই বলিলেন না।

একদিন বৈকালে মা বসিয়া আছেন। একথা সে-কথার পর বলিতেছেন, "দেখ, সব বলে কিনা আমি 'রাধু রাধু' করেই অস্থির, তার উপর আমার বড় আসক্তি! এই আসক্তিটুকু যদি না থাকত তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা থাকত না। তাঁর কাজের জন্যই না 'রাধু রাধু' করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে তখন আর এ দেহ থাকবে না।"

১৯১৮ সালে কোয়ালপাড়ায় মার একবার খুব অসুখ হয়। সে সময় যোগেন-মা ও পূজনীয় শরৎ মহারাজ সেখানে আছেন। রাধু মার ঐরূপ অসুখ দেখিয়াও শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। মার ইচ্ছা ছিল না যে সে যায়। মা যোগেন-মাকে বলিতেছেন, "দেখ যোগেন, রাধু আমাকে ফেলে চলে গেল।" যোগেন-মা বলিলেন, "তা কেন যাবে না, মা? তুমি যে দক্ষিণেশ্বরে হেঁটে গিয়ে ঠাকুরের কাছে উঠেছিলে, সে কথা কি মনে নেই?" মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা ঠিক, যোগেন।" মা সারিয়া উঠিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

'উদ্বোধনে' একদিন বলিতেছেন, "দেখ, রাধু যখন আমার মায়া কাটিয়ে চলে গেল তখন মনে করলুম এবার বোধ হয় আমার শরীর থাকবে না। কিন্তু এখনও ঠাকুরের কাজ আছে দেখছি।"

যোগেন-মার মনে একবার সংশয় আসে—'ঠাকুর অমন ত্যাগী ছিলেন, আর মাকে দেখছি ঘোর সংসারীর মতন—ভাই, ভাই-পো, ভাই-ঝিদের জন্য অস্থির। কিছুই বুঝতে পারি না।' একদিন গঙ্গার ঘাটে ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, "দেখ, গঙ্গায় কি ভাসছে।" যোগেন-মা দেখেন একটি সদ্যোজাত শিশু নাড়িভুঁড়ি-জড়ান গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতেছে। ঠাকুর বলিলেন, "গঙ্গা কি কখনও অপবিত্র হয়? না তাকে কিছু স্পর্শ করে? ওকে তেমনি জানবে। ওর উপর সন্দেহ এনো না, ওকে একে (নিজেকে দেখাইয়া) অভেদ জানবে।" গঙ্গা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যোগেন-মা মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমায় ক্ষমা কর।" মা বলিলেন, "কেন যোগেন, কি হয়েছে?" তখন যোগেন-মা ঘটনাটি বলিয়া বলিলেন, "তোমার উপর অবিশ্বাস এসেছিল। তা আজ ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিলেন।" মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তার আর কি হয়েছে? অবিশ্বাস ত আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস

হবে। এই রকম করেই ত বিশ্বাস হয়। এই রকম হতে হতে পাকা বিশ্বাস হয়।”

‘উদ্বোধনে’ মায়ের কাছে একটি স্ত্রী-ভক্ত আসিত; মা তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। কিন্তু তাহার স্বভাব তত ভাল ছিল না। সেজন্য সাধুদের মধ্যে অনেকে চাহিতেন সে যেন কাছে না আসে। এ কথা মাকে বলাতে মা বলিলেন, “গঙ্গায় যে কত অপবিত্র জিনিস ভেসে যায়, তাতে গঙ্গা কি কখন অপবিত্র হয়?”

জনৈক ভক্ত মার নিকট প্রশ্নাদি করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে মা নিজেই বলিতেছেন, “দেখ মা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে ত তাঁর কৃপা হয়।”

আমি একবার মাকে জপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, “কি ভাবে জপ করব?” মা বলিলেন, “যেমন ভাবে করবে তেমনি ভাবেই হবে। ঠাকুরকে সর্ব্বদাই আপনার ভাববে।” পরে মা করে জপ করিবার নিয়ম দেখাইয়া দিলেন।

ঠাকুরের শরীরত্যাগের পর মা যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, সেই সময়ের কথা বলিতে বলিতে তিনি একদিন ‘উদ্বোধনের’ বাড়ীতে বলিলেন, “দেখ মা, আমি রাধারমণের কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, ‘ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও। আমি যেন কখনও কারও দোষ না দেখি।’ ”

মা বলিতেন, "দোষ ত মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।" একবার যোগেন-মাকে বলিয়াছিলেন, "যোগেন, দোষ কারও দেখো না, শেষে দূষিত চোখ হয়ে যাবে।"

জয়রামবাটীতে রাত্রে মা শুইয়া আছেন। আমি প্রতিদিন যেমন তাঁহার পা টিপিয়া ও পায়ে হাত বুলাইয়া দিতাম সেইরূপ দিতেছি। মা কথাপ্রসঙ্গে কিরূপে তাঁহার প্রথম দীক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয় সে বিষয়ে বলিতে লাগিলেন, "দেখ মা, ঠাকুরের শরীরত্যাগের পর বৃন্দাবনে আছি। সকলেই তাঁর শোকে কাতর। একদিন রাত্রে ঠাকুর বলছেন, 'তোমরা অত কাঁদছ কেন? আমি আর গেছি কোথা— এঘর আর ওঘর বইত নয়?' একদিন ঠাকুর ছেলে যোগেনকে (স্বামী যোগানন্দকে) দীক্ষা দেবার কথা বললেন। শুনে আমার কেমন একটু ভয় হল, লজ্জাও করতে লাগল। প্রথম দিন দেখে ভাবলাম, 'এ আবার কি? লোকেই বা মনে করবে কি? সকলে বলবে, মা এরই মধ্যে শিষ্য করতে লাগলেন।' ওপর ওপর তিন দিন ঠাকুর ঐ একই কথা বলেন, 'আমি ওকে দীক্ষা দিই নি, তুমি দাও।' কি মন্ত্র দিতে হবে তাও বলে দিলেন। আমি তখন ছেলে যোগেনের সঙ্গে কথা

কই না। ঠাকুর মেয়ে যোগেনকে (যোগেন-মাকে) দিয়ে তাকে বলতে বললেন। আমি তখন মেয়ে যোগেনকে ঐ কথা বলি। সে ছেলে যোগেনকে জিজ্ঞাসা করে জানে যে ঠাকুর তাকে মন্ত্র দেন নি। ঠাকুর ছেলে যোগেনকেও দেখা দিয়ে আমার কাছে মন্ত্র নিতে বলেছেন। সে ঐ কথা আমার কাছে বলতে সাহস করে নি। যখন দেখলুম দুজনকেই বলেছেন, তখন তাকে মন্ত্র দিই। এই ছেলে যোগেন হতে আমার দীক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। ছেলে যোগেন আমার খুব সেবা করেছে; তেমনটি আর কেউ করতে পারবে না। পারে কেবল শরৎ। ছেলে যোগেনের পর থেকেই শরৎ করছে। আমার ঝক্কি-পোয়ান বড় শক্ত, মা। শরৎ ছাড়া আমার ভার কেউ নিতে পারবে না। গোলাপ, যোগেন, এরা না থাকলে আমার কলকাতা থাকা চলে না।"

মা জয়রামবাটী থাকিতে রাঁচি হইতে এক ভক্ত গিয়া মাকে বলেন, "আপনাকে কিছুদিনের জন্য লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। বাড়ীভাড়া ইত্যাদি সব ঠিক করিয়াছি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ জানে?" ভক্তটি বলিলেন, "না।" মা বলিলেন, "তবে আমার যাওয়া হতে পারে না। শরৎ এসে ফিরে গেছে। আগে কলকাতায় যাই।

সে যদি বলে তখন দেখা যাবে।” ভক্তটি বলিলেন, “মা, আমরা যে সব যোগাড় করেছি।” মা বলিলেন, “তোমরা আগে না জানিয়ে যোগাড় করলে কেন?”

ভক্তটি চলিয়া গেলেন। মা পরে বলিতেছেন, “দেখ মা, ওরা মনে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া খুব সোজা। ওরা কেবল হুজুগ করতেই জানে। আর একবার ঢাকাতে তারা কাগজে ছাপিয়ে দিলে আমি নাকি সেখানে যাব। অথচ আমি কিছুই জানি না! দু-চার দিন সবাই করতে পারে। আমার ভার নেওয়া কি সহজ? শরৎ ছাড়া কেউ ভার নিতে পারে এমন ত দেখি নি। সে আমার বাসুকি, সহস্রফণা ধরে কত কাজ করছে, যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।”

একদিন এক স্ত্রী-ভক্ত মার নিকট তাঁহার বন্ধুর সহিত মনোমালিন্যের কথা বলায় মা তাঁহাকে বলিতেছেন, “দেখ মা, মানুষকে ভালবাসলে দুঃখকষ্ট পেতে হয়। ভগবানকে যে ভালবাসতে পারে সেই ধন্য হয়, তার দুঃখকষ্ট থাকে না।”

আর একদিন জনৈক স্ত্রী-ভক্ত মার কাছে ঠাকুরপূজা শিখিতে চাওয়ায় মা বলিলেন, “দেখ, তোমরা সংসারে থাক, অত পারবে না। তাঁর নাম যেটুকু পেয়েছ ঐটুকুই কর দেখি। ঐটুকু করতে পারলে সব হবে।”

একবার মা আমাকে একখানি গরদের কাপড় দেন। একজন তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, "কেবল ওকে কেন কাপড় দিচ্ছ, মা? আরও পাঁচজন ত আছে।" মা উত্তর দিলেন, "আমি ওকে দেব না ত দেবে কে? ওর আর আছে কে বল?"

রাধুর অসুখের জন্য মা বোসপাড়ায় নিবেদিতা স্কুলের ভাড়া বোর্ডিং বাড়ীতে আছেন। আমি তাঁহার সেবার জন্য সেখানে আছি। একদিন মা আমাকে ঠাকুরের ভোগ দিতে বলিলেন। আমি ভোগ দিবার কোন মন্ত্রাদি জানিতাম না; তাই মাকে বলিলাম, "আমি ত মা, কি করে ঠাকুরকে ভোগ দিতে হয় জানি না।" তখন মা বলিলেন, "দেখ মা, ঠাকুরকে আপনার ভেবে বলবে, 'এস, বস, নাও, খাও।' আর ভাববে তিনি এসেছেন, বসেছেন, খাচ্ছেন। আপনার লোকের কাছে কি মন্ত্রতন্ত্র লাগে? ওসব হচ্ছে যেমন কুটুম এলে তাদের আদরযত্ন করতে হয়, সেই রকম। আপনার লোকের কাছে ওসব লাগে না। তাঁকে যেমন ভাবে দেবে, তেমনি ভাবেই নেবেন।" তারপর ভোগ দিবার একটি মন্ত্র আমাকে শিখাইয়া দিলেন।

মা একবার জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "দেখ বাবা, বিপদ যে তোমাদের আসবে না, তা নয়, ও ত আসবেই।

তবে ও থাকবে না ; দেখবে পায়ের তলা দিয়ে জলের মতন চলে যাবে।"

একটি ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এত ত জপতপ করলুম, কিছুই ত হল না।" উত্তরে মা বলিলেন, "এ কি শাক মাছ যে দাম দিয়ে কিনে নিলুম ?"

জয়রামবাটীতে মার আত্মীয়েরা মাকে নানা বিষয়ে জ্বালাতন করিতেন। মা একদিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ্, তোরা আমাকে বেশী জ্বালাতন করিস নে। এর ভিতরে যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কারও সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে।"

১৯১৯ সালে মা তখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন। দশহরার দিন কয়েকজন ভক্ত মার পায়ে পদ্মফুল দিয়া পূজা করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি যে ছেলেরা সব পায়ে ফুল দিয়ে গেল ?" আমি বলিলাম, "আজ দশহরা, তাই।" মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওমা, আমি কি মনসা নাকি ?" পরে ঠাকুরের দিকে হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "উনিই মনসা, গঙ্গা, সব।"

রাধু বায়ুরোগে পাগলের মতন হইয়া কোয়ালপাড়ায় আছে। অনেক সময় মা তাহাকে খাওয়াইতেন। সে

মুখে খাবার লইয়া প্রায়ই মার গায়ে ফেলিয়া দিত। একদিন মা বিরক্ত হইয়া আমাকে বলিতেছেন, "দেখ মা, এ শরীর (নিজের শরীর দেখাইয়া) দেব-শরীর জেনো। এতে আর কত অত্যাচার সহ্য হবে? ভগবান না হলে কি মানুষে এত সহ্য করতে পারে? ঠাকুর আমাকে কখনও ফুলের ঘাটি পর্য্যন্ত দেন নি। কখনও 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেন নি। একবার আমাকে লক্ষ্মী মনে করে 'তুই' বলে কি অপ্রস্তুত! তিনি জিব কামড়ে বললেন, 'ওমা, তুমি? কিছু মনে করো না, আমি লক্ষ্মী মনে করে 'তুই' বলে ফেলেছি।' এরা আমাকে জ্বালিয়ে খেলে, মা। এবার রাধুকে কোনরকমে ঠাকুর ভাল করে দিলে আর নয়। দেখ মা, আমি থাকতে এরা কেউ আমাকে জানতে পারবে না, পরে বুঝবে সব।"

'উদ্বোধনে' মার শেষ অসুখের সময় একদিন জনৈক সাধু মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। মা শুইয়া আছেন। সাধুটি মার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সে সময় মার মাথায় কাপড় দেওয়া ছিল না। সাধুটি চলিয়া গেলে মা আমাকে বলিতেছেন, "আমার মাথায় কাপড় দেওয়া নেই, কাপড়টা দিয়ে দাও নি কেন? আমি কি মরে গেছি? এখনই এই করছ!"

এই সময় মার খুব অরুচি, কিছুই খাইতে পারেন

না। অল্প করিয়া ভাত খান। একদিন খাইবার সময় ডাক্তার কাঞ্জিলাল সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তিনি মার ভাতের পরিমাণ বেশী হইয়াছে মনে করিয়া মার সামনেই আমাকে বলিলেন, "তোমার দ্বারা মার সেবা হবে না। আমি কাল দুটো নার্স মার সেবার জন্যে আনব। তোমাকে করতে হবে না।" মা ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া পরে বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই জুতো-পরা মেয়েগুলোর সেবা নেব, ও মনে করছে? তা আমি পারব না। তুমি আমার কাজকর্ম্ম যেমন করছ করবে। কাঞ্জিলাল কেন আমার ভাতখাওয়া নিয়ে এত গোল করছে? আমি ভাত কি খেতে পারি? তা ত সে জানে না!"

ইহার কয়েক দিন পরেই মার ভাতখাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। একদিন মা বলিলেন, "দেখ, সেদিন কাঞ্জিলাল আমার ভাত খাওয়া নিয়ে চটে গিয়েছিল। সেই থেকে আমার ভাতখাওয়া একেবারে চলে গেল।"

ঐ সময়ে মায়ের স্বভাবটি একেবারে পাঁচ-বছরের বালিকার মত হইয়া গিয়াছিল। একদিন রাত্রি বারটার সময় খাওয়াইতে গেলে বায়না ধরিলেন, "আমি খাব না। তোর একই কথা, 'মা, খাও, আর বগলে কাঠি লাগাও।' " মা খাইতে চাহিতেছেন না দেখিয়া বলিলাম,

"তবে কি, মা, মহারাজকে ডাকব?" অনেক সময় মহারাজের নাম করিলে তিনি খাইতেন। কিন্তু এবার একেবারেই খাইতে নারাজ হইলেন। বলিলেন, "ডাক্ শরৎকে, আমি তোর হাতে খাব না।" মহারাজ শুনিয়াই তাড়াতাড়ি মার কাছে আসিলেন। মা মহারাজকে বসাইয়া বলিলেন, "একটু হাত বুলিয়ে দাও ত, বাবা" এবং তাঁহার হাত দুখানি লইয়া বলিতেছেন, "দেখ না বাবা, এরা আমাকে কত বিরক্ত করছে। খালি 'খাও, খাও' এদের রব, আর জানে খালি বগলে কাঠি দিতে। তুমি ওকে বলে দাও যেন বিরক্ত না করে।" মহারাজ বলিলেন, "না মা, ওরা আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।" এই রকম সান্ত্বনা দিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এখন কি একটু খাবেন?" মা বলিলেন, "দাও।" মহারাজ আমাকে খাবার লইয়া আসিতে বলিলেন। মা এই কথা শুনিয়াই বলিলেন, "না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, আমি ওর হাতে খাব না।" ফীডিং কাপে দুধ ঢালিয়া মহারাজের হাতে দিলাম, তিনি কোন রকমে একটু খাওয়াইলেন এবং বলিলেন, "মা, একটু জিরিয়ে খান।" শুনিয়াই মা বলিলেন, "দেখ ত, কি সুন্দর কথা— 'মা, একটু জিরিয়ে খান।' এ কথাটা আর ওরা বলতে জানে না? দেখ ত, বাছাকে এই রাতে

কষ্ট দিলে। যাও বাবা, শোও গিয়ে” বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। পরে মহারাজ মশারি ফেলাইয়া দিয়া বলিলেন, “এখন আসি, মা।” মা বলিলেন, “এস বাবা, বাছার কত কষ্ট হল।”

শরীরত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে মা আর রাধুর কোন খোঁজখবর লইতেছেন না। একদিন মা তাহাকে বলিতেছেন, “দেখ্, তুই জয়রামবাটী চলে যা। আর এখানে থাকিস নে।” আমাকে বলিলেন, “শরৎকে বল ওদের জয়রামবাটী পাঠিয়ে দিতে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন ওদের পাঠিয়ে দিতে বলছেন? রাধুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন কি?” মা বলিলেন, “খুব পারব, মন তুলে নিয়েছি।” মার ঐ কথা যোগেন-মা ও শরৎ মহারাজকে বলিলাম। যোগেন-মা তখন মার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন মা, ওদের পাঠিয়ে দিতে বলছ?” উত্তরে মা বলিলেন, “যোগেন, এর পর ওদের সেখানেই থাকতে হবে যে। হ— যাচ্ছে, ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। মন তুলে নিয়েছি, আর চাই না।” যোগেন-মা বলিলেন, “ও কথা বলো না, মা। তুমি মন তুলে নিলে আমরা কি করে থাকব?” মা বলিলেন, “যোগেন, মায়া কাটিয়ে দিয়েছি, আর নয়।” যোগেন-মা কিছু না বলিয়া শরৎ মহারাজকে সমস্ত জানাইলেন। তিনি বলিলেন, “তবে

আর মাকে রাখা গেল না। রাধুর উপর থেকে যখন মন তুলে নিয়েছেন তখন আর আশা নেই।" আমি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম। মহারাজ আমাকে বলিলেন, "দেখ, তোমরা সব মার কাছে অনেক সময় আছ, চেষ্টা করে দেখ, যদি মার মন রাধুর উপর একটু ফিরে আসে।" কিন্তু আমাদের সহস্র চেষ্টাতেও কিছুই হইল না। একদিন মা বেশ জোরের সহিত বলিলেন, "যে মন তুলে নিয়েছি তা আর নামবে না জেনো।"

শরীরত্যাগের দুই-তিন দিন পূর্ব্বে মা শরৎ মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "শরৎ, আমি চললুম। যোগেন, গোলাপ, এরা সব রইল, দেখো।"

—শ্রীমতী সরলাবালা দেবী

জীবনে সেই আমার আনন্দের দিন গিয়াছে যখন শ্রীশ্রীমা ছিলেন। একদিন মায়ের কাছে গিয়া দেখি, তিনি একটী বাটিতে খইচুর মাখিয়া পরম আনন্দে দুই-চারি বার নিজের মুখে দিলেন, তারপর ঘরে যত ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের হাতে হাতে দিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "আহা! মা, আপনার খাওয়া হল না।" মা বলিলেন, "এই সব মেয়েরা খেলেই আমার খাওয়া হল।"

আর একদিন গিয়া দেখিলাম, মার গায়ে চাকা চাকা আমবাত বাহির হইয়াছে। মা বলিলেন, "এগুলো কি হয়েছে, মা? কিসে সারে?" আমি বলিলাম, "মা, লোকে বলে, গোয়ালে কম্বল পেতে তার উপর আড়াই বার গড়াগড়ি দিলে নাকি সারে।" মা বলিলেন, "আহা, গোয়াল ও গঙ্গা বড়ই পবিত্র; তাই বোধ হয় সারে।"

আমার একটি সাত বছরের বোনকে সঙ্গে লইয়া মাকে একদিন দর্শন করিতে যাই। কিছুদিন আগে সে নবদ্বীপ গিয়াছিল এবং তথা হইতে তুলসীর মালা পরিয়া আসিয়াছিল। মা তাহার মালা পরা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন

ও তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "আহা, এর এমন বেশ কবে হল ?"

সেইদিন আমার তুই মাসের একটি কোলের মেয়ে বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ী বসিরহাট। ভোরের ট্রেনে গিয়াছি, রাত্রির ট্রেনে ফিরিব। স্তনে তুধ আসিতেছে, আর আমি জড়সড় হইতেছি। তাহা লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন, "তুমি অমন করছ কেন ?" আমি সব বলিলাম। শুনিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "আহা, তু-মাসের মেয়ে রেখে এসেছ কেন, মা ? আনলেই পারতে।" আমি বলিলাম, "মা, আপনার এস্থানে এসে অপবিত্র করে ফেলবে, তাই আনি নি।" মা বলিলেন, "তাতে কি হয়েছে ?" উপস্থিত সকলকে মা বারবার বলিতে লাগিলেন, "আহা ! দেখ, তু-মাসের মেয়ে বাড়ী রেখে কতদূর থেকে এসেছে ! কত কষ্ট হচ্ছে !" আমি তাঁহার নিকট সিংহবাহিনীর একটু মাটি চাহিলে মা তাঁহার ভাইঝিকে উহা দিতে বলিয়া আমাকে বলিলেন, "বড় জাগ্রত দেবতা।" ফিরিবার সময় প্রণাম করিলে মা বলিলেন, "এস, আবার এসো, মা।"

শ্রীমতী—

১৯১৬ সালের ১২ই পৌষ আমি প্রথম শ্রীশ্রীমার পাদপদ্মদর্শন করি এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়া ধন্য হই। একটি গুরুভগিনীর সহিত যখন আমি কম্পিত-কলেবরে মায়ের বাড়ীর দোতলায় উঠি, তখন যোগেন-মা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া মার নিকট লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "মা, দেখ, দেখ, তোমার আর একটি মেয়ে এসেছে—এর চোখ মুখ কেমন দেখ!" মা তখন ঠাকুরঘরে বসিয়া ফল ছাড়াইতেছিলেন। বলিলেন, "হাঁ গো, আমি একে জানি, এ রামদের মেয়ে।" আমি ত অবাক, কি করিয়া মা আমাকে জানিলেন!

মা আমাকে ডাকিয়া ঠাকুরঘরে আসনে তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন। আমার গুরুভগিনীটি আমাকে গঙ্গাস্নানের জন্য আহ্বান করিলে মা বলিলেন, "ওর গঙ্গাস্নান দরকার নেই" এবং আমার গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিলেন। তারপরই আমাকে কৃপা করিলেন। ঐ সময় আমাকে একটি কথা বলিয়া বলিলেন, "ঠাকুর আমার জন্য মন্ত্রের এই অংশটুকু রাখিয়া দিয়াছিলেন।" মার পাদপদ্মে অঞ্জলি

দিবার সময় মা বলিলেন, "তুলসী ও বিল্বপত্র আমার হাতে দাও, ফুল পায়ে দাও।"

আমার সেই গুরুভগিনীটি একদিন কথাপ্রসঙ্গে মাকে বলিলেন, "একে নিবেদিতা স্কুলে পড়ালে ভাল হয়।" তদুত্তরে মা বলিলেন, "না, ওখানে থাকার প্রয়োজন নেই, আমার কাছে থাকলে ভাল হত।" কিন্তু আমার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য কখনও ঘটে নাই।

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কি করব? আমি ত কিছুই জানি নে।" মা বলিলেন, "কি আর করবে? যা করছ তাই করবে। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর নাম করবে।"

আমাদের দেশের বিধবা মেয়েরা আহারাদি সম্বন্ধে খুব কঠোরতা করে; অন্য একটি ভক্ত মেয়ের নিকট এই কথা শুনিয়া মা আমাকে বলিলেন, "তুমি রাত্রে রুটি-পরটা ইত্যাদি খেও, ঠাকুরকে নিবেদন করে খেও। দেশাচার মানতে হয়।"

—**শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী, কাশী**

একদিন সকালবেলা শ্রীশ্রীমা ও গোলাপ-মা গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। গোলাপ-মা বলিলেন, "মা, তেল মাখ।" মা বলিলেন, "আমি তেল মাখব না।" গোলাপ-মা অনুরোধ করায় মা বলিলেন, "আমি মাখলে সকলেই মাখবে ; তেল মেখে গঙ্গাস্নানে যেতে নেই।"

একদিন জনৈক স্ত্রীলোক অনুতপ্ত হইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাদের উপায় কি হবে ?" মা একটু বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের বছর বছর ছেলে হবে ; একটুও সংযম নেই ; আমার কাছে এসে 'আমাদের উপায় কি ?' বললে কি হবে ?"

শ্রীশ্রীমা রামেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, কি দেখে এলেন, বলুন।" মা বলিলেন, "অনেক লোক আমাকে দেখতে এসেছিল। সেখানকার মেয়েরা খুব লেখাপড়া জানে। আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে। আমি বললাম, 'আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত।' "

একদিন মা বলিলেন, "যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। যেমন গৌরদাসী।"

আর একদিন মা রাধুর অসুখের জন্য তাহাকে মাদুলি পরাইয়া দেবতার উদ্দেশ্যে পয়সা তুলিয়া রাখিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আপনি কেন এরূপ করছেন? আপনার ইচ্ছাতেই ত সব হয়।" মা বলিলেন, "অসুখ হলে ঠাকুরদের মানত করলে বিপদ কেটে যায়; আর যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।"

মাণিকতলায় জনৈক ভক্তের বাটীতে একবার শ্রীগৌরী-মাতা কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। ভক্তটির মাতা ও অন্যান্য সকলে প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া-ছিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "আ—র মা এ জন্মেই মুক্ত হয়ে যাবে। গৌরদাসীর অসুখে যে সলতেটি পর্য্যন্ত উস্‌কে দিয়েছে সেও মুক্ত হয়ে যাবে।"

—**শ্রীমতী সরযূবালা সেন**

মা তখন জয়রামবাটীতে। আজ মার বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রীপূজা, তাই মা অত্যন্ত ব্যস্ত। কেবল বলিতেছেন, "কি করে মার পূজাটি হবে?" ঠাকুরের নিত্যপূজা আজ মা সকাল সকাল করিতেছেন। ঠাকুরকে ফল মিষ্টি প্রভৃতি অনেক নৈবেদ্য দেওয়া হইয়াছে। ভোগ দিবার সময় মা ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "দেখ, আজ মার পূজা, শীগ্‌গির করে খেয়ে নাও আমায় সেখানে যেতে হবে।" ধীরে ধীরে আরও কি বলিলেন। মনে হইল ঠিক যেন মানুষের সহিত কথা কহিতেছেন। তারপর পূজা শেষ করিয়া ৺জগদ্ধাত্রী-মণ্ডপে গিয়া বসিলেন এবং পূজা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত করুণভাবে একদৃষ্টে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কোয়ালপাড়া হইতে বাজার করিয়া ও মার ঠাকুর-পূজার জন্য ফুল লইয়া জয়রামবাটী গিয়াছি। আমি যাইতেই মা বলিলেন, "এই আমি ভাবছিলাম, এখনই তুমি আসবে; তারপর আমি স্নান করতে যাব।" মা জিনিসগুলি রাখিয়া আমাকে মুড়ি খাইতে দিলেন। তারপর একখানি ছোট গামছা পরিয়া তেল মাখিতে মাখিতে আমাদের

সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ বলিতেছেন, "আমি মা, লজ্জা কি?" তারপর স্নান করিয়া পূজা করিতে গেলেন।

একদিন ভাবিলাম, মাকে জিজ্ঞাসা করিব কিরূপে সাধনভজন করিতে হইবে। মা বিকালে বারান্দায় বসিয়া মালাজপ করিতেছিলেন। কাছে গিয়া সে-সব কথা ভুলিয়া গেলাম; প্রশ্ন করিবার ইচ্ছাই হইল না। কেবল বলিলাম, "মা, আপনি আমার ভার নিন"—বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। মা তখন আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কেঁদো না, তোমার ভার ত আমি অনেকদিন নিয়েছি। ঠাকুর তোমার ভার অনেকদিন নিয়েছেন। ভাবনা কি?"

আমি একদিন স্বপ্ন দেখি যে মা আমাকে বলিতেছেন, "ব্রহ্মচর্য্য লও।" পূজ্যপাদ হরি মহারাজকে উহা বলিলে তিনি বলিলেন, "এই কথা তুমি মাকে গিয়া বলিও।" কিছুদিন পরে কোয়ালপাড়ায় মাকে ঐ কথা বলিলাম। মা শুনিয়া একটু হাসিলেন এবং বলিলেন, "তবে কাল আমি যখন পূজা করব সে সময় একখানি নূতন কাপড় নিয়ে এস। কেউ যেন না জানে।" পরদিন যখন মার নিকট গেলাম তখন তিনি পূজা করিয়া জল খাবার খাইয়া বারান্দায় বসিয়া মুখে গুল দিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই জিব কাটিয়া বলিতেছেন, "দেখ, পূজো হয়ে গেছে, আমি

ভুলে গেছি। তা হোক, আমি মুখ ধুয়ে নিচ্ছি, তুমি ঠাকুরঘরে গিয়ে বস।" মা ঠাকুরঘরে আসিয়া বলিলেন, "দরজাটা ঠেসিয়া দাও, ওরা (মেয়েরা) আছে।" তারপর আমাকে বলিলেন, "গায়ের জামাটা খুলে ফেল।" কোশার জল লইয়া আমার শরীরে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর আমার নাভিতে, বুকে ও মাথায় হাত দিয়া কি করিতে লাগিলেন। নূতন কাপড়খানি লইয়া আমাকে বলিলেন, "ঐ দেখ, ঠাকুর আছেন। বল, আজ তোমাকে আমার সব ভার দিলাম।" পরে কাপড়খানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আজ তোমার প্রাণের ভিতর সন্ন্যাস দিলাম।" আমি তখন যেন দিশেহারার মত হইয়া গিয়াছি, মাকে প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেলাম। আমার এই ভাবটা কয়েকদিন পর্য্যন্ত ছিল।

মা রাধুকে লইয়া কোয়ালপাড়ায় আছেন। সেবার রাধুর সন্তান হইবে। সে তখন উন্মাদের মত। মার সর্ব্বদাই ভাবনা, কি করিয়া রাধু নির্ব্বিঘ্নে এ বিপদ উত্তীর্ণ হইবে। সেইজন্য কত দেবদেবীকে মানত এবং কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছেন।

ঐ সময় একদিন মা বলিলেন, "দেখ, 'হনুমানচরিতে' লেখা আছে নাকি, ভাল-মন্দ কি হবে বলে দিতে পারে। তা রাধুর কি হবে, বলে দিতে পারে কি-না দেখ না।"

আমি বইখানি আনিয়া পড়িয়া দেখিলাম; উহাতে ছক আঁকা আছে। তাহার কোন এক স্থানে হাত দিতে হয়। মা একটি জায়গায় হাত দিলেন। ফলাফল পড়িয়া শুনাইলাম। তাহাতে লেখা আছে, ভাল ফল হইবে। এই ভাল ফল শুনিয়া মা খুব খুশী হইলেন এবং বলিলেন, "তবে রাধু নিশ্চয় ভাল হবে। উনি (অর্থাৎ হনুমান) যখন বলিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই ভাল হবে।"

এক সময় কোয়ালপাড়া মঠে কাজকর্ম্ম লইয়া সেবকদের সহিত অধ্যক্ষের মতবিরোধ উপস্থিত হয়। মা তখন জয়রামবাটীতে আছেন। আমরা প্রায়ই কোয়ালপাড়া হইতে তাঁহার জন্য বাজার করিয়া লইয়া যাইতাম। মা কে কেমন আছে তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন। উক্ত মঠের সকল সংবাদ মা উত্তমরূপেই জানিতেন। একদিন তাঁহার ভাইঝি আমাকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেই মা তাঁহাকে বলিলেন, "তোর অত খবরে দরকার কি?" তিনি চলিয়া গেলে মা বলিলেন, "দেখ, সব বনিয়ে-বানিয়ে চলতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স'—সব সয়ে যাও, তিনি আছেন।" পরে মা যখন কোয়ালপাড়ায় আসিয়া কিছুদিন থাকেন, তখন একদিন মঠাধ্যক্ষ মাকে বলিলেন, "মা, ছেলেরা সব এখানে থাকতে চায় না। আপনি ওদের বলে দিন, যাতে ওরা কোথাও গিয়ে থাকতে না

পারে এবং এখানে আপনার কাজকর্ম্ম সব করে। ওদের ইচ্ছা অন্য জায়গায় সব চলে যায়। আপনি যদি বলে দেন তা হলে ওরা আর কোথাও যাবে না।” এই কথা শুনিবামাত্র মা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, “তুমি আমাকে দিয়ে কি বলিয়ে নিতে চাও? আমি বুঝি বলে দেব যে ওরা কোথাও থাকতে পাবে না! ওরা আমার ছেলে, ঠাকুরের কাছে এসেছে; ওরা যেখানেই যাবে সেখানেই ঠাকুর ওদের দেখবেন। আর তুমি আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে চাও, যাতে ওরা কোথাও স্থান না পায়! একথা আমি বলতে পারব না।” মা তখন খুব জোরে জোরে কথা বলিতেছিলেন। সকলে ভয়ে অস্থির। মঠাধ্যক্ষ তখন মায়ের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “মা, ক্ষমা করুন, রক্ষা করুন।” মা তৎক্ষণাৎ একেবারে শান্ত হইলেন।

একদিন জনৈক পূর্ব্ববঙ্গীয় ভক্ত মার নিকট দীক্ষা লইতে আসিয়াছেন। মা তখন কোয়ালপাড়ায়। মাকে ঐ কথা বলা হইলে তিনি বলিলেন, “না, তার দীক্ষা হবে না।” ভক্তটি ইহা শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। পরদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া মা যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর বাহিরে রৌদ্রে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। মা উহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, “ও কেন এ

রকম করে কাঁদছে? ওকে চলে যেতে বল।" ভক্তটির ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহাকে ঐ কথা বলিতে গিয়াও বলিতে পারিলাম না। ইতোমধ্যে দেখি মা নিজেই বাড়ীর সদর দরজাটি অল্প খুলিয়া ভক্তটিকে দেখিতেছেন। আমি বাড়ীর ভিতরে যাইতেই মা আমাকে বলিলেন, "বলে দাও, কাল ওর দীক্ষা হবে।" এই কথা শুনিয়া ভক্তটি আরও কাঁদিতে লাগিলেন। পরদিন তাঁহার দীক্ষা হইয়া গেল।

কোয়ালপাড়া মঠে কৃষ্ণপ্রসন্ন নামক একজন শিক্ষিত ভক্ত কিছুদিন ছিল। মা একদিন আমাদের বলিলেন, "দেখ, ওদেশ থেকে অনেক সাহেব-সুবো ভক্ত আসবে; তোমরা কৃষ্ণপ্রসন্নের কাছে ইংরাজী লেখাপড়া শিখে নাও।" মার কথামত আমরা পড়াশুনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরে কৃষ্ণপ্রসন্ন চলিয়া যাওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া যায়।

মায়ের পদচিহ্ন জনৈক স্ত্রী-ভক্তের নিকট ছিল। একদিন উহা চুরি হইয়া যায়। তাহা লইয়া মেয়েদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। মা তখন কোয়ালপাড়ায়। তিনি ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ঐ নিয়ে তোমাদের এত কেন? আমি ত আছি; কত নেবে নাও না।" পরে কিছু কাপড় ও তরল আলতা আনিয়া অনেকগুলি পদচিহ্ন দিলেন। ঝগড়াও মিটিয়া গেল।

একদিন মা প্রসন্ন মামার বাড়ীতে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন "দেখ, রাধু যখন জন্মায় নি তখন আমার সামনে সর্ব্বদা ছায়ার মত ঘুরত। ঠাকুর দেখিয়ে দিয়েছিলেন, 'একে নিয়ে থাকবে।' সেই রাধুকে নিয়ে আমার কত মায়া দেখ না। গৌরদাসী কেমন তার মেয়েকে তৈরী করেছে, আর আমি একটা বাঁদরী তৈরী করেছি।"

কোয়ালপাড়া মঠে আমরা তখন আতপ চাউলের ভাত খাইতাম। অর্থাভাবহেতু তরকারি তেমন জুটিত না। এইরূপ খাওয়া-দাওয়ার জন্য সকলেরই শরীর খারাপ হইয়া গেল। মা ইহা জানিয়া বলিলেন, "তোমরা মাছটাছ খাওনি কেন? না খেয়ে শরীরটি মাটি করে কি হবে? আমি বলছি, কোন দোষ নেই, মাছটাছ খেও।" তারপর মা জোর করিয়া পুনঃ পুনঃ মঠাধ্যক্ষকে বলিয়া আমাদের মাছ খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

একদিন জয়রামবাটীতে জনৈক মহারাজ কাগজ ও দোয়াত কলম লইয়া মার নিকট আসিয়া বলিলেন, "মা, দুধ বড় কম হচ্ছে, একটা গাইয়ে যা দুধ দেয় তাতে কুলিয়ে উঠছে না। তাই মনে করছি আর একটা গাই কিনব, আপনি যদি অনুমতি দেন ত একজনকে টাকার জন্য লিখি।" মা বলিলেন, "লেখ, কল পেয়েছ, লিখলেই টাকা, আর কি!" তিনি চলিয়া গেলে মা হাসিয়া

বলিতেছেন, "ওর কি বাসনা দেখ! আমি বাবুরামকে এক সময় একটু মিছরির পানা খেতে দিয়েছিলাম। বাবুরামের তখন পেটের অসুখ। ঠাকুর তা দেখতে পেয়েছিলেন। আমাকে একদিন বললেন, 'তুমি বাবুরামকে কি খেতে দিয়েছিলে?' আমি বললুম, 'মিছরির পানা।' ঐ কথা শুনে ঠাকুর বললেন, 'ওদের যে সাধু হতে হবে। ওসব কি অভ্যাস করাচ্ছ!' "

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাবে আমি সাধনভজন করব?" মা বলিলেন, "ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে।" ইহা আমার মনঃপূত না হওয়ায় আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম। মা তখন বিরক্ত হইয়া জোর গলায় বলিলেন, "আমি আর কিছু জানি নে; ঠাকুরের কাছে যা চাইবে তাই পাবে।"

জনৈক ভক্ত যখন মার নিকট দীক্ষা লইতে যান, মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বংশের কি মন্ত্র?" ভক্তটি বলিলেন, "তা আমার জানা নেই।" তখন মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের বংশের এই মন্ত্র" এবং ভক্তটিকে দীক্ষা দিলেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল যে বাস্তবিক তাহাই।

কোয়ালপাড়ায় একদিন একটি পাগল আসিয়া বাড়ীর বাহিরে পাগলামি করিতেছিল। মা উহার কাণ্ড

দেখিয়া বলিলেন, "দেখ না, যত সব পাগলের মেলা! আমরা এসেছি কিনা, তাই যত সব পাগল আসছে। দেখ, রাধু পাগল, তার মা পাগল, এই সব নিয়ে আমার ঘর।" এই কথা বলিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "ঘরে আসবে চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী, যোগী, জটাধারী।"

—স্বামী ঋতানন্দ

জয়রামবাটী

পৌষ মাস। আজ শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি। তাঁহার ঘরে তক্তাপোশের উপর রাধুর ছেলেটিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিতেছেন। আমি একটি গাঁদাফুলের গড়েমালা মাকে পরাইয়া শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম এবং বলিলাম, "মা, আজ আপনার জন্মদিন ; অনেকের ইচ্ছা আজ আপনাকে দর্শন ও পূজাদি করেন। কিন্তু তাঁরা এই দুর্গম দেশে আসিবার সুযোগ পান না। আজ এই বিশেষ দিনে আমি সকলের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছি। সকলের যাতে মঙ্গল হয় সেই আশীর্ব্বাদ করুন, মা।" মা সুপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "হঁা, বাবা, সকলের মঙ্গলের জন্য আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি সকলের মঙ্গল করুন।"

মার আদেশ অনুসারে আমি তাঁহার নিকটই থাকিতাম। ঠাকুরপূজা ও অন্যান্য কাজে খুব ব্যস্ত থাকিতে হইত। একদিন মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী তপস্যায় যাইবেন শুনিয়া

আমি মাকে বলিলাম, "এই কর্ম্মের মধ্যে থাকা যেন ভাল বোধ হচ্ছে না। আমি তপস্যা করতে যাব, আপনি অনুমতি দিন।" মা বলিলেন, "সেকি গো, আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ, একি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে? হাওয়া গুনতে কোথায় যাবে? যখন খুব যাবার ইচ্ছা হবে তখন দু-এক মাস কোথাও বেড়িয়ে আসবে।"

জয়রামবাটী ম্যালেরিয়ার দেশ। মার মধ্যে মধ্যে জ্বর হওয়ায় শরীর খুব খারাপ হইয়াছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজের আদেশে কিছুদিনের জন্য দর্শনাদি বন্ধ আছে। এমন সময় বরিশাল হইতে জনৈক ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাকে দর্শনের জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ, আমিও তাঁহাকে যাইতে দিব না। সুতরাং আমাদের মধ্যে বেশ বাদানুবাদ হইতে লাগিল। গোলমাল ক্রমশঃ মার কর্ণগোচর হইল। মা একেবারে আলুথালুভাবে দরজায় আসিয়া উপস্থিত। বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন তুমি আসা বন্ধ করছ?" আমি বলিলাম, "শরৎ মহারাজ নিষেধ করেছেন। অসুস্থ শরীরে দীক্ষা দিলে আপনার শরীর আরও খারাপ হবে।" মা বলিলেন, "শরৎ কি বলবে? আমাদের ঐ জন্যেই আসা। আমি ওকে দীক্ষা দেব।" ভক্তটিকে বলিলেন, "এস, বাবা, আজ তুমি জল

খাও, কাল তোমার দীক্ষা হবে।” ভদ্রলোকটির সঙ্কল্প ছিল, দীক্ষা লইয়া তবে জল খাইবেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় মা নূতন বাটীর বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আমরা সেই সময় প্রণাম করিতে গেলাম। মা নিজেই বলিতে লাগিলেন, “দেখ, ক— বলে, ‘ছেলেগুলো খাবার লোভে এ আশ্রম সে আশ্রম ঘুরে বেড়াচ্ছে।’ কি রকম কথা দেখেছ? আমার ছেলের, ঠাকুরের ছেলের খাবার কষ্ট কেন হবে? কখনই হবে না। আমি নিজে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি, ‘হে ঠাকুর, তোমার ছেলেদের যেন খাবার কষ্ট কখন না হয়।’ বলে কিনা লোভের বশে ছুটে বেড়ায়! কেন ভাল খাবে না? যার আসক্তি আছে সেই দুঃখ-কষ্ট পাবে।”

মা পূজার ঘরে বসিয়া আছেন—পূজা শেষ হইয়াছে। একজন গুরুভ্রাতা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখেন?” মা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, “সন্তানের মত দেখি।”

একদিন মা নিজে হইতেই বলিলেন, “দেখ, তোমরা ‘বন্দে মাতরম্’ করে হুজুগ করে বেড়িও না, তাঁত কর, কাপড় তৈরী কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সুতা কাটি। তোমরা কাজ কর।”

কথাপ্রসঙ্গে একদিন মাকে বলিলাম, “মা, আমাদের

মনের যে অবস্থা, সময়ে সময়ে মন যেরকম চঞ্চল হয়, তাতে ভয় হয় ডুবে যাব নাকি ?" মা বলিলেন, "সে কি, বাবা, ডুববে কি ? ঠাকুরের সন্তান তোমরা, ডুববে কি ? কখনই না, ঠাকুর তোমাদের রক্ষা করবেন।"

মা কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে আছেন। একদিন বলিতেছেন, "দেখ, অনেক দিনের পর আজ ঠাকুরকে এখানে দেখলাম। আহারের পর বেশ বিশ্রাম করছেন।"

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, ব্রহ্মজ্ঞান কি করে হয় ? একি প্রত্যেক বিষয়টি নিয়ে প্রথম প্রথম অভ্যাস করতে হয়, না আপনা আপনি হয় ?" মা বলিলেন, "ঐ পথ বড় কঠিন, তোমরা ঠাকুরকে ডাক, তিনি সময় হলে জানিয়ে দেবেন।"

—**স্বামী পরমেশ্বরানন্দ**

(১৬)

জয়রামবাটী

একবার শূলবেদনায় বড় কষ্ট পাইতেছিলাম। সেই সময়ে একদিন তন্দ্রাবস্থায় অনুভব করি, কে যেন আমাকে গুরুর পাদোদক পান করিতে বলিতেছে। পরদিন জয়রামবাটী যাইয়া মার পাদোদক পান করিলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম, "মা, আমার ইচ্ছা ছিল আপনার পা পূজা করব, কিন্তু জল খেয়ে ফেললুম।" মা বলিলেন, "তাতে কি? চল ঐ ঘরের মধ্যে।"

চরণপূজা হইয়া গেলে আমি মায়ের পা দুখানি লইয়া মস্তকে ধারণ করিতেই মা বলিলেন, "ক্ষেপা ছেলে, পা কি মাথায় রাখতে আছে! ওখানে ঠাকুর আছেন।"

আমি— মা, আমি ত ঠাকুরকে দেখি নি।

মা— ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান।

আমি— ঠাকুর যদি ভগবান, তবে আপনি কে?

মা— আমি আবার কে? ...

আমি— আপনি ত ইচ্ছা করলেই ঠাকুরকে দেখিয়ে দিতে পারেন।

মা— নরেনকে ঠাকুর ছুঁয়েছিলেন, তাতে নরেন চেঁচিয়ে উঠেছিল। সাধনভজন কর, দেখতে পাবে।

আমি— মা, আপনি যার গুরু তার আবার সাধন-ভজন কি দরকার?

মা— তা বটে। তবে কি জান, ঘরে রাঁধবার সব জিনিস আছে; রান্না করে খেতে হয়। যে যত সকাল রাঁধবে সে তত সকাল খেতে পাবে। কেউ সকালে খায়, কেউ সন্ধ্যায়, কেউ কুড়েমি করে রাঁধবার ভয়ে উপোস দেয়।

আমি— মা, এ কথাটা বুঝতে পারলাম না।

মা— যে যত বেশী সাধনভজন করবে, সে তত শীগ্‌গির দর্শন পাবে। না করে, শেষ সময় পাবেই, নিশ্চয় পাবে। কিন্তু যে সাধনভজন না ক'রে কেবল হৈচৈ ক'রে কাটাবে, তার দেরী হবে। সাধনভজন করবার জন্য সংসার ছেড়েছ। সর্ব্বদা সাধনভজন করতে পার না বলেই ঠাকুরের কাজ ভেবে কাজ করা দরকার। তুমি বেশী কঠোরতা করো না; তোমার শূলবেদনা। খাওয়ার বিষয় নজর রাখবে। এ রোগ মারাত্মক নয়, কষ্টদায়ক।

যখন কোয়ালপাড়া আশ্রমে ছিলাম, তখন আমার কাজ ছিল দুবেলা রান্নাঘর পরিষ্কার করা ও পিতলের হাঁড়ি

মাজা। তখন বর্ষাকাল। হাঁড়ি মাজিতে মাজিতে হাতে হাজা লাগিয়া কষ্ট পাইতেছি। একদিন জয়রামবাটী যাইয়া মাকে প্রণাম করিতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, ভাল আছ ত?"

আমি— বড় ভাল নয়।

মা— কেন? আবার কি পেটে বেদনা হচ্ছে নাকি?

আমি— না, মা, বেদনা হয় না বটে, কিন্তু হাতে হাজা ধরেছে, তুবেলা হাঁড়ি মাজতে হয়।

মা— টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাস। কোথায় সংসার ছেড়ে এসে ভগবানের নাম করবে, না কেবল কাজ! আশ্রম হল দ্বিতীয় সংসার। লোকে সংসার ছেড়ে আশ্রমে আসে, কিন্তু এমন মোহ ধরে যায় যে আশ্রম ছেড়ে যেতে চায় না। তোমার শরীর ভাল নয়, তুমি ডহরকুণ্ডুতে যাও; যতটা পার ছেলে পড়াবে আর ধ্যানভজন করবে।

আমি— মা, আমার ইচ্ছা কোন জায়গায় গিয়ে সাধন-ভজন করি, কিন্তু শরীর ভাল নয়।

মা— এখন কিছুকাল সামান্য কাজ নিয়ে থাক; যখন মনে প্রবল ইচ্ছা হবে তখন যেও।

আমি— জপ ত করি, কিন্তু মন বসে না।

মা— মন বসুক না বসুক, জপ করবে। রোজ যদি এত (সংখ্যা) করে জপ করতে পার ত ভাল হয়।

আমি— আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাই।

মা— তুমি ত স্বপ্নে দেখেছ; তা দর্শন পাবে।

আর একদিন জয়রামবাটী যাইতে যাইতে চিন্তা করিতেছি যে যদি মার একটু সেবা করিতে পারি ত বড় আনন্দ হয়। গিয়া দেখি মা তেলের বাটিটী কাছে রাখিয়া পা দুখানি মেলিয়া বসিয়া আছেন। আমি ঐ তেল মার পায়ে মাখাইতে লাগিলাম। মা বলিলেন, "দেখ, এই পাটায় একটু জোরে মাখাও ত; এটাতে বড় বেদনা হয়।" আমার উহা করিতে প্রায় পঁচিশ মিনিট লাগিল। মা বলিলেন, "এবার হয়েছে ত? এখন নাইতে যাই, ঠাকুরের পূজা করতে হবে। তুমি এখানে খাওয়া-দাওয়া করে যেও।"

আমি বলিলাম, "না, মা, এখনই যেতে হবে, আর একদিন আসব।" মা বলিলেন, "না, না, আমি বলছি; কেদার বুঝি বারণ করেছে? আমার কথা শুনবে, না তার কথা শুনবে? তুমি কেদারকে বলো, মা আসতে দিলেন না।"

—স্বামী তন্ময়ানন্দ

১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসে ঠাকুরের উৎসবের তুই-তিন দিন পরে শ্রীশ্রীমার দর্শনমানসে একদিন বৈকালে বরিশালের জনৈক ভক্তের পরিচয়-পত্র সহ 'উদ্বোধন' কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলাম। রাসবিহারী মহারাজ পত্রখানি পড়িয়া মার নিকট গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন, "দীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য সরলভাবে সাধন-ভজন করে ভগবানলাভ করতে চেষ্টা করা, কুলগুরুর বৃত্তি নষ্ট করা নয়। আমি ঐ ছেলেকে দীক্ষা দিলে সে যেভাবে আমাকে ভক্তি করবে, ঐভাবে যদি তার কুলগুরুকেও শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর বার্ষিক বৃত্তি যথাশক্তি বাড়িয়ে দিতে রাজী থাকে, তাহলে হতে পারে।" আমি উহাতে সম্মত হওয়ায় মহারাজ আমাকে লইয়া মার নিকট গেলেন। ইহার তুই দিন পরে আমি মার কৃপালাভ করিলাম। দীক্ষার পর সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবে আমার মন বিভোর হইয়াছিল।

দীক্ষার সময় মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শাক্ত না বৈষ্ণব?" আমি উত্তর দিলে তিনি যে মন্ত্র আমায় দিলেন, সাত-আট বৎসর পরে আমার জননীর নিকট

প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলাম যে উহাই আমাদের কৌলিক মন্ত্র— মা শুধু উহাতে বীজ সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার দুই মাস পরে আমার স্ত্রীর দীক্ষা লইবার আগ্রহ হওয়ায় তাহাকে লইয়া শ্রীশ্রীমার নিকট যাই। মা তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার কোলে একটি ছেলে আছে। তাকে কার কছে রেখে এসেছ?" স্ত্রী বলিল, "খোকা এসে এস্থান অপবিত্র করে ফেলবে, এই ভয়ে তাকে আনি নি।" শিশুটি মাত্র তিন মাসের, ইহা জানিয়া মা আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "সে কি গো, এতটুকু ছেলের মলমূত্রে ঘর অপবিত্র হয়, একথা তোমাকে কে বললে? ওরা নারায়ণের মত। ওদের ঐরকম জ্ঞানে যত্ন করবে। তুমি এখনই বাসায় যাও। নচেৎ খোকা স্তনের অভাবে গলা শুকিয়ে মারা যেতে পারে। চারদিন পরে এসো। ঠাকুরের ইচ্ছা হলে তোমার দীক্ষা হবে। কিন্তু খোকাকে সঙ্গে আনতে ভুলো না।"

আমি নীচের তলায় বসিয়া ভাবিতেছি, মা যদি কিছু খাইতে খাইতে আমাকে প্রসাদ দেন তাহা হইলে বুঝিব তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। আধ ঘণ্টা পরে মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি তিনি একটি সন্দেশ খাইতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "বাবা, এইটুকু খেয়ে

তারপর প্রণাম কর।” আমি অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐ প্রসাদ পাইয়া মাকে প্রণাম করিতেই ভুলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনিই আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, “এখনি প্রণাম করে বউমাকে নিয়ে বাসায় যাও।”

মা চার দিন পরে দেখা করিতে বলায় একটু দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছিলাম। কিন্তু বাসায় আসিয়া স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, মা কেন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন।

বরিশালে ফিরিবার পূর্ব্বে মাকে প্রণাম করিতে যাই। মা বলিলেন, “সাবধানে যেও। পথে বিপদাদি থেকে ঠাকুর তোমাদের রক্ষা করবেন।” রাস্তায় ভয়ানক ঝড় উঠায় প্রাণসংশয় হইল। বাড়ী পৌঁছিয়া আমাদের সকলেরই ধারণা হইল যে মায়ের আশীর্ব্বাদেই আমরা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি।

ইহার এক বৎসর পরে বৈশাখ মাসে জয়রামবাটীতে মাকে পুনরায় দর্শন করি। এইবারই তাঁহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মা সামনে বসিয়া আদর করিয়া খওয়াইতেন, আর আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতাম।

মার কাছে থাকিয়া ধ্যানজপ করিলে বেশী ফল হইবে মনে করিয়া জয়রামবাটীতে একদিন খুব ধ্যানজপ

চালাইলাম। ঐদিন প্রণাম করিবার সময় মা বলিলেন, “মায়ের কাছে এসেছ, এখন এত ধ্যানজপের কি দরকার? আমিই যে তোমাদের জন্যে সব করছি। এখন খাওদাও, নিশ্চিন্তমনে আনন্দ কর।”

পরদিন ইচ্ছা হইল মায়ের পায়ে ফুলচন্দন দিব। কিন্তু এ বিদেশে এ সব কোথায় পাইব? এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় মামাদের একটি ছোট মেয়েকে দিয়া মা ফুল-চন্দন পাঠাইয়া আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “ছেলে যদি অঞ্জলি দিতে চায় তাহলে এখন এসে দিতে পারে।”

তৃতীয় দিবস মা পায়ের বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন, একটু জ্বরও হইয়াছে। বেলা প্রায় দশটার সময় অপর একটি ভক্ত আসিয়া ঐ বিষয় না জানিয়া মাকে প্রণাম করিলে মা বলিলেন, “আমার পায়ে বড় ব্যথা হয়েছে। পা ছুঁয়ে প্রণাম করো না। ঠাকুর এমনি তোমার কল্যাণ করবেন।” তথায় বিলাস মহারাজ ছিলেন। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শাস্ত্রে নাকি অসুস্থাবস্থায় অথবা শায়িতাবস্থায় প্রণাম করতে নিষেধ আছে। ও করলে কি হয়?” অমনি মা বলিলেন, “হাঁ, বাবা, ওরকম করলে ব্যাধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কাউকে তাহার অসুস্থাবস্থায় প্রণাম করা উচিত নয়।”

প্রায় তিন বৎসর পরে বড়দিনের ছুটিতে মার জন্ম-

তিথি উপলক্ষ্যে তাঁহার শেষ দর্শনলাভ করি। উৎসবের দিন সকালে মা আমাকে ও কোয়ালপাড়া মঠের জনৈক সাধুকে বলিলেন, "তোমরা কামারপুকুরে শিবুর (শিবরাম দাদার) কাছে যাও। সে তোমাদের এক কলসী দুধ কিনে দেবে এবং কিছু ফুল যোগাড় করে দেবে। তোমরা শীগ্‌গির তাই নিয়ে ফিরে এস।" বিলাস মহারাজ বলিয়া দিলেন, "দেরীতে খেলে মার কষ্ট হয়। কাজেই তোমাদের নটার মধ্যে ফিরতে হবে। নইলে মাকে অঞ্জলি দিতে পাবে না।"

কিন্তু আমাদের ফিরতে সাড়ে-এগারটা বাজিয়া গেল। তখন অঞ্জলি দিতে পাইব না ভাবিয়া বড় দুঃখ হইল। বিলাস মহারাজ আমাদিগকে বিলম্বের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "মা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।" ঠিক সেই সময়ে মা কোথা হইতে আসিয়া আমার মাথা হইতে ফুলের ডালাটি লইলেন এবং বলিলেন, "বড় সুন্দর ফুল ত! এ দিয়ে আগে ঠাকুরপূজা করতে হয়। তোমরা শীগ্‌গির নেয়ে এস।" স্নান করিয়া আসিয়া দেখি, ঐ ফুল আমাদের অঞ্জলি দিবার জন্যই সাজান রহিয়াছে। মায়ের এই অহেতুক স্নেহদর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

—শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বরিশাল

১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসে জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্ব্বদিন আমি দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার বাড়ী উপস্থিত হই। মার নিকট সংবাদ যাইলে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে পরদিন কৃপা করিবেন।

যথাসময়ে আমার দীক্ষা হইয়া গেল। মার আদেশে আমরা কয়েকজন মিলিয়া কামারপুকুরদর্শন করিয়া আসিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই একজন স্বামিজীর সহিত সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়া আমার খুব বচসা হইল। বরদা মামা জয়রামবাটীতে ফিরিয়া মাকে সকল কথা বলিয়া দিলেন।

জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার সম্মুখে আমি মনের উল্লাসে গান করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার খুব আনন্দের ভাব, তুমি ঐ রকম আনন্দ করেই থাকবে। মা জগদম্বার সামনে যেমন গান গেয়ে আনন্দ করছ ঠিক তেমনি করবে। সাধুটি ঐরকম স্বভাবের—ওর কথায় দুঃখিত হবে না। তবে তোমাকে জীবনে এই কথা কটি স্মরণ রেখে চলতে হবে। ঠাকুরের খুব দয়া, তাই তোমার ছেলেবয়স

থেকে তাঁর প্রতি টান আপনি এসেছে। জানবে, এই তিনটির সম্বন্ধে খুব সাবধানে চলতে হয়—প্রথম, নদীর তীরে বাসস্থান ; কোন্ সময় নদী হুস্ করে এসে বাসস্থান ভেঙ্গে নিয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয়, সাপ ; দেখলেই খুব সাবধানে থাকতে হয়—কখন এসে কামড়ে দেবে তাঁর ঠিক নেই। তৃতীয়, সাধু ; তাঁদের কোন্ কথায় বা মনের ভাবে গৃহস্থের অমঙ্গল হতে পারে তা তুমি জান না। তাঁদের দেখলে ভক্তি করতে হয় ; কোনও জবাব করে অবজ্ঞা দেখান উচিত নয়।" মার এই অমূল্য উপদেশ চিরদিনের জন্য হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে।

শ্রী—

জয়রামবাটীতে একবার জন্মতিথির দিন সকাল হইতেই মা অসুস্থ বোধ করায় ভাবিয়াছিলেন যে স্নান করিবেন না। কিন্তু পাছে ছেলেরা ইহা শুনিয়া চিন্তিত হয়, এইজন্য অবশেষে স্নান করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। সন্ধ্যার পর তাঁহার জ্বর হইল। আমি কাছে যাইতেই বলিলেন, "বাবা, প্রথমে মনের কথা শুনবে। প্রথম মনই গুরু। এই দেখ না, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতেই মনে হল যে শরীরটা খারাপ, আজ আর নাইব না। আবার নানারকম ভেবে শেষে নেয়েই ফেললুম। তারপর এখন ভুগছি।"

মা বলিতেন, "ঠাকুর বলতেন, 'খাবে গরম, শোবে নরম।' "

কোয়ালপাড়া মঠে জনৈক বিশিষ্ট ভক্ত একদিন মাকে প্রণাম করিতে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আমরা পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে যদি ওঁদের ঐরূপ কষ্ট পেতে হয়, তবে তা নাই করলাম।" মা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "না বাবা, আমরা ত ঐ জন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে? পাপীতাপীদের

ভার আর কারা সহ্য করবে? তবে যারা ভাল ছেলে তারা পা ছুঁলে কিছু হয় না। এক একজন আছে, তারা ছুঁলে যেন পা একেবারে জ্বলে যায়। তোমরা পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে বই কি, বাবা।"

জয়রামবাটীতে একদিন রাত্রে আমরা খাইতে বসিয়াছি। একটা জোনাকিপোকা প্রদীপের চারিধারে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। জনৈক ভক্ত সেটাকে ধরিয়া বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন। মা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওতে অত দয়া করতে হয় না। ওটা মেরে ফেলো। এখনি প্রদীপে পড়লে খারাপ হবে।"

—স্বামী মহেশ্বরানন্দ

১৯১৫ সালে একদিন 'উদ্বোধনে' শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মা বলিলেন, "ঠাকুরের সত্যে কি আঁটই ছিল! আমাদের ওরকম হ'ল কই? ঠাকুর বলতেন, 'কলিযুগে সত্যই তপস্যা। সত্যকে ধরে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়।' "

পরবৎসর জয়রামবাটীতে এক সন্ন্যাসী ভক্তের নৈরাশ্য-পূর্ণ পত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে মা হঠাৎ গম্ভীরভাবে তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন, "সেকি গো! ঠাকুরের নাম কি চারটিখানি কথা যে অমনি যাবে! ও নাম কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। যারা ঠাকুরকে মনে ক'রে এখানে এসেছে তাদের ইষ্টদর্শন হতেই হবে। যদি আর কোন সময়ে না হয় ত অন্ততঃ মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে হবেই হবে।"

১৯১৮ সালের এক রবিবারে মনের অস্থিরতার জন্য ঠাকুর ও মার উপর বড়ই অভিমান হয়। স্থির করিয়া-ছিলাম মার কাছে আর যাইব না। কিন্তু বন্ধুগণের নির্ব্বন্ধে 'উদ্বোধনে' যাইতে হইল। গিয়া দেখি, বিস্তর ভক্ত মাকে প্রণাম করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা একে একে মাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু মা মুখ ফুটিয়া কাহারও

সহিত কথা কহিলেন না। সর্ব্বশেষে আমি প্রণাম করিতেই মা অতি স্নেহে বলিলেন, "ভাল আছ ত,— ?" আমি অভিমানভরে বলিয়া ফেলিলাম, "হাঁ মা, খুব ভাল আছি।" তদুত্তরে মা সহাস্যে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "সেকি, বাবা! মনের স্বভাবই এই। তার জন্য কি এমনটি করতে আছে!"

আর একদিন আইন পড়িবার কালে মাকে প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, এই ত আমার মন; তাতে আবার ওকালতি করতে চললাম। কি উপায় হবে?" মা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি, বাবা? ব্যবসা বই ত নয়।"

—শ্রীললিতমোহন সাহা, ঢাকা

উদ্বোধন

ভবানীপুর হইতে পতিপুত্রসহ শ্রীশ্রীমার চরণদর্শনে যাই। দেখি, মা উপরের মাঝের ঘরে চৌকাঠের সামনে দাঁড়াইয়া কাহার সহিত কথা বলিতেছেন। প্রণাম করিতেই বলিলেন, "কোত্থেকে এলে, মা?" যেন কতদিনের পরিচিত। বলিলাম, "ঢাকায় আমাদের বাড়ী।" কথা শেষ না হইতেই গোলাপ-মা রাম বাবু ও নিতাই বাবু দর্শন করিতে আসিয়াছেন বলিয়া মাকে ডাকিলেন। কপিল মহারাজ আমাকে বলিয়া গেলেন, "আপনি একটু সরে থাকুন, বলরাম বাবুর ছেলে ও ভাইপো এসেছেন; তাঁদের সঙ্গে মায়ের কথাবার্ত্তা হলে আপনি যা বলতে হয় বলবেন।" নিতাই বাবু মার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সহিত কথা বলিয়াই মা তুটি রসগোল্লা আমার হাতে দিয়া পাশেই ঠাকুরঘরে রাম বাবুর সহিত দেখা করিতে গেলেন। আমি রসগোল্লা তুটি হাতে করিয়াই বসিয়া রহিলাম। রাম বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা শেষ হইলে মা আমাকে ঠাকুরঘরে ডাকিলেন ও বলিলেন, "খাওনি কেন? প্রসাদ, খেয়ে ফেল।" জনৈক স্ত্রীভক্ত

আসিয়া বলিলেন, "সব মিষ্টিগুলি সকলকে খাইয়ে দিলে, মা, আমরা খাব কি ?" আমি ত সঙ্কুচিত, কারণ তখনও আমার হাতে রসগোল্লা দুটি রহিয়াছে। বলিলাম, "আপনি এই দুটি খান।" তিনি বলিলেন, "না, মা, তোমাকে কিছু বলি নি, তোমারটি নেব কেন ?" মা তাঁহাকে বলিলেন, "ও—, এসব বলো না, ভক্তদের মনে কষ্ট হবে। বহু লোক, দুটি করেও কুলোয় নি। আহা, ওরা সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসেছে গো।" মা আমাকে বার বার খাইতে বলায় খাইয়া ফেলিলাম। মা নিজেই জল আনিয়া দিলেন, পরে বলিলেন, "রসগোল্লার রস মেজেয় পড়েছে, ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেল, হাত ধোও।" এ সকল করা হইলে মা তক্তাপোশে বসিলেন ও আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যখন বলিলাম, "আমার একটি ছেলে," সেই সময় নী— প্রণাম করিতে আসিল। বলিলাম, "মা, এই ছেলে।" নী— প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে মা বলিলেন, "ছেলের বে দাওনি ?"

আমি— বে হয় নি।

মা— এক ছেলে, বে দাও নি ?

আমি— বে করতে চায় না।

মা— আহা, ছেলেদের আজকাল ঐ এক কথা! কেন, বে করলে কি সৎ হতে পারে না ? মন দিয়েই সব হয়।

ঠাকুর কি আমাকে বে করেন নি? ছেলে দীক্ষা নিয়েছে?

আমি— হাঁ, আপনারই ত ছেলে।

মা— হাঁ! তবে বে করবে না কেন? আচ্ছা, আমি বলে দেব। দুঃখকষ্টে যেতে চায় না। দুঃখকষ্ট পেয়েও যে ঠাকুরকে ধরে থাকবে, সে অবশ্যই ঠাকুরকে লাভ করবে। তোমার কি ইচ্ছা তাই বল ত?

আমি— মা, কিসে ওর মঙ্গল হবে তা ত আমি বুঝতে পারি না; আপনি ওর মঙ্গলামঙ্গল জানেন, সুতরাং আপনি যা বলবেন তাই হবে; আমার অন্য মত নেই।

মা— দেখ, যাদের খুব উঁচু ঘর তারাই সাধু হয়ে সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হয়ে যায়; কেউ বা সংসারের আস্বাদ ভোগবার জন্য জন্ম নেয়। আমি বলি, একেবারে ভোগ কেটে যাওয়াই ভাল। ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা আলাদা।

আমি— মা, ও ত আপনারই ছেলে, আপনার হাতেই ওর মঙ্গলামঙ্গলের ভার। আপনি যা করতে হয় করবেন।

মা— আমি বলি কি, ও বে করুক; ওর সব ভোগ একেবারে কেটে যাক। তা না হলে আবার কখন কি ভোগ এসে জোটে তা বলা যায় না। তবে জেনে রেখো, ঠাকুর যখন ধরেছেন, ওর পতন কিছুতেই হবে না। তুমি

নিশ্চিন্তমনে বসে থাক। ঠাকুরের দেওয়া সিদ্ধমন্ত্র ওকে দিয়েছি, ওর কি কখন অমঙ্গল হতে পারে?

তারপর বলিলেন, "এখানে প্রসাদ পাবে ত?" আমি "হাঁ" বলায় মা ভাঁড়ারিকে বলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মা— কার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছ? ঠাকুরের নাম কার কাছে শুনেছ?

আমি— দেওভোগে নাগ মহাশয়ের কাছে আমরা যাই এবং সেখানেই তাঁর কাছে ঠাকুরের মাহাত্ম্য শুনি। তাঁর ভাব দেখে মনে সকল সময়ই ঠাকুরকে ও আপনাকে দেখবার জন্য বড়ই আকাঙ্ক্ষা হ'ত। ঠাকুরের চরণদর্শনের সৌভাগ্য হয় নি; আপনার কৃপায় আপনার চরণদর্শন হল এবং ঠাকুরকে দেখার আকাঙ্ক্ষা আমার তৃপ্ত হয়ে গেল। দীক্ষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হয় নি।

মা— স্বপ্নে পেয়েছ ত?

আমি— হাঁ, মা, স্বপ্নে আপনাকে দর্শন করেছি ও দীক্ষা পেয়েছি।

মা— আচ্ছা, মন্ত্র কি, মনে আছে ত? আমাকে বলে ফেল।

আমি বীজটি বলিতেই মা বলিলেন, "হাঁ, এই তোমার ঘর; বেশ বেশ, তুমি ভাগ্যবতী।"

আমি— মা, আর কিছু বলবেন না?

মা— না, ঐ বীজই জপ করবে, ওতেই তোমার কল্যাণ নিশ্চয় জেনে রেখো। কার সঙ্গে এলে?

আমি— আমার স্বামীর সঙ্গে।

মা— তিনি কোথায় থাকেন? কি কাজ করেন?

আমি— তিনি রা— বাবুদের ষ্টেটে ম্যানেজার।

মা— ওমা, তুমি ম্যানেজার বাবুর স্ত্রী? এতক্ষণ বলনি কেন? ও রাধু, ও মাকু, ম্যানেজার বাবুর স্ত্রীকে এসে প্রণাম কর।

আমি মায়ের কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম, "মা, এ বলেন কি? আমি যে কায়স্থসন্তান, এরা ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে কি করে আমাকে প্রণাম করবে?" মা বলিলেন, "ওসব বলতে নেই। তুমি ভক্ত মানুষ, ভক্তের জাত নেই; তোমাকে প্রণাম করলে ওদের কল্যাণ হবে।" রাধু ও মাকু আসিলে আমি তাহাদের পা জড়াইয়া ধরিতেই মা বলিলেন, "থাক্, থাক্, দেবে না। ওরা ভক্ত কিনা, তাই সর্ব্বভূতে ঠাকুরকে দেখছে। আচ্ছা, দেওভোগে দুর্গার কাছে কি শুনেছ? তার কাছে তোমার যাওয়া-আসা ও পরিচয় কি করে হল?"

আমি— আমার স্বামী সাধুদর্শনে সেখানে একবার গিয়েছিলেন; তাতেই নাগ মহাশয় তাঁকে আপনার করে

নিয়ে ঠাকুরের কথা পুনঃপুনঃ বলেন ও আমাকে দেখতে দয়া করে আমাদের বাড়ীতে যান। তাঁর ভাব ও ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে আমরা বহুদিন তাঁর কাছেই যাতায়াত করি। তিনিও দয়া করে আমাদের আপনার করে নেন এবং আপনার ও ঠাকুরের মাহাত্ম্য আমাদের কাছে বলেন। তাতেই প্রাণের ভিতর আপনাদের উপর আমরা আকর্ষণ অনুভব করি। তিনি কেবলই বলতেন, 'আমি কিছু না, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবই আমার সব। যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কর, মনেপ্রাণে তাঁর শরণাপন্ন হও; এ ছাড়া অন্য গতি নেই। অদৃষ্টে ছিল, ঠাকুরের ঐ শ্রীচরণদর্শন করেছিলুম, তাই ধন্য হয়ে গেছি। শিবাবতার স্বামিজীকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছি, সাক্ষাৎ মা ভগবতীকে দর্শন করেছি ও মায়ের কৃপা পেয়েছি। আর কি বলব, তোমরা সকলে কায়মনোপ্রাণে মা ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে শরণ নাও, কল্যাণ হবে।'

মা— আহা, তার কথা আর কি বলবো? আমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী ভাবে দেখত। প্রথম যে দিন আমাকে দর্শন করতে এল, আমার ছিল একাদশী। তখন কোন পুরুষ ভক্ত আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে পেত না, সিঁড়িতে মাথা ঠুকে প্রণাম করত। একজন ঝি এসে নাম বলে আমাকে বলত, 'মা, তোমাকে অমুক বাবু

প্রণাম কচ্ছেন।' আমিও আশীর্ব্বাদ জানাতুম। সে দিন ঝি বললে, 'মা, নাগ মহাশয় কে? তিনি প্রণাম কচ্ছেন, কিন্তু মাথা এত জোরে ঠুকছেন, মনে হয় রক্ত বেরুবে! মহারাজ পেছন থেকে কত বলছেন থামবার জন্যে, কিন্তু কোন বাক্যই নেই—যেন হুঁশ নেই। পাগল নাকি, মা?' আমি বললুম, 'ওগো, যোগেনকে বল এখানে পাঠিয়ে দিতে।' যোগেন নিজেই ধরে নিয়ে এল। দেখি কপাল ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, হেথায় পা ফেলতে হোথায় পড়ে, চোখের জলে আমায় দেখতে পাচ্ছে না। আমি ধরে বসালুম। কেবল 'মা, মা' শব্দ—যেন পাগল, অথচ শান্ত ধীর স্থির। চোখের জল মুছিয়ে দিলুম। আমার খাবার ছিল লুচি, মিষ্টি, ফল। আমি খেতে বসেছিলুম, এমন সময়ে এই ঘটনা। আমি কিছু খেয়ে তাকে খাইয়ে দিতে লাগলুম। খেতে পারে না গো, খাবার জিনিস গিলতে পারলে না। বাইরের দিকে মন নেই, কেবল 'মা, মা' রব; আর আমার পায়ে হাত দিয়ে বসে রইল। আমাকে মেয়েরা বলতে লাগল, 'মা, তোমার ত খাওয়া হল না। মহারাজকে বলি একে সরিয়ে নিতে।' আমি বললুম, 'থাক্, একটু স্থির হয়ে নিক্।' খানিক বাদে গায়ে মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে ও ঠাকুরের নাম করতে

করতে তার হুঁশ এল। আমিও খেতে লাগলুম, ওকেও খাইয়ে দিতে লাগলুম। খাওয়া হলে তাকে নীচে নিয়ে গেল। আমাকে কেবল যাবার সময় বলে গেল, 'নাহং, নাহং, তুহুঁ তুহুঁ।' যারা কাছে ছিল তাদের আমি বললুম, 'দেখ কি বুদ্ধি!' আমার জন্যে সব করতে পারত গো।

"একবার একখানা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে মাথায় করে বাড়ীর গাছের ভাল ভাল আম এক টুকরি নিয়ে এল। মনের ভাব, বসে আমাকে খাওয়াবে। কিন্তু মুখে কিছুই বলা নেই। টুকরি মাথায় নিয়ে এখানে ওখানে কাঙ্গালের মত ঘুরছে। যোগেন বলে পাঠালে, 'মাকে বল, নাগ মহাশয় আম নিয়ে এসেছেন। কিছু বলেনও না, কারও কাছে দেনও না।' আমি বললুম, 'এখানে পাঠিয়ে দাও।' পাঠিয়ে দিলে টুকরি মাথায় করেই এল। একজন ব্রহ্মচারী মাথা থেকে টুকরি নাবিয়ে নিলে। তখনও ঠাকুর-পূজা হয় নি। আমাকে প্রণাম করে পূর্ব্ববারেরই মত বেহুঁশ। মুখে ঠাকুরের নাম ও 'মা, মা' রব। দু চোখ বয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। খুব ভাল আম—কতকগুলিতে চুনের ফোঁটা দেওয়া; কেটে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হল। মেয়ে যোগেন এসে আমাকে একখানা শালপাতায় করে প্রসাদ দিলে। আমি কিছু খেলুম ও গোলাপকে বললুম,

'আর একখানা শালপাতা দাও।' পাতা দেওয়া হলে পাত থেকে প্রসাদ উঠিয়ে দিয়ে বললুম, 'খাও'। কে খাবে, তার শরীরে হুঁশ নেই, হাত যেন অবশ! আমি ধরে অনেক বলতে বলতে খেলে ত না-ই, একখানা আম নিয়ে মাথায় ঘসতে লাগল। আমি নীচে বলে পাঠাতেই তারা লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেল। প্রণাম করতে করতে কপাল ফুলিয়ে দিলে, অন্নপ্রসাদ আর নিলে না। কিছু বাদে হুঁশ হতেই নাকি চলে গেছে, খবর পেলাম।"

একটু পরেই পাতা হইল। মা বলিলেন, "এস, প্রসাদ পাবে।" মার পেছু পেছু খাবার ঘরে গেলে মা বলিলেন, "এস, আমার মুখো হয়ে অপর পংক্তিতে বস।" মা মাখন দিয়া ভাত মাখিয়া তিন গ্রাস মুখে দিয়াই আমাকে বলিলেন, "প্রসাদ নেবে, হাত পেতে নাও।" ডান হাত বাড়াইতেই মা বলিলেন, "ও রকম করে কি প্রসাদ নেয়? দু হাত পেতে নাও।" আমি দুই হাত পাতিলে মা সমস্ত মাখন-মাখান ভাত আমার হাতে চাপিয়া দিয়া বলিলেন, "মাথায় ছুঁইয়ে খেয়ে ফেল।" আমি ত অবাক। বলিলাম, "মা, আমি কায়স্থ; আমাকে ত খেতে খেতে ছুঁয়ে দিলেন। এখন আপনার কি করে খাওয়া হবে?" মা বলিলেন, "তোমাদের সঙ্গে আবার আমার জাতের বিচার কি? তোমরা যে আমারই

সন্তান। প্রসাদ খেয়ে ফেল।" তখন আমি লজ্জিতভাবে প্রসাদ খাইতে লাগিলাম। মা খুব প্রসন্নভাবে খাইতে ও কথা বলিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে আমার কি চাই, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

মা— হাঁ গা, তোমাদের দেশে তীর্থ নেই ?

আমি— না, মা, তীর্থ কই, দেখি না ত। তবে একটি স্নান আছে, তাকে ব্রহ্মপুত্র-স্নান বলে।

মা— হাঁ, ও কথা শুনেছি বটে। আচ্ছা, এবার আমাকে নিয়ে যেও, তোমাদের দেশও দেখে আসব, তীর্থও করা হবে।

আমি— মা, পূর্ব্ববঙ্গের কি সে সৌভাগ্য হবে ?

মা— কেন হবে না ? সেখানে ঠাকুরের অনেক ভক্ত আছে। নরেন গেছে, শরৎ গেছে, আরও ওরা অনেকে গেছে। যেখানে ঠাকুরকে চায়, সেখানে আমি যাব না কেন ?

ছোলার ডাল, চচ্চড়ি, ডালনা ও টক—ইহাই ছিল প্রসাদ। মা বলিলেন, "এদের মাছ এনে দাও।"

আমি— না, মা, প্রসাদ খেয়েই তৃপ্ত হয়েছি, মাছ আর খাব না।

মা—সেকি গো, এয়োস্ত্রী মানুষ, মাছ খাবে না ! পায়ে আলতা পর নি কেন ?

আমি— আমাদের দেশে আলতাপরার চল নেই ; শাঁখা, সিঁদুর পরলেই লোকে এয়োস্ত্রী বলে।

মা— তা হবে ; এদেশে শাঁখা, সিঁদুর সখ করে পরে, নোয়া আর আলতাই এয়োস্ত্রীর লক্ষণ।

দুধ, একটি আম ও একটি সন্দেশ মাকে দেওয়া হইয়াছিল। মা উহা একত্র মাখিয়া একটু খাইয়া বলিলেন, "ছেলের (নী—র) জন্যে রহিল।" এবার আচমনের পালা। আমি পাতা তুলিতেই লক্ষ্মী দিদি তাড়াতাড়ি আমার পাতা ধরিয়া বসিলেন। আমি দিব না, তিনিও ছাড়িবেন না। মা দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দাও, লক্ষ্মীই নিক্। তুমি সকলের বড় বয়সে ; ওরা থাকতে তুমি কেন নেবে ?" তখন বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিতে হইল। মার সঙ্গে কলতলায় যাইতেই তিনি ঘটিতে করিয়া বালতি হইতে জল উঠাইয়া দিয়া বলিলেন, "আচিয়ে নাও।" আমি ত অপ্রস্তুত ! বলিলাম, "মা, আমি পারব না।" মা বলিলেন, "কেন পারবে না ? আমার কথা মেনে চললেই তোমাদের কল্যাণ। নাও, শীগ্‌গির করে আঁচিয়ে ফেল, ওরা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘটিটা মাথায় ঠেকিয়ে নাও না।" অগত্যা মায়ের আদেশই বলবৎ রহিল। আমি সরিয়া যাইতেছি দেখিয়া মা বলিলেন, "ওকি, পা ধুলে না ?" বলিলাম, "পরে ধোব।" মা বলিলেন, "না, না,

এস, জল দিচ্ছি।" এবার আমি মায়ের পিছনে যাইয়া বলিলাম, "মা, আমি ওসব পারব না।" মা বলিলেন, "কেন, কি হয়েছে? খানিকটা জল মাথায় দিয়ে নাও। আমার কথা মানলে তোমাদের মঙ্গল হবে।" অগত্যা সেইরূপ করিয়া মায়ের আদেশে তাঁহার পিছনে পিছনে তাঁহার ঘরে চলিলাম।

ঘরে ঢুকিতেই মা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া একটু পরেই বলিয়া উঠিলেন, "ও—, কি করলে? ছেলে এসে কি খাবে?" দেখি নী—র জন্য যে প্রসাদ মা রাখিয়াছিলেন, জনৈক স্ত্রীভক্ত আনন্দে তাহাই খাইতেছেন এবং বলিতেছেন, "সবই ওঁর ছেলেরা খাবে, আর আমরা শুকিয়ে মরব!" দেখিয়া আমার যা হাসি! শেষে লক্ষ্মী দিদি ও অন্যান্য মেয়েরাও হাসিতে লাগিলেন। আমার ত হাসি আর থামে না। মা কিন্তু বিশেষ চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, পাচক হেঁসেল তুলিয়াছে কি-না এবং না তুলিয়া থাকিলে কি আছে। ভাত, ডাল ও চচ্চড়ি আছে শুনিয়া মা বলিলেন, "আচ্ছা, খানিকটা এখানে দিতে বল।" ব্রাহ্মণ একখানি থালায় করিয়া উহা দিয়া গেলে মা সব একসঙ্গে মাখিয়া একটু মুখে দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন, "ছেলের জন্য রইল।" আমি পিছনে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি,

তিনি দুইবার ভাত খাইলেন কিরূপে ? আরও ভাবিতেছি, কি করিয়া মায়ের একটু সেবা করিব। তাঁহার জল লইয়া আঁচান ও পা-ধোয়া হইল, অথচ তাঁহার সেবা কিছুই করিতে পারিলাম না। মার পিছনে চলিয়াছি। মা ঠাকুরঘরে গিয়া আমাকে বলিলেন, "কপাটের উপর আমার গামছাখানা আছে, নিয়ে এস। আমার পাটা মুছে দাও।" এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। আমি ঐরূপ করিতেই মা বলিলেন, "আচ্ছা, তক্তাপোশে বসি, তুমি ভাল করে আমার পায়ের তলাখানা মুছে দাও।" আমি মায়ের পা দুখানি মুছিতে মুছিতে মাথায় ঠেকাইতে লাগিলাম। মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এখন থাক্।"

লক্ষ্মী দিদি পান লইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ধন্য মেয়ে তুমি, মা যেচে কৃপা দিলেন ; ধর, একটি পান খাও।" আমি চোখের জলে পান দেখিতে পাইলাম না। মা পানটি আনিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, "ঐ মাদুরখানা মেজেয় পাত, ঐ সতরঞ্চিখানা বিছিয়ে দাও, বালিস তিনটি দাও।" বিছানা হইলে মা শুইয়া পড়িলেন। আমি বসিয়া মায়ের পায়ে হাত বুলাইতেই মা বলিলেন, "এখন আমার পাশে শুয়ে পড়।" আমি সঙ্কুচিতা হইতেছি দেখিয়া মা বলিলেন, "আমার

বালিশেই মাথা রেখে শোও।” আমি বলিলাম, “না, মা, ঘুমিয়ে পড়লে আপনার গায়ে পা লাগতে পারে, আমি শোব না।” মা বলিলেন, “সেকি গো? আমি বলছি, তুমি শুয়ে পড়।” কি করি, মায়ের আদেশই পালন করিতে হইল। মা বলিলেন, “তোমাকে দেখে বড়ই আনন্দ হল, যেমন অনেক দিন পরে শ্বশুরঘর থেকে মেয়ে এলে মায়ের আনন্দ হয়। আচ্ছা, কবে যাবে?” আমি বলিলাম, “আজকে সন্ধ্যায়ই যাব, মা, মনে রাখবেন। জানবেন আমি আপনার ভিখারিণী মেয়ে।” বলিয়াই কাঁদিতে লাগিলাম। মা বলিলেন, “ষাট, ষাট, ও কথা কেন বল, মা? তুমি আমার রাজরাণী মেয়ে। তোমাকে আমি নিজে গিয়ে দীক্ষা দিয়েছি। তোমার দুঃখ করবার কিছু নেই। তোমার ভালমন্দ সবই আমি দেখব, তুমি কোন চিন্তা করো না।”

বেলা চারটার সময় রাধু স্কুল হইতে আসিল। তাহার খাওয়া-দাওয়া হইলে মা তাহাকে বলিলেন, “এস, চুল বেঁধে দিচ্ছি।” রাধু বলিল, “না, আমি নিজেই বাঁধব।” মা চিরুনি লইয়া চুলে হাত দিতেই রাধু চিরুনি দ্বারা মাকে মারিতে লাগিল। মা বলিলেন, “পাগল মেয়ে, একে কি করি বল!” যোগেন-মা আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। রাধু মাকে মারিতেছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, “সেকি

কথা! আমাদের মাকে রাধু কেন মারবে? আমি ওকে মেরে ফেলব।" তবু রাধু ছাড়িতেছে না। তখন মা বলিলেন, "এখন শরৎকে ডাকি, আর ত ব্যথা সইতে পারি না।" যোগেন-মা ডাকিয়া বলায় পূজনীয় শরৎ মহারাজ নীচের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই রাধু, মাকে মের না।" তাঁর স্বর শুনিয়াই রাধু তাড়াতাড়ি সরিয়া বসিল। কুসুম দিদি বলিলেন, "এস, আমি বেঁধে দিচ্ছি।" রাধুও শান্ত মেয়েটির মত তাঁহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। এমন সময়ে রাধুর মা আসিয়া বলিলেন, "দেখ গো, তোমার একটি ছেলে যেন কি নিয়ে এয়েছে। যদি কাপড় এনে থাকে, আমার মশারির চাঁদোয়া করব।" সত্যই নী— ফল, মিষ্টি ও কাপড় লইয়া আসিয়াছে। সে মাকে প্রণাম করতেই মা বলিলেন, "আহা! বেশ কাপড়, বেশ মিষ্টি, ফল। ও গোলাপ, এসব নিয়ে খুলে রাখ। ঠাকুর উঠলে ভোগ হবে। আহা! ছেলের মুখখানা শুকিয়ে গেছে। এখন হাত-মুখ ধুয়ে প্রসাদ খেয়ে এস। বাবা, বেঁচে থাক, ভক্তি হোক। কিন্তু তোমাকে বে করতে হবে।" নী— প্রণাম করিয়া নীচে গেল। গোলাপ-মাও প্রসাদের থালা লইয়া নীচে গেলেন। রাধুর মা আসিয়া বায়না ধরিলেন, "দাও না গো কাপড় দুখানা, আমি মশারির চাঁদোয়া করব।" মা

বলিলেন, "তা কি হয়? ছেলে মনে দুঃখ পাবে।" পরে কুসুম দিদিকে বলিলেন, "একখানা কাপড় দাও ত, পরব।" যোগেন-মা বলিলেন, "ভাগ্য দেখ এদের। এরা কারা গো? একদিন এসেই এত দয়া পেয়ে গেল! ধন্য মেয়ে তুমি, তোমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে যাচ্ছে।" আমি ত জড়সড়—ইনি আবার কি বলেন! মা বলিলেন, "এরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক, এদের ভারি বিশ্বাস। এদের দেখলেও কল্যাণ হয়।" আমি গামছা দিয়া মায়ের পা দুখানি আবার মুছাইয়া দিলাম। মা কাঁপড়খানি পরিয়া আসনে বসিয়া ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, এদের মঙ্গল কর। এরা তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। এই সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আমার কাছে এসেছে।" পরে মা আমাকে লইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে কি?"

আমি— মা, ছোট ছোট বিধবা মেয়েরা মাছ খেলে—এ দেখে আশ্চর্য্য হলুম। আমাদের দেশে ত এ রকম মাছ খেতে দেয় না, সমাজে বাধে।

মা— ও সব কি জান? দেশাচার ও লোকাচার। আমাদের দেশে ছোট বিধবাদের মাছ খেতে ও গহনা, কাপড় পরতে দেয়। ওদের আকাঙ্ক্ষা থাকে কিনা! না হলে

চুরি করে খাবে। যখন বুঝতে পারবে এটা সমাজবিরুদ্ধ, তখন ছেড়ে দেবে।

আমি —মা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা কি যায় ?

মা— না, মা ; তা সত্য বলেছ। তবু বড় হলে দশ-জনকে দেখে লজ্জা হয়, ঝগড়া-বিবাদের সময়ও অপরের খোঁটা সইতে হয় ; তাই আপনি সামলে চলে।

আমি— আচ্ছা, মা, আপনি বামুনের মেয়ে হয়ে দুবার ভাত খেলেন—মুখ এঁটো করলেন ?

মা— সেকি গো, কখন দুবার খেলুম ?

আমি— এই যে খোকাকে প্রসাদ করে দেবার সময় ?

মা— ছেলেদের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি। ওতে কোন দোষ হয় না। আর প্রসাদ হলে পাঁচবারও খেতে দোষ নেই। প্রসাদ কোন বস্তুর মধ্যে নয়। ঐ সব খুঁটিনাটি নিয়ে মনকে বিচলিত করবে না ; ওতে ঠাকুরকে ভুল হয়ে যায়। যে যা বলে বলুক, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে, তাই করবে। ঠাকুর বলতেন, 'লোককে দেখবে পোকের মত।' তাই বলে সকলকে নয়, নিন্দুক লোকের ও হীন সংস্কার যাদের, তাদের কথাই বলেছেন।

আমার বাড়ী যাইবার সময় হইল। গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। মা সজলনয়নে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে

বলিলেন, "আবার এসো।" আমার যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না; মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মা বলিলেন, "কেঁদো না, মা, আমি ত তোমাদেরই আছি। আবার এসো।" মাকে আমার এই প্রথম ও শেষ দর্শন। মায়ের আশীর্ব্বাদ ও স্নেহমাখা সান্ত্বনা-বাক্যই আমার জীবনের সম্বল হইয়া আছে।

—শ্রীমতী সুশীলা মজুমদার, ঢাকা

কাশীতে 'বেণীমাধবের ধ্বজা' দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন, "আমাকে এখন এমন অসমর্থ দেখছ, কিন্তু ঠাকুরের শরীর-ত্যাগের পর আমি যখন কাশী এসেছিলুম তখন এই বেণীমাধবের ধ্বজার উপর উঠেছিলুম। হরিদ্বারে চণ্ডীর পাহাড়, আর পুষ্করে সাবিত্রী পাহাড়েও উঠেছিলুম।"

জনৈক সাধু ৺কাশীতে মণিকর্ণিকায় খুব তপস্যা করিতেছিলেন। আমি কলিকাতা আসিবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন, "মাকে জিজ্ঞাসা করো কতদিনে ভগবানের কৃপা আমার উপর হবে।" আমি মাকে ঐ কথা বলায় মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তাকে লিখে দাও যে তপস্যা করছ বলেই যে ভগবানের কৃপা হবে, এমন নয়। আগে ঋষিরা ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ড হয়ে নীচে আগুন জ্বেলে হাজার হাজার বছর কত তপস্যা করত! তাতে কখনও কারও উপর কৃপা হ'ত, কখনও বা হ'ত না। সবই তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করে।"

'উদ্বোধনে' একদিন একটি যুবক ভক্ত মাকে সাধু হইবার ইচ্ছা জানায়। মা একটু হাসিয়া নিকটস্থ একজন সাধুকে দেখাইয়া বলিলেন, "সকলেই যদি সাধু হবে তবে

এদের দেখবে কে ? এদের সব খাওয়া পরা কে দেবে ?” ছেলেটি পরে বিবাহ করিয়াছে।

একবার ঠাকুরের সময়ে জনৈক বিশিষ্ট গৃহস্থ ভক্তের সহিত আমার কাশী যাইবার কথা উঠে। তাহাতে আমার পাথেয় খরচ তিনিই বহন করিতেন। মা শুনিয়া আমায় বলিলেন, “তুমি সাধু, তোমার কি আর যাওয়ার ভাড়া জুটবে না ? ওরা গৃহস্থ, ওদের সঙ্গে কেন যাবে ? এক গাড়ীতে যাচ্ছ ; হয়ত বললে, ‘এটা কর, ওটা কর।’ তুমি সন্ন্যাসী, তুমি কেন সে সব করতে যাবে ?”

আর একবার মায়ের কলিকাতার বাড়ী হইতে আমার কাশী যাওয়ার কথা হয়। ঐ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিয়াছিলেন, “দেখ, কলকাতায় সকাল থেকে উঠেই লোকে চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা করতে ছুটেছে, আর কাশীতে সকাল থেকেই সকলে গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথদর্শন, জপধ্যান—এই সব নিয়ে আছে।” আমি বলিলাম, “এখানে আপনার সেবায় রয়েছি।” মা তাহাতে বলিলেন, “হাঁ, যে কয়দিন শরীর আছে, তাও বটে।”

একদিন প্রসঙ্গক্রমে মা বলিলেন, “ঠাকুরের চুল কি কম জিনিস ! তাঁর শরীরত্যাগের পর যখন প্রয়াগ যাই, *

* বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে মা অযোধ্যা ও প্রয়াগে নামিয়াছিলেন (১৮৮৭)।

তখন তাঁর চুল তীর্থে দেবার জন্যে সঙ্গে নিয়েছিলুম। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্থির জলের কাছে ঐ চুল হাতে নিয়ে জলে দেব মনে করছি, এমন সময় হঠাৎ একটি ঢেউ উঠে ওটি আমার হাত থেকে নিয়ে আবার জলে মিলিয়ে গেল। তীর্থ পবিত্র হবার জন্যে তাঁর চুল আমার হাত থেকে নিয়ে গেল।"

একদিন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, যাদের মন্ত্রদাতা গুরু ও সন্ন্যাসের গুরু পৃথক, তারা কাকে গুরুরূপে ধ্যান করবে?" মা উত্তরে বলিলেন, "মন্ত্রদাতা গুরুই গুরু, এই মন্ত্র থেকেই ক্রমে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস লাভ হয়।"

—স্বামী শান্তানন্দ

এক রবিবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার প্রবল আগ্রহে বেলা ২॥ টার সময় কলিকাতার বাসা হইতে রওনা হইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে 'উদ্বোধন' আফিসে উপস্থিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—মা কোথাও গিয়াছিলেন, এইমাত্র ফিরিয়াছেন, একটু দেরীতে দেখা হইবে। কিন্তু আমার দেরী সহিল না। আমি দেখা করিতে যাইতেছি দেখিয়া পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ (তিনি সিঁড়ির কাছে ছিলেন) আমাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমার তখন যুবা বয়স, হঠাৎ উত্তর দিলাম, "মা আপনার একার?" মহারাজকে সরাইয়া দিয়া উপরে গেলাম। গিয়া দেখি মা পাখা করিতেছেন। আমি প্রণাম করিলে মা কুশল-প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, "খুব যে ঘেমেছ।" উত্তর দিলাম, "পথে রৌদ্র ও গরম ছিল।" মার নিকট হইতে পাখাখানি লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ কোথায় গিয়েছিলেন?" মা বলিলেন, "কালীঘাট।" তারপর বলিলেন, "কিছু প্রসাদ খাও, পরে কথা কইব।" প্রসাদ খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, স্বরূপ-মানুষ ও দেবতার মধ্যে তফাৎ কি?"

মা— মানুষই দেবতা হয়। কর্ম্ম করলে সবই সম্ভব হয়।

আমি— কি রকম কর্ম্ম?

মা— ঠাকুরের বিধিনিষেধ মেনে অভীষ্টদেবতায় নিষ্ঠা রেখে ডাকলে সবই হয়ে যায়।

আজ আর কথা বলিতে পারিলাম না, কারণ তুই-এক জন স্ত্রী-ভক্ত আসিতেছেন। আমি প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় বলিলাম, "মা, আজ বড় অন্যায় করে এসেছি। সিঁড়ি দিয়ে আসবার সময় শরৎ মহারাজকে ধাক্কা দিয়ে এসেছি। কি করে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব? আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" মা বলিলেন, "ছেলেদের আবার অপরাধ কি? আমার ছেলেরা এমন নয় যে অপরাধ ধরবে। তুমি এজন্য ভেবো না।" নামিয়া আসিতেই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা চাহিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "এই রকম উৎকণ্ঠাই চাই" এবং আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর বলিলেন, "এখন থেকে তোমায় কেউ কোন বাধা দেবে না।" তাঁহার আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া লইলাম। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে দেখিলেই খুব হাসিতেন।

আর এক রবিবার মার কাছে উপস্থিত হইলাম। সেদিন ভক্তেরা কেহ আসিয়াছেন, কেহ আসিতেছেন।

আমি প্রণাম করিলে মা বলিলেন, "একটু" বস।" তিনি কিছু প্রসাদ দিলেন। উহা খাইতে খাইতে তাঁহাকে বলিলাম, "মা, একটী দিন সুযোগ হয় না যে অনেকক্ষণ ধরে মনের সকল কথা জিজ্ঞাসা করি।"

মা— আমার ত সকল ছেলেরই কথা শুনতে হয়! তবে দু'-একটী জিজ্ঞাসা কর, উত্তর দিচ্ছি।

আমি— মা, যারা খুব গরীব, কাশী কি অন্য কোন ধামে যেতে পারে না, তাদের ঐ রকম ফল আর কিসে হয়?

মা— কেন, তারা দক্ষিণেশ্বরে কিংবা বেলুড়ে গেলে সে ফল হয়, যদি সে রকম বিশ্বাস থাকে। যাঁর জন্য কাশী যাওয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ও বেলুড়ে আছেন।

আমি— মা, আমাদের কি উপায় হবে?

মা— তোমাদের কি ভয়? যারা ঠাকুরের কৃপা পেয়েছে কিংবা তাঁর কোন সংশ্রবে এসেছে তাদের জন্য ঠাকুরই সব করবেন।

ইহার পরই প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে হইল। অন্য দু'-এক দিনের সামান্য কথাবার্ত্তা এখানে দিতেছি।

আমি— মা, আমাদের জপধ্যান কি পদ্ধতিতে করতে হবে?

মা— যে ভাবে ও যেমন ইচ্ছা হয় ঠাকুরে একটু মন রেখে করবে। তাতেই সব মিলবে। তোমাদের ভাবনা কিসের?

আমি— মা, ভাবনা নেই, তবু আপনার শ্রীমুখের আদেশ পাবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি।

মা— তোমাদের জন্য সকলেই আছেন। ঠাকুর আছেন, আমাকে ত দেখতেই পাচ্ছ।

আমি— মা, স্বামিজীকে ও ঠাকুরকে দেখার সৌভাগ্য হয় নি।

মা— ভক্তি করে ডাক, সকলকেই পাবে। আমি বলছি, তোমরা ধন্য যে এমন সময় জন্মেছ। তাঁর লীলা-খেলা দেখার সময় এখন। শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখলে সবই সহজ।

আমি— মা, মানুষের ইচ্ছামতই কি সব কাজ হয় এবং আশা পূর্ণ হয়?

মা— সদ্ ইচ্ছাগুলিই পূর্ণ হয়।

—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ রায়, বরিশাল

শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষা লওয়ার কিছুদিন পরে লালমোহনের (কপিলেশ্বরানন্দের) মনে সন্দেহ হয়, "এ আবার কি করিলাম ? স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা লইলাম ?" ক্রমে তাহার অত্যন্ত অশান্তি আসে। পরে সে স্থির করিল যে এক দিবসের মধ্যে ঠাকুর যদি এ বিষয়ে তাহাকে বুঝাইয়া না দেন তাহা হইলে সে মন্ত্রত্যাগ করিবে। পরদিন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের আদেশে সে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে দুধ লইয়া গেল। মাকে প্রণাম করিয়া উঠিলে মা তাহাকে বলিলেন, "দেখ, আমি ত তোমায় মন্ত্র দিই নি, ঠাকুর দিয়েছেন।" কিছুদিন পরে আবার তাহার সন্দেহ হয়। মনে হইল, "যদি ঠাকুরই মন্ত্র দিলেন তবে হরেন বাবু এসে যদি বলেন, 'মার কাছ থেকে শক্তি পেয়েছি,' তাহলে জানব সব সত্য।" তাহার কিছুদিন পরে উৎসবের সময় হরেন বাবু মাকে প্রণাম করিয়া মঠে আসিয়া লালমোহনকে বলিলেন, "আজ মার কাছ থেকে বিশেষ শক্তি পেয়েছি।" তখন তাহার সকল সন্দেহ মিটিল।

একবার 'উদ্বোধনে' পাচক-ব্রাহ্মণকে কোন বিশেষ কারণে ছাড়াইয়া দিবার কথা হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীমার

সেবার অসুবিধা হইবে বলিয়া তথাকার অধ্যক্ষ তাহাকে জবাব দিতে পারেন নাই। মা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের ত্যাগই লক্ষ্য ; একটা চাকরকে তোমরা ত্যাগ করতে পার না ?"

মঠের কোন ভৃত্য কথার অবাধ্য হওয়ায় জনৈক মহারাজ তাহাকে চাপড় মারিয়াছিলেন। উহা মার কানে যাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ওরা ত সন্ন্যাসী, গাছতলায় থাকবে। তাদের আবার মঠ, বাড়ী, চাকর—আবার সে চাকরকে মার !"

ব্রজেশ্বরানন্দ উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করিতে যাইবার জন্য মায়ের অনুমতি চাহিতে গিয়াছিল। মা শুনিয়া বলিলেন, "এ কার্ত্তিক মাস, যমের চার দুয়ার খোলা ; আমি মা হয়ে কেমন করে তোমায় এখন যেতে বলি ?"

একজন অতি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিল। তাহাকে কঠোর দণ্ড দিবার জন্য মাকে কেহ কেহ বলিয়াছিল। মা তাহাতে বলেন, "আমি মা যে গো, আমি কেমন করে অমন কথা বলব ?"

এক সময়ে একটি ভক্ত মাকে বলিয়াছিল, "মা, আমি বড় গরীব। ইচ্ছা হয়, যখন-তখন আপনার দর্শনে আসি। কিন্তু আপনার জন্য ইচ্ছামত কিছু আনতে পারি নে বলে সব সময় আসতে পারি নে।" শুনিয়া

করুণাময়ী স্নেহবাক্যে বলিলেন, "বাবা, যখন আসবার ইচ্ছা হবে, একটা হরীতকী হাতে করে এসো।"

জনৈক ভক্ত মাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমার কাছে দীক্ষিত?" ভক্ত বলিলেন, "হাঁ, মা। মা, আমি বড় সংসারী। নিজে বিবাহ করি নি, কিন্তু ভাইয়ের মেয়ের দ্বিরাগমন ইত্যাদি নিয়ে আছি। আমার কি হবে, মা?"

মা বলিলেন, "দেখি।" ইহা বলিয়া বক্ষ স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। ভক্তটি তাড়াতাড়ি কোটের বোতাম খুলিতেছেন। কিছুদূর হাত লইয়া মা বলিলেন, "থাক্, থাক্, আর খোলবার দরকার নেই। তোমার ত হবে। না হলে আমার হাত ওদিকে যেত না। আমার ত নিজের কোন জিনিস দিই নি—ঠাকুরের দেওয়া জিনিস। না হলে তাঁকে আসতে হবে। আমি ত, বাবা, ব্যবসা করতে বসি নি। দেখ না, কার্ত্তিককে (তার গুরু) ক্ষেপিয়ে দিলে। ভাল করতে পারলে না, মন্দ করলে।"

জনৈক ত্যাগী ভক্তের মাতা পুত্রের সংসারে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব শ্রীশ্রীমার নিকট করায় মা বলিলেন, "ত্যাগী ছেলে গর্ভে ধরা বড় সৌভাগ্যের কথা। লোকে একটা পেতলের বাটির মায়া ত্যাগ করতে পারে না, আর সংসারত্যাগ করা কি সোজা কথা! তুমি ওর মা,

তোমার ভাবনা কি ? সাধু হলেই বা, সে তোমাদের সেবা করবে।”

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে মা জনৈক ভক্তকে বলিতেছেন, “বাস্তবিকই তিনি ভগবান, জীবের দুঃখে দেহধারণ করে এসেছিলেন—রাজা যেমন ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে যান। একটু জানাজানি হলেই সরে পড়েন।”

শেষবার জয়রামবাটীতে রাঁধুনী ব্রাহ্মণী রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া বলিল, “কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান করে আসি।” মা বলিলেন, “এত রাত্রে স্নান করো না, হাত পা ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়।” রাঁধুনী বলিল, “তাতে কি হয় ?” মা বলিলেন, “তবে গঙ্গাজল নাও।” তাহাতেও তাহার মন উঠিল না। তারপর মা বলিলেন, “তবে আমাকে স্পর্শ কর।”

নবাসন হইতে জ্ঞানানন্দ মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার খাবার প্রস্তুত করিয়া জয়রামবাটী লইয়া যাইত। পথে এক গ্রামের কতকগুলি লোক সর্ব্বদা তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইত। একদিন তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, “আহা, কি মোহেই পড়েছে !” জ্ঞান যাইয়া মাকে এই কথা বলিলে মা উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন, “দেখ, বাবা, এরা হচ্ছে সংসারী জীব, নরকের কীট, এদের থাক আলাদা। এরা বারবার আসবে আর

যাবে, সংসারে পড়ে পচবে। যদি কোনকালে ভগবানের কৃপা হয় তবে মুক্ত হবে।”

জনৈক গৃহস্থ শিষ্য (রাজেন্দ্রলাল দে) মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মা, আমি কায়স্থ। ঠাকুরকে অন্নভোগ দিতে পারি কিনা?” মা বলিলেন, “বাবা, তুমি তাঁর সন্তান। অন্নভোগ দেবে, তাতে দোষ কি? স্বচ্ছন্দে দিতে পার।”

ঢাকার শ্রীযুক্ত পীতাম্বর নাথ জয়রামবাটীতে মার বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া মার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। মা ঘরের ভিতরে ছিলেন, বলিলেন, “বাবা, ঘরে এসে বসে বল।” ভক্তটি বলিলেন, “মা, এইখানেই (বারান্দায়) বসি, আমি হীন জাত?” মা তাহাতে বলিলেন, “কে বলেছে তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে, ঘরে এসে বস।”

একদিন ‘উদ্বোধনে’ মায়ের অপার করুণার প্রসঙ্গ হইতেছিল। যোগেন-মা হাসিতে হাসিতে মার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তা মা আমাদের যতই ভালবাসুন, তবু ঠাকুরের মত নয়। ছেলেদের জন্য তাঁর কি ব্যাকুলতা, কি ভালবাসা দেখেছি, তা বলবার নয়!” মা বলিলেন, “তা হবে না? তিনি নিয়েছেন সব বাছা বাছা ছেলে কটি—তা আবার এখানে মন্ত্র টিপে, ওখানে মন্ত্র টিপে।

আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে সব পিঁপড়ের সার!”

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গে মা একদিন বলিলেন, “ঠাকুর যে অমন ত্যাগী ছিলেন, তবু আমার জন্য ভাবনা ছিল। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, ‘তোমার ক’টাকা হলে হাতখরচ চলে?’ আমি বললাম, ‘এই পাঁচ-ছ টাকা হলেই চলে।’ তারপর জিজ্ঞাসা করছেন, ‘বিকেলে কখানা রুটি খাও?’ আমি ত লজ্জায় বাচি না—কি করে বলি! এদিকে বার বার জিজ্ঞাসা করছেন। তাই বলতে হল, ‘এই পাঁচ-ছ খানা খাই।’ ”

রাধু একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া মাকে বলিল, “তুই কি জানিস্! স্বামীর মর্ম্ম তুই কি বুঝিস্!” মা ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তাই ত গো! স্বামী ত ছিলেন ন্যাংটা সন্ন্যাসী।”

কেশবানন্দ কথাপ্রসঙ্গে মাকে একদিন বলেন, “মা, আপনাদের পরে ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাকে আর কেউ মানবে না।” মা বলিলেন, “মানবে না কেন? তারা ত আমারই অংশ।”

কেশবানন্দ আর একদিন মাকে বলেন, “মা, হয় দেশের লোকের মতিগতি ভাল করে দিন, নয় আমার কাজের ঝোঁক কেড়ে নিন। গড়তে কেউ নেই, আরও

ভাঙ্গতে চায়।” মা তাহাতে উত্তর দেন,. “বাবা, ঠাকুর বলতেন, ‘মলয়ের হাওয়া লাগলে যে-সব গাছের সার আছে তারা চন্দন হয়।’ মলয় বয়ে গেছে, এইবার সব চন্দন হবে। কেবল বাঁশ, কলা ছাড়া।”

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, ওঁরা (মায়ের আত্মীয়েরা) এত আপনার সঙ্গ করছেন, তবু একটুও জ্ঞান হয় না কেন?” মা বলিলেন, “সব বাঁশ, শিমূলগাছ—চন্দনের কাছে থাকলে কি হবে? সারবান বৃক্ষ হওয়া চাই।”

একটি ভক্ত মহিলা শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, আপনি যে ভগবতী তা আমরা বুঝতে পারি না কেন?” মা বলিলেন, “সকলেই কি আর চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘসে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে সেখানা এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা।”

একবার মা জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা রওয়ানা হইবেন, এমন সময় সূর্য্য মামার মা আসিয়া বলিলেন, “মা সারদা, আমাদের ভুলো না, আবার আসবে।” মা নিজের ঘরের ভিতরে ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।”

খুব অপ্রত্যাশিতভাবে কোন এক বিশিষ্ট বড় লোকের

বাড়ী হইতে এক ভক্ত যুবকের বিবাহের প্রস্তাব আসে। তাঁহারা অনেক টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। উহাতে যুবকের প্রায় সারা জীবনের অর্থের অভাব ঘুচিয়া যাইতে পারিত। যুবক তখন এম-এ পাশ করিয়া এক স্কুলের হেড-মাষ্টারি করে। তাহার মন ভোগাকাঙ্ক্ষাশূন্য ছিল না। তাই শ্রীশ্রীমার মত জানিবার জন্য জয়রামবাটীতে তাঁহার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করে (মে, ১৯১৫)। মা সব শুনিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি ত বেশ আছ। কেন সংসার-অনলে দগ্ধ হতে যাবে? তুমি ভাল কাজ করছ। অনেক ছেলে তোমার সাহায্যে পড়াশুনা করছে। তারা সব ভাল হবে, তোমারও কল্যাণ হবে।" যুবকটি বলিল, "মা, মন যে মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়, ভোগের দিকে যায়, তাই ভয় হয়।" মা তাহাতে বলিলেন, "তুমি কিছু ভয় করো না। আমি বলছি, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তোমার কোন ভয় নেই।" মায়ের এই অভয় বাণী শোনা অবধি ভক্তটি আর বিবাহের কথা ভাবে নাই, বা সাময়িক মনের উদ্বেগেও বিচলিত হয় নাই।

একদিন নিবেদিতা স্কুল বোর্ডিং-এর একটি বালিকা সকালে শ্রীশ্রীমার নিকট যায়। মা তখন জপ করিতে-ছিলেন। তিনি বোর্ডিং-এর মেয়েদের কথা, কালু নামে একটি ছেলের বিষয়, এবং যে রাস্তা দিয়া মেয়েটি গিয়াছিল,

তাহার আশেপাশে কি দেখিল না দেখিল ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু মেয়েটি সকল বিষয় যথাযথ উত্তর দিতে পারিল না দেখিয়া মা তাহাকে বলিলেন, "দেখ, মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দ্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে; আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না।"

একদিন বিকালে উক্ত বোর্ডিং-এর মেয়েরা মায়ের কাছে যাইলে গোলাপ-মা আসিয়া বলিলেন, "মা, এদের একটু ঠাকুরের কথা বল না।" তাহার উত্তরে মা বলিলেন, "আমি আর ঠাকুরের কথা কি বলব? কত কত কথা মাষ্টার মশায়ের লেখা 'কথামৃতে' বেরিয়ে গেছে। আহা! মাষ্টার মশায়ের দেহটি ভাল থাকলে আরও কত উপদেশ বেরুত এবং লোকের কত উপকার হত! এখনও যা বেরিয়েছে, সব অমূল্য ধন। আমি কি ছাই অত জানতাম যে ঠাকুরের খুঁটিনাটি কথাটি পরে বেদবাক্য হয়ে দাঁড়াবে! ঠাকুরের উপদেশের প্রণালীটি কেমন সুন্দর দেখ দেখি! হালদারপুকুর দেখে কত কি বলেছিলেন। এই রকম যেটি সামনে দেখতেন সেটিকেই লক্ষ্য করে কিছু বলা ছিল তাঁর স্বভাব।"

জনৈক ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ঠাকুর বলেছেন,

'এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম।' আবার স্বামিজী বলেছেন, 'সন্ন্যাস না হলে কারও মুক্তি নেই।' গৃহীদের তবে উপায়?" মা তদুত্তরে বলিলেন, "হাঁ, ঠাকুর যা বলেছেন তাও ঠিক, আবার স্বামিজী যা বলেছেন তাও ঠিক। গৃহীদের বহিঃ-সন্ন্যাসের দরকার নেই, তাদের অন্তঃ-সন্ন্যাস আপনা হতে হবে। তবে বহিঃ-সন্ন্যাস আবার কারও কারও দরকার। তোমাদের ভয় কি? তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে, আর সর্ব্বদা জানবে যে ঠাকুর তোমার পেছনে আছেন।"

১৯১০ সালে জয়রামবাটীতে সাধনভজন-প্রসঙ্গে মা জনৈক ত্যাগী ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "সকাল-সন্ধ্যায় বসবে। আর মাথা ঠাণ্ডা রেখে জপধ্যান করবে। এর চেয়ে মাটি-কোপান সোজা কাজ।" ঠাকুরের ছবির দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওঁর কৃপা না হলে কিছুই হবে না।" আশ্রমের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য নিয়মিত জপধ্যানে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এই কথা বলায় মা বলিলেন, "কাজ আর কার? কাজ ত তাঁরই।" প্রসঙ্গক্রমে আরও বলিলেন, "এর পর মনই গুরু হয়ে উপদেশ দেবে।"

মা একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।" তিনি আশ্রিত সন্তানগণকে বলিতেন, "তোমাদের ভাবনা কি?"

আমি মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া যেদিন প্রথম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই সেদিন আমার শরীর ছিল খুবই অসুস্থ। গাড়ী করিয়া বাগবাজার গিয়াছিলাম। যাওয়ার পথেই আমার অত্যন্ত মাথা ঘুরিতে লাগিল; মনে হইল যেন বমি আসিবে। কোনরূপে বাগবাজার মায়ের বাড়ীতে ঢুকিয়াই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে সিঁড়ির পাশে একটি লম্বা ঘরের দরজায় মাকে পাইলাম। স্নান করিতে চলিয়াছেন; যেন আমারই অপেক্ষায় দরজায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই একটু হাসিয়া বলিলেন, "কোথা থেকে এসেছ, বাছা? কেন এসেছ?"

বলিলাম, "মাকে দর্শন করতে এসেছি।" অমনি মা বলিলেন, "বাছা, আমিই মা। ঐদিকের ঘরে ঠাকুর আছেন, ঠাকুরকে প্রণাম করে ঐখানে বস, আমি নেয়ে আসি।"

এই বলিয়া মা চলিয়া গেলেন। আমি ঠাকুরঘরের দরজায় গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। ঠাকুরের

ভোগের জন্য কিছু মিষ্টি লইয়া গিয়াছিলাম, নলিনীদিদি আসিয়া একটু গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া আমার হাত হইতে উহা লইয়া রাখিয়া দিলেন। ইহারই মধ্যে মা খুব তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া চলিয়া আসিলেন। দেখিলাম, আমি যাওয়ার আগেই ঠাকুরের পূজা ও ফল-মিষ্টি-ভোগ হইয়া গিয়াছে। সব সাজানো রহিয়াছে। আমি ভাবিলাম, আমাকে যদি মিষ্টি-প্রসাদ খাইতে দেন তাহা হইলে আমার বমি আসিয়া পড়িবে, কারণ তখনও আমার মাথা ঘুরিতেছিল। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের জন্য কিছু এনেছ ?" আমি আমার আনীত মিষ্টি দেখাইয়া বলিলাম, "এনেছি, ঐখানে রেখেছেন।" মা ঠোঙ্গাসহ ঠাকুরের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, খাও।"

ইহার পর পিতলের একখানা ছোট থালায় কিছু ফল এবং একটু সরবৎ-প্রসাদ আমাকে খাইতে দিলেন। বলিলেন, "প্রসাদ খাও, বমি হবে না।" কমণ্ডলু হইতে একটু গঙ্গাজল আমার মাথায় দিলেন এবং কহিলেন, "আমি ঐদিকের ঘরে বসবো, তুমি খেয়ে সেখানে যেও।" আশ্চর্যের বিষয়, প্রসাদ খাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আমি সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। তাহার পর মা যে ঘরে বসিয়াছেন সে ঘরে গেলাম। দেখিলাম, মা আমার রাজরাণীর মতো বিশ্বজননীরূপে আসনে উপবিষ্টা ; গোলাপ-মা, গৌরী-মা,

যোগীন-মা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। দেখিয়া আমার মাকে খুব আপন বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু অপর যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া কি রকম সঙ্কোচ হইতে লাগিল! আমার প্রাণের আবেদন মাকে জানাইতে পারিব কি-না ভাবিতে লাগিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "আট বৎসর যাবৎ প্রাণপণ চেষ্টা করেও আপনার দর্শন পাই নি, কলকাতা পর্যন্ত এসেও দর্শন না পেয়ে ঘুরে গিয়েছি।" এই বলিতেই গৌরী-মা বলিলেন, "সময় না হলে কি মায়ের দর্শন পাওয়া যায়?" আমি বলিলাম, "এখন বোধ হয় সময় হয়েছে, মা; এখন আপনাকে পেয়েছি। আমাকে গ্রহণ করুন। আমি আপনার কাছে দীক্ষা নেওয়ার সঙ্কল্প করে এসেছি। শুনেছি সময় না হলে দীক্ষাও হয় না। আবার কাউকে কাউকে নাকি আপনি এখানকার লোক নয় বলে বিদায়ও দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমার বেলায় তা হলে আমি আর বাঁচব না।"

মা আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "না, তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুমি একাদশীতে কি খাও?"

বলিলাম, "আগে সাগুই খেতাম, এতে নানারকম ভেজালের কথা জেনে এখন আর খাই না।"

শুনিয়াই মা বলিলেন, "না না, আমি বলছি তুমি

সাগু খেও, এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে।" তাহার পর অতি দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন, "বাছা, অনেক কঠোর করেছ। আমি বলছি, আর কোরো না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলছ। দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে, মা?"

তেল মাখি কি-না মা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, "আমি বিধবা হয়ে আর তেল মাখি নি।" শুনিয়া মা বলিলেন, "তেল মাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, তেলটি মেখো।" আমি বলিলাম, "বহু দিনের অনভ্যাসে তেল যেন ছুঁতেই ঘৃণাবোধ করি, তেল মাখতে পারব না, মা।" গোলাপ-মা বলিলেন, "নিতান্তই ছেলেমানুষ, কঠোর করে করে না খেয়ে দেহটাকে শেষ করে ফেলেছে।" গৌরী-মা বলিলেন, "তুমি মাথার চুল কেটে ফেলে দিয়েছ কেন, বাছা?" বলিলাম, "আমাদের দেশের বিধবাদের চুল রাখে না।" তিনি বলিলেন, "চুল না থাকলে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, চুলটি বুঝি শুধু তোমার?" তখন যোগীন-মা বলিলেন, "এই দেহটি ভগবানের মন্দির। একে সুন্দর করে রাখাই ভাল।" মা বলিলেন, "বেশ তো করেছে, চুল থাকলে একটু বিলাসিতার ভাব আসে; চুলের যত্ন করতে হয়। যাই হোক মা, কেশের সেতু পার হয়ে তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ। যার জন্যে এত

কঠোরতা, তোমার সে কাজ হয়ে গেছে। এখন আমি বলছি, আর কঠোরতা কোরো না। কালকে তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে। কালকে আটটার সময় এখানে এসে পৌঁছুবে। দীক্ষা নেওয়ার দিন একটু গঙ্গাস্নান ও মা-কালীকে দর্শন করলে ভাল হয়।”

মনে মনে ভাবিলাম, তোমাকে দর্শন করিয়াই আমার কালীদর্শন হইয়া গিয়াছে, তোমার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছি। তৎপর মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

আমার দেবর ৺সতীশচন্দ্র রায় মায়ের আশ্রিত ছিল। তাহাকে লইয়াই মায়ের কাছে গিয়াছিলাম। আমার বাসস্থানে ফিরিয়া পরদিন পুনরায় আমাকে মায়ের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে বলিয়া দিলাম। (সে অন্যস্থানে থাকিত)। বাগবাজার হইতে বাসায় আসিবার পর হইতে আবার আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। যাহা হউক পরদিন আমি মায়ের নিকট যাইবার জন্য তৈরী হইলাম, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে সতীশ আমাকে লইতে আসিল না। অত্যন্ত হতাশ হইয়া বসিয়া আছি, বেলা বারটায় সতীশ আসিয়া আমাকে বলিল, “কাল রাত্রিতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাহাকে খবর দিয়াছেন, ‘কাল বৌমার দীক্ষা হবে না, বৌমার শরীর অসুস্থ ; পরশু দিন বেলা

দশটার পূর্ব্বে বৌমাকে নিয়ে তুমি এসো।' " সেইজন্যই সে দেরী করিয়া আসিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য দূরদৃষ্টির কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। পরদিন সকালে আমিও বেশ সুস্থ আছি। সতীশ ঠিক সময়ে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিল। মায়ের আদেশ-অনুসারে কিছু ফল-মিষ্টি, ফুল-বেলপাতা এবং একখানা সরু লালপেড়ে কাপড় লইয়া বাগবাজারে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মাকে এক অপূর্ব মূর্তিতে দেখিলাম। হলদে রং-এর একখানা কাপড় পরিয়া মা যেন আমার ইষ্টরূপে দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "পাঁচ মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছে, শীগ্‌গির এসো ঠাকুরঘরে।" ঠাকুরের সামনে তিনি নিজেই একখানা আসন পাতিয়া উহা হাত দিয়া ঘসিয়া মাজিয়া দিলেন। ভাবিলাম, এই আসনে কি করিয়া বসিব। সঙ্গেসঙ্গে মা তাঁহার দক্ষিণ-পা দ্বারা আসনখানা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "হয়েছে তো? বাবা! মেয়েটি কম নয়!" আমি যাওয়ার সময় গাড়োয়ানকে দেওয়ার জন্যে দুটি টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সে সময় আমার সে টাকার কথা মনেও নাই। আমি আসনে বসিতে যাইব তখন মা বলিলেন, "বাছা, তুমি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ঠাকুরের আশ্রিত হতে এসেছ, তোমার আঁচলে দুটো টাকা বাঁধা

রয়েছে। ওটা খুলে রেখে এসো।” অমনি টাকা দুটি খুলিয়া দেয়ালের কাছে রাখিয়া দিলাম এবং আসনে বসিলাম। ... আমি সেদিন মাকে যাহা দেখিয়াছিলাম, ভাবিলাম সেই মা তো এই মা নন। ভাবিয়াই আমি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলাম। সঙ্গেসঙ্গেই মা আমাকে হাত ধরিয়া আসনে বসাইলেন এবং আমার মাথায় হাত দিয়া অতি মধুর কণ্ঠে ‘মাভৈঃ’ এই আশ্বাসবাণী তিন বার উচ্চারণ করিলেন এবং বলিলেন, “ভয় নেই, এই তোমার জন্মান্তর হয়ে গেলো। জন্মান্তরে যত কিছু করেছিলে, সব আমি নিয়ে নিলুম। এখন তুমি পবিত্র, কোন পাপ নেই।” সঙ্গেসঙ্গে আমারও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল ; মা আমাকে দীক্ষাদান করিলেন। ... আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “জপ-বিসর্জনের কি মন্ত্র আছে ?” মা বলিলেন, “বিসর্জন বলতে নেই, সমর্পণ বলতে হয়।” একটু মিষ্টিপ্রসাদ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, “দীক্ষা নিয়ে গুরুর কাছে বেশী সময় থাকতে নেই। আজকে চলে যাও, কালকে এসে এখানে প্রসাদ পাবে।” আমি মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং পরদিন দুপুর-বেলা গিয়া প্রসাদ পাইলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়াছি। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লেখাপড়া জান তো ? সর্বদাই গীতাখানা একটু একটু

পাঠ করবে, ঠাকুরের 'কথামৃত' আর 'রামকৃষ্ণ-পুঁথি' খানা পড়ো। আরও ঠাকুরের কত বই বের হয়েছে, ঐসব পড়বে।"

আমি বলিলাম, "মা, সংসারে আমার মন মোটেই বসে না, আমি কত কষ্টে যে সংসারীর মধ্যে বাস করি তা তুমি অবশ্যই জান। আমার এই প্রার্থনা, আমাকে সংসারীর মধ্যে রেখো না।" মা বলিলেন, "তোমাদের আবার সংসার কি, মা? তোমাদের সংসারও যা, গাছতলাও তা। সংসার কি তিনি ছাড়া? তিনি সবখানেই আছেন। বিশেষ, মেয়েমানুষ কোথায় যাবে, মা? তিনি যেখানে যেভাবে রাখেন সেখানেই সন্তুষ্ট থেকো। উদ্দেশ্য তাঁকে ডাকা ও পাওয়া। তাঁকে ডাকলে তিনি তোমার হাত ধরে চালিয়ে নেবেন, তাঁতে নির্ভর করতে পারলে আর তোমার কোন ভয় নেই। আর একটি কথা—গুরু-শিষ্যে একত্র বসবাস করা ভাল নয়; কারণ, একত্র থাকলে গুরুর কার্যকলাপ দেখে অনেক সময়ই গুরুকে মানুষ বলে মনে হয় এবং তাতে শিষ্যের ক্ষতি হয়। নিকটে অন্য কোথাও থেকে যদি রোজই কিছু সময় গুরুদর্শন, তাঁর সঙ্গ, উপদেশ পাওয়া যায় তবেই খুব ভাল; কিন্তু সর্ব্বদাই একটু দেখা-সাক্ষাৎ না থাকলে গুরুরও শিষ্যের কথা সব সময় স্মরণে আসে না। রোজই এখানে এসো।"

আমার অবশিষ্ট জীবনের অবস্থাটি যে কি আসিবে ইহা মায়ের কথায় বেশ বুঝিলাম। আমার জন্য যে বন নয়, সংসার রহিয়াছে ইহা ভাবিয়া খুব কাঁদিলাম। আমার কান্না দেখিয়া মা খুব ব্যস্ত হইয়া আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমিও তো মা সংসারেই চিরদিন কাটালাম ; তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, ধর্মের জন্যে হেথা সেথা যাওয়া আরও বিপদ। আমি বলছি, যেখানে যে অবস্থায় যে ভাবে থাক, বাইরের আবিলতা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। ঠাকুর আছেন, তোমার কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই।"

ইহার পরেই আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। সেইদিন হইতে প্রায় প্রত্যহই সাধারণতঃ বিকালের দিকে মায়ের কাছে যাইতাম এবং সন্ধ্যার পূর্বে চলিয়া আসিতাম। সাধনভজন যতটুকু দরকার বলিয়া দিয়াছিলেন এবং মনে কোন খটকা বা প্রশ্ন জাগিলে তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া লইতেও বলিয়াছিলেন, কিন্তু মাকে দেখিয়াই একেবারে ভরপুর হইয়া যাইতাম। মনে হইত সবই হইয়াছে, সবই পাইয়াছি, আর কিছু পাওয়ার বাকী নাই। মা আমার বিশ্বজননী, রাজরাজেশ্বরী ইষ্টদেবী ; গুরুরূপে আমার সামনে দণ্ডায়মানা। আমার পাইবার আর কি থাকিতে পারে ? ইহা ভাবিয়া অফুরন্ত

আনন্দ হইত। আমি মাকে মোটেই প্রশ্ন করিতাম না। মা নিজ হইতে যাহা বলিতেন তাহা শুনিয়াই পরিতৃপ্ত। একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "মা, তুমি অন্তর্যামিনী, তুমি সবই জান ; তথাপি জোরের সহিত বলছি, আমি সংসারীর যে সংসার তা অত্যন্ত ঘৃণা করি এবং ভয় করি। আমার সংসার বাড়ীঘর টাকাপয়সা কিছুই নেই। আমি এসব জিনিস তোমার কাছে জীবনে একদিনও চাইব না। আমার প্রাণ যা চায় সেটা তুমি জান, সেটা আমাকে দিও এবং সংসারীর কাছ থেকে আমাকে দূরে রেখো।" এই বলিয়া অনেক কাঁদিলাম। এসব কথার উত্তর খুব ছোট কথায় নিতান্ত ছেলেমানুষকে মা যেমন সান্ত্বনা দেন, মাতাঠাকুরাণী আমাকে সেইভাবে প্রবোধ দিলেন। আমিও মনের ব্যথা ভুলিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলাম। মা সময়ে সময়ে বলিতেন, "তোমাদের ঠাকুর বলতেন, 'মায়া-সমুদ্রে ঝাঁপ দিও নি, হাঙ্গর-কুমীর খেয়ে ফেলবে।' তবে তোমাদের ভয় কি ? তোমাদের ঠাকুর আছেন।"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত পর্দানশিন ছিলেন। আমাদিগকেও তিনি সেই ভাবে রাখিয়াছেন। আমরা মেয়েভক্তই দেখিয়াছি, মঠের কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে বড় বেশী দেখি নাই। আমরা শুধু মাকে দেখিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখা হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়া নিয়াছি। এখন

ভাবি, এই রকম মন ছিল বলিয়াই তিনি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মা শুধু বলিতেন, সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে তাঁর নাম কর।

একদিন সুধীরা দিদি নিবেদিতা ইস্কুলের কয়েকটি মেয়েকে লইয়া মায়ের ওখানে আসিয়াছেন। একটি মেয়ে মাকে বলিল, "মা, ক্ষীরোদ দিদিকে আমাদের ওখানে থাকতে দেন না কেন? সে মেয়েও পড়াবে, সেখানে থাকতেও পারবে।"

আমি কিন্তু ভুলিয়াও তাহাদের কাছে আমার থাকা-খাওয়ার কথা আলোচনা করি নাই। তাই একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই ভাবিলাম, কেন এসব বলে? মা বলিলেন, "সকলেই সংসারে এক কাজের জন্যে আসে না। তোমরা পড়বে ও মেয়েদের পড়াবে, এই তোমাদের কাজ। ক্ষীরোদ এসব করতে আসে নি। পড়াশুনা ভাল কাজ বটে, কিন্তু সকলের জন্যে নয়।" মেয়েরা চলিয়া যাইবার পর বলিলেন, "মেয়েপড়ানো কি কম কথা?"

আমি মাঝে একবার দেশে আসিয়া পুনরায় কলিকাতা ফিরিবার সময় রাধারাণীর জন্য একজোড়া শাঁখা লইয়া গিয়াছিলাম। তাহাকে শাঁখা পরাইতে গিয়া দেখি উহা মাপে খুবই ছোট হইয়া গিয়াছে, তাহার হাতে মোটেই যায় না। উহাতে রাধু একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

আমারও চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভাবিলাম, এত সাধ করিয়া লইয়া আসিলাম, রাধু হাতে দিতে পারিল না। নলিনী দিদি, সরলাদি, রাধু ও আমি চুপি চুপি এই কথাই আলোচনা করিতেছি, এমন সময় মা ঠাকুরঘর হইতে রাধুকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে এখানে এসো।" আমরা যাওয়ার পর বলিলেন, "কি হয়েছে?" রাধু তখন কাঁদিয়া বলিল, "দিদিমণি আমার জন্য এমন সুন্দর শাঁখা নিয়ে এসেচেন, সেই শাঁখা আমার হাতে উঠচে না—ছোট হয়েছে।" অমনি মা বলিলেন, "তোদের যা কথা! বৌমা শাঁখা এনেছে, সে শাঁখাও লাগবে না? শাঁখা নিয়ে আমার কাছেই আগে আসতে হয়। আয় তো দেখি, কেমন শাঁখা লাগে না।" এই বলিয়া পাঁচ মিনিটেই মা রাধুর হাতে ঐ শাঁখা পরাইয়া দিলেন। আমরা সকলে আশ্চর্য হইয়া গেলাম; রাধু চোখে জল নিয়াই হাসিয়া ফেলিল। মা বলিলেন, "সুন্দর শাঁখা পরেছ, ঠাকুরকে প্রণাম কর, আমাকে প্রণাম কর ও বৌমাকে প্রণাম কর।" তিনি ঐ কথা বলিতেই আমার বুক দুর্‌দুর্ করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, আমার বাড়ীঘর কোথায়, আমি কোন্ জাতের মেয়ে এবং আমার কে কে আছেন সে-সব কথা মা একদিনও জিজ্ঞাসা করেন নাই। মাকে বলিলাম, "মা, আমি যে কায়েতের মেয়ে,

আমাকে রাধু কেন প্রণাম করবে ?” মা জিভে কামড় দিয়া বলিলেন, “ওসব বলতে নেই, তুমি কায়েত কি ব্রাহ্মণ আমি জানি না ? তুমি এতদিন ধরে এখানে আছ, এখনও তুমি কায়েতই রইলে ?” এই কথা বলিয়া রাধুকে বলিলেন, “যা, তোর দিদিমণিকে প্রণাম কর।” অমনি রাধু ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমিও রাধুকে প্রণাম করিলাম। মা খুব হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, “প্রণামটা ফিরিয়ে দিলে ?” আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

একদিন রাধু, নলিনীদিদি প্রভৃতি সকলে আমাকে ব্যস্ত হইয়া ধরিয়াছে—আমার বাড়ী কোথায়, আমি কোন্ জাতের মেয়ে, আমার কে কে আছে এই সব বলিতে হইবে। কিন্তু আমি কিছুই বলিতে রাজী নহি। সেইদিনও মা ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা বৌমাকে কি নিয়ে এত জ্বালাতন করছো ? আমার এখানে এসো, আমি সব কথা বলে দেব।” সকলে ছুটিয়া আসিল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। ভাবিলাম, মা ওসব কথা একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই ; আজ কি বলেন আমি শুনিব। ওরা সকলে বলিতে লাগিল, ক্ষীরোদ দিদি এতদিন এখানে আছে, কিন্তু তার বাড়ী কোথায়, সে কোন্ জাতের মেয়ে, তার কে কে আছে ওসব কিছুই আমাদের বলে না। আজকে

আমরা এত করে বল্‌ছি, তবুও বলছে না। মা বলিলেন, "আমি সব বলে দিতে পারব, তার জন্মস্থান কমলানেবুর দেশে, শ্বশুরবাড়ী অন্য জেলায়, সে চন্দ্রকান্তের অতি নিকটের লোক ; তার কেউ নেই, মাও নেই, ভাই আছে।" এই বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক হয়েছে তো, বৌমা ?" মায়ের কথার সঙ্গেসঙ্গেই আমার জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস আসিয়া পড়িল। অন্তর্যামিনী বুঝিলেন, আমার মায়ের কথা বলিতেই আমি দুঃখের সহিত শ্বাস ফেলিয়াছি। অমনি বলিলেন, "আহা! তোমার মায়ের কথা বলতেই তোমার দুঃখ হয়েছে, না বৌমা ? তোমার গর্ভধারিণী যদি বেঁচেও থাকতেন, তবু কি কর্‌তে পারতেন ? শুধু চেয়ে চেয়ে তোমার দুঃখই দেখতেন। আমার মত মা পেয়েও কি তোমার মায়ের দুঃখ রইল ?..." একথা শুনিয়া আমি আনন্দে কাঁদিতে লাগিলাম। নলিনী দিদি প্রভৃতিকে বলিলেন, "আর কি জানতে চাও ?" তাহারা বলিল, "ও কোন্ জাতের মেয়ে ?" মা বলিলেন, "ওসব আমি বলব না—ওরা ভক্ত, এক জাত।" আমি মায়ের কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া গেলাম, মুখে কিছু বলিতে পারিলাম না।

কালীপূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। সেদিন মায়ের বাড়ীতে অত্যন্ত ভিড়। যাওয়ার পথে আট আনা দিয়া পাঁচটি চাঁপাফুল কিনিয়া

লইয়া গিয়াছিলাম। অতি কষ্টে সেই ফুল কয়টি মায়ের পাদপদ্মে দিলাম। মা বলিলেন, "আজকে বড় ভিড়। এখানে থেকে কোন কাজ নেই। তুমি সুধীরার সঙ্গে দেখা করে গৌরদাসীর ওখানে যাও, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাসায় ফিরে যেয়ো।" এই কথা শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। মায়ের এরূপ আদেশ তো কখনও পাই নাই। বলিলাম, "গাড়ী করে যাব, না পায়ে হেঁটে যাব? সঙ্গে কেউ যাবে কি, না আমি একাই যাব?" মা বলিলেন, "পায়ে হেঁটে যাবে, একাই যাবে। চিরদিনই কি তুমি ছেলেমানুষ থাকবে? যাও—এসো গে।"

অমনি মায়ের নাম লইয়া, কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া খুব সহজেই সুধীরাদির ইস্কুল-বাড়ীতে পৌঁছিলাম। সুধীরাদি আমাকে দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রিবেলা তুমি কি করে এলে আবার? কেন এসেছ?" বলিলাম, "জানি না কেন এসেছি; মা এখানে আসতে বল্লেন তাই এলাম।" ইহা শুনিয়া সুধীরাদি তাঁহার ইস্কুলের মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা পড়াশুনা বন্ধ করে এখানে এসো। ক্ষীরোদ দিদি মার কাছ থেকে এসেছে, তাকে এসে দেখো।"

সব মেয়েরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। 'মায়ের আদেশে এক্ষুণি আমাকে সারদেশ্বরী আশ্রমে যেতে হবে' বলিয়া আমি রওনা হইতে চাহিলাম। সুধীরাদি বলিলেন, "একাই যাবে?" আমি বলিলাম, "একা যাওয়ারই আদেশ।"

রওনা হইয়াছি। আমার সঙ্গেসঙ্গে ঐ বোর্ডিং-এর বাহিরের ঘর হইতে এক ভদ্রলোক আমার পিছনে পিছনে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নাই, অথচ তিনি আমার সঙ্গে চলিয়াছেন দেখিয়া আমার বুকটা হুরহুর্ করিতে লাগিল। গৌরী-মার যেরূপ কড়াপ্রকৃতি তাহাতে এই লোককে আমার সঙ্গে দেখিয়া হয়তো আমাকে বকুনি দিবেন। আমি ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলি নাই। সারদেশ্বরী আশ্রমের দরজায় উপস্থিত হইয়া দরওয়ানকে বলিলাম, "মা-জীকে ডাক। বল, বাগবাজার মায়ের ওখান থেকে একজন মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

একটু পরেই গৌরী-মা একহাতে ঘৃতের প্রদীপ ও একহাতে ধুনচিতে ধূপ জ্বালাইয়া নীচে নামিলেন। আমি প্রণাম করিতে গেলে বলিলেন, "আজকে কি আমি তোর প্রণাম নিতে পারি?" কিছুতেই প্রণাম নিলেন না। গৌরী-মা অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মুখের কাছে আরতির

মত করিতে লাগিলেন।, আমি অবাক হইয়া গেলাম। ইহা করার পরই পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন। তৎক্ষণাৎ গৌরীমার চেহারা বদলাইয়া গেল। ঐ ভদ্রলোককে বলিলেন, "কোত্থেকে এসেছ? তোমার বাড়ী কোথায়? এখানে কেন এসেছ?" তিনি বলিলেন (আমাকে দেখাইয়া), "উনি সুধীরা বসুর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট এখানে আসবেন বলে বললেন; ভাবলাম আমি তো আপনাকে দেখি নি, ওঁর সঙ্গে এলে আপনাকে দেখতে পাব, তাই এসেছি।"

গৌরীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি নাম?" তিনি নাম বলাতে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। তাঁহার নাম শুনিয়াছি বটে। গৌরীমা বলিলেন, "চিনেছি; তোমার বাড়ী সিলেটে। তা গৌরীমা তো পর্দানশীন নন যে তাঁকে দেখতে হলে এখানে আসতে হবে। সাধু দেখতে হলে বেলুড়ে যেয়ো; মেয়েমানুষ সাধু কি দেখবে?"

ঐ ভদ্রলোক বলিলেন, "রবিবারে এলে বোধ হয় আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারব?"

গৌরীমা বলিলেন, "না, না, এখানে আমার মেয়েরা সব রয়েছে, এখানে দেখা হবে না।"

এই বলিতেই ভদ্রলোকটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন গৌরীমা আমার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন,

"শ্রীশ্রীমাকে তুমি কি মনে কর? মা যে শুধুই কৈলাসেশ্বরী। তাঁকে মানুষ ভাবা চলে না। মা জগদ্‌গুরু, বিশ্বজননী, তাঁকে গুরুত্বে বরণ করেছ। আর ভাবনা কি আছে?" তাহার পর প্রায় দুই ঘণ্টা কাল মায়ের এবং ঠাকুরের কথা বলিতে লাগিলেন। আমি দরজায় যেভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। গৌরীমাও দাঁড়াইয়াই কথা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ গৌরীমা আমাকে ধরিয়া বলিলেন, "চল, মাকে পূজা করতে যাব।" আমি বলিলাম, "বাগবাজারে পুনরায় যাওয়ার আদেশ আমার নেই। বিশেষ রাত হয়ে গেছে; পরে আমি কি করে যাব?" গৌরীমা বলিলেন, "চল, আমি মাকে বলব।" আমি গৌরীমার সঙ্গে চলিলাম। ছোট দুইটি মেয়েকেও তিনি সাথে লইলেন। একটির হাতে ফুল-বেলপাতা ও অপরটির হাতে ফল-মিষ্টি। গৌরীমার হাতে একটি কমণ্ডলু ছিল। দুই পাশের লোক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মায়ের বাড়ীর দরজায় যাইয়াই শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "এই গৌরদাসী এসেছে রাস্তা গুলজার করে।" সেখানে যাইয়া বুঝিলাম গৌরীমার পূজাই মায়ের আজিকার শেষ পূজা। আর সকলেই পূজা করিয়া ফেলিয়াছেন। গৌরীমা ৺কালীপূজার মতই অনেক সময়ব্যাপী পূজা করিলেন। সেই পূজা একটি দেখিবার জিনিস বটে। পরে সকলেই প্রসাদ পাইলেন। গৌরীমা

বলিলেন, "ক্ষীরোদকে আবার এখানে নিয়ে এলাম। সে বলেছিল, তোমার আদেশ নেই। আমি বললুম, মাকে বলব।"

মা বলিলেন, "বেশ করেছ।"

সেদিন মায়ের বাড়ীতেই থাকা গেল। সে রাত্রিটা যে কি আনন্দে কাটিয়াছিল, তাহা জীবনে ভুলিব না।

আমার বিধবা হওয়ার একবৎসর পূর্ব্বেই একদিন আমি অনেকগুলি পেঁপে কাটিয়া তরকারী রান্না করিয়াছিলাম। সেই পেঁপের কষ হাতে লাগিয়া হাত চুল্‌কাইয়া ভীষণ ভাবে আঙ্গুলগুলি ফুলিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফাটিয়া গেল এবং এমন ভীষণভাবে হাতে ঘা হইল যে, বহু চিকিৎসাতেও আর ভাল হইল না। সেই ঘা ১২ বৎসর থাকে। চামচদ্বারা ভাত খাইতে হইত। সময় সময় একটু কম থাকিত। যখন বেশী হইত, তখন হাতে জল ঢালিলে মাংস পর্যন্ত পচিয়া উঠিত। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আজ এক বৎসর যাবৎ আছি, কিন্তু একদিনও মাকে হাত-খানা দেখাই নাই। আমার অনিত্য দেহের কথা মাকে বলিব না এবং এই উৎকট ব্যাধি মা দেখিলে যদি তাঁহার দেহের কোন ক্ষতি হয় সেজন্য তাঁহার নিকট অতি গোপনে রাখিয়াছি। বেশী বাড়িলে মার ওখানে যাইতাম না। একদিন বেশী ঘা নিয়াই চলিয়া গেলাম। সেখানে যাইয়া

মাকে প্রণাম করিলাম না, পাছে প্রণাম করিলে পায়ের ধূলা লইবার সময় মা ধরিয়া ফেলেন। এই চিন্তায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় দেখি একটি বিধবা মেয়ে মাকে প্রণাম করিয়া হাতে কাপড় জড়াইয়া পায়ের ধূলা লইলেন। ইহা দেখিয়া মনে খুব আনন্দ হইল। আমিও মাকে প্রণাম করিয়া হাতে কাপড় জড়াইয়া পায়ের ধূলা লইলাম। প্রণামের সঙ্গেসঙ্গে মা অতি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "বৌমা, হাতে কাপড় জড়িয়ে ধুলা নিলে কেন? তোমার হাতে কি কোন অসুখ আছে?"

তখন মহা বিপদে পড়িলাম, বুক কাঁপিতে লাগিল। ভাবিলাম, ঐ মেয়েটিকে ত বলিতে পারিতেন। তাহাকে না বলিয়া আমাকে বলিলেন, "এই ভাবে কেন ধূলা নিলে?" বলিলাম, "হাতে অসুখ আছে।" আবার বলিলেন, "দেখি।" হাত দেখিয়া এমনভাবেই দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। বলিলেন, "আহা! বাছা, তুমি এতদিন এখানে আছ, আর তোমার হাতে এরূপ ব্যাধি! আমি তোমাদের মা, আমি জানি না। বাছা, আমার এত কষ্ট হচ্ছে!" কতদিন ধরে এই রোগ হয়েছে এবং কি করে হল, জিজ্ঞাসা করায় আমি সব কথা বলিলাম। মা বলিলেন, "বাছা, আমি এখন এমনই হয়েছি, আমাতেই আমি ডুবে থাকি। তোমাদের

দিকে বড় তাকাই না। এই হাত দিয়ে ঠাকুরপূজো কর, এতেই রোগ ধরে রয়েছে। যাক্, আমার সঙ্গে এস। ঠাকুরপূজোর নির্মাল্য ও চরণামৃত গঙ্গায় ফেলবার জন্য এখনই নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি এস।" মায়ের সঙ্গে অন্য ঘরে গেলাম। মা বলিলেন, "ঐ দেখ কমণ্ডলুতে ঐ সব রয়েছে ; সবটা হাত এতে ডুবিয়ে দাও।" তাহাই করিলাম। বলিলেন, "আর হাতে অসুখ থাকবে না। তবে মাছ-মাংস, রসুন-পেঁয়াজে হাত না দিয়ে যতদূর পার থেকো। ওসব একেবারে না ধরেও ত পারবে না। এসব ঘাঁটাঘাঁটি করলেই একটু ফুটতে পারে। ঠাকুরপূজো ত রোজই করবে। একটু ফুটলেই ঠাকুরের চরণামৃত দিও। তবেই সেরে যাবে। যেদিন পেঁপে কেটেছিলে সেদিন কি ক্ষেওরী করেছিলে ?" বলিলাম, "মনে নেই।" মা বলিলেন, "ক্ষেওরীও করেছিলে এবং পেঁপের কষও লেগেছে। দুটোতে মিলেই ঐ সব হয়েছে।" বিকালবেলা অন্যান্য মেয়েদের কাছে বলিলেন, "ওগো, তোমাদের সকলকেই বলছি তোমাদের স্বামী, পুত্র এবং তোমরা নিজেরাও নাপিতের নরুন দিয়ে নখ কেটো না। এতে অনেক খারাপ রোগ হতে পারে। এইতো বৌমার হাতে এরূপ হয়েছে। অবশ্য ঠাকুরের ইচ্ছায় এ থাকবে না।"

সেদিন একসঙ্গে বসে খাওয়া, এক বিছানায় দুজন

শোয়া, একজনের কাপড়-গামছা অপরের ব্যবহার করার কত দোষ, কি ভাবে একজনের দেহের ভাল বা মন্দ অন্যের দেহে যায় এইসব বলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার জীবন-যাপন কি ভাবে হইতেছে, যেখানে থাকি সেখানে বাধ্য হইয়া আমাকে মাছমাংসও রান্না করিতে হয়—আমি এই সব কথা মাকে কখনও বলি নাই। কিন্তু মা বলিলেন, "ও সব না করে পারবে না, করলেই হাত ফুটবে, ঠাকুরের চরণামৃত দিলেই সেরে যাবে।" আশ্চর্য্যের বিষয়, যেদিন চরণামৃতে হাত ডুবাইলাম, তাহার পরদিন হইতে জীবনের জন্য ভাল হইয়া গেলাম, কিন্তু মাছমাংস প্রভৃতিতে হাত দিলেই হাতে গুটিগুটি বাহির হইত এবং ঠাকুরের চরণামৃত দিলেই ঘণ্টা খানেক পরেই দেখিতাম যে কিছুই নাই। আমি কিন্তু ঐ ব্যাধি সারিবার পরই মাকে বলিয়াছি, "মা, দেহের ব্যাধি সারবার জন্য তোমার কাছে আসি নি। তুমি এই পর্য্যন্ত দিয়েই আমাকে বিদায় করতে পারবে না।" মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের দেহ যে, মা, আমার দেহ। তোমাদের দেহ ভাল না থাকলে আমি যে, মা, কষ্ট পাই।" দৈহিক বা আর্থিক কিংবা অন্য কোন বিষয় মুখে কেন, মনে মনেও চাহিব না—ইহা আমার সংকল্প। আমার ভয়, কি জানি মা ঐ সব দিয়াই বিদায় দেন। ভজনে কিছু

হইতেছে কি-না বুঝিতেছি না বলিলে বলিতেন, “আমি গুরু, হয় কি না হয় আমি জানি ; তুমি কি করে বুঝবে ? সব হবে, সব হবে—ভজনের অন্তরায় বাইরে বেশী থাকে না, ভিতরেই থাকে। ওসব ঠাকুরের নাম করতে করতে এবং ধ্যান-ধারণা করলে একটা একটা করে পড়ে যাবে। কাজ করে যাও, রইল কি গেল, সে দিকে তাকিও না।” বলিতেন, “নারকেলগাছের বাল্‌তো যেমন সময় হলে আপনা হতেই পড়ে যায়, সময় না হলে সেটা ফেলতে অনেক জোর দিতে হয়, সেই রকম। সময় হলে সব যাবে।” তাঁর জপে ও ধ্যানে ডুবিয়া থাকার অবস্থা কেন আসে না জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “সবই ত করছ, সবই হচ্ছে। যে বয়সে বিধবা হয়ে যেভাবে এখানে এসে পৌঁছেছ, মা, তাই যথেষ্ট। তোমার বেশী কিছু করতে হবে না, দিনান্তে ঠাকুরকে দুটো প্রণাম দিলেই হবে। মানুষের একটি জিনিস যদি ঠিক থাকে, তবে আর কিছুই লাগে না। আপনা আপনি সব তোমার হয়ে যাবে।”

দশ বৎসরে আমার বিবাহ হয়, ১৫ বৎসরে বিধবা হইয়াছিলাম। মায়ের পাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, “মা, আমাকে তোমার পাদপদ্মে দিলাম, তুমি আমাকে রক্ষা করো।” মা বলিয়াছিলেন, “কোন ভয় নেই। ঠাকুর তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন।”

তাঁহার শ্রীমুখ দিয়া যাহা বাহির হইয়াছে তাহার একটি কথাও অযথা হয় নাই। এখন আমার বয়স ৬০-এর কাছাকাছি, মায়ের পদ্মহস্ত আমার মাথায় পড়িয়াছে, আমার হাত মাথা মায়ের পায়ে ঠেকাইয়াছি, আমি ধন্য হইয়া গিয়াছি। মায়ের শ্রীমুখের বাক্য 'কোন ভয় নেই, ঠাকুর হাত ধরে নিয়ে যাবেন'—ইহাতেই এত দীর্ঘ জীবন-যাপন করিলাম, একদিনও ভোগ-বাসনা বুঝিলাম না। শুধুই আনন্দ, শুধুই আনন্দ! দীক্ষার দিন ছাড়া আর একদিনও তিনি আমাকে বলেন নাই আমি কি করিব; বলিতেন সবই ঠাকুর করিবেন। আমাদের বুঝিতে ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার বাক্য সত্য। সব সময় তাঁহাকে না ডাকিলেও তাঁহার আশ্রিত সন্তানকে আপদে বিপদে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা ভিন্ন কেহই বাহাদুরী করিয়া সংসার-বন্ধন জয় করিতে পারিবে না, ইহা বেশ বুঝিয়াছি।

'শুধু হাতে ঠাকুর-দেবতা দর্শন করতে নেই'—ইহা মায়েরই বাক্য; সেইজন্য রোজই একটু কিছু লইয়া মায়ের কাছে যাইতাম। একদিন মা বলিলেন, "তোমার পয়সা-কড়ি নেই, তুমি রোজই এসব নিয়ে আস কেন, মা? একটা হরীতকী হাতে করে নিয়ে এসো—এতেই হবে। আমি তোমাদের মুখ দিয়ে যে খাই, মা! তোমরা খেলেই

আমার খাওয়া হয়। ঠাকুরের রাজ্যে এসে কতই খেয়েছি।”

আমার মেজদার গুরুতর অসুখ হইয়াছে; চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতা গিয়াছেন। ডাক্তার সর্বাধিকারী অপারেশন করিবেন। আমাদের পরিবারের সকলেই কলিকাতা আসিয়াছেন। শুনিলাম, এই অপারেশনে রোগী বাঁচিবে কি মরিবে ডাক্তারই বলিতে পারেন না। আমি মায়ের কাছে মেজদাকে লইয়া গেলাম। সেদিন রবিবার। বিকালে ছেলেরা প্রণাম করিতে আসেন, যাওয়ার পথে মেজদা একছড়া ফুলের মালা মায়ের পায়ে দিবার জন্য লইয়া গিয়াছেন। সে মালা আমি দেখি নাই। সেখানে যাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এত লোকের সঙ্গে মাকে প্রণাম করিবেন, আমি কাছেও থাকিতে পারিব না। মা কি তাঁহাকে লক্ষ্য করিবেন? যাহাই হউক, যখন প্রণামের সময় হইল আমরা এক ঘরে বন্ধ হইয়া গেলাম। প্রণাম শেষ হইয়া গেলে মা রাধুকে ও আমাদের ডাকিলেন। অনেকগুলি ফুল ও মালা সরাইয়া রজনীগন্ধার একটি মালা রাধুর হাতে দিয়া বলিলেন, “ইহা বৌমার ভাই আমাকে দিয়েছে।” বলিলেন, “আমি তোমার ভাইকে দেখেছি।” আমি অবাক হইয়া গেলাম। আর কোন দিন মেজদা এখানে আসেন নাই; ভাবিতে লাগিলাম,

রজনীগন্ধার মালাই তিনি আনিয়াছিলেন কি-না। অনেক মালার মধ্যে একটিমাত্র রজনীগন্ধার মালাই দেখিলাম। মাকে বলিলাম, "মা, এঁরই জন্যে সংসারে থাকতে ইচ্ছা নেই। এঁদের কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্য তোমার কাছে এত কেঁদেছিলাম। যদি তিনি মরে যান তা'হলে ওসব আমাকেই ভুগতে হবে। মা, সংসারীদের মধ্যে রয়েছি বলেই ত তোমার পদতলে থেকেও আর বাঁচতে পারি না। এখন কি হবে, কি করব বল?" মা বলিলেন, "তোমার ভাই এই অপারেশনে যদি নাও মরে, একদিন ত মরবে? আর বেঁচে থাকলেই বা তোমার কি উপকার হবে? সেজন্য এত ভাববে কেন?" ভাবিলাম, বুঝি এবার মেজদা রক্ষা পাইবেনই না। তখনই মা বলিলেন, "ভয় নেই, ঠাকুর আছেন। যে ঘরে অপারেশন হবে সে ঘরে ঠাকুরের একখানা ফটো রেখে দিও, তিনি রক্ষা করবেন।" ইহা শুনিয়াই বাসায় আসিয়া সকলের নিকট বলিলাম। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "আর ভয় নেই, জীবন্ত কালী ছুঁয়ে এসেছে, ভয়ের কোনই কারণ নেই।" সেই অপারেশন একটা বিরাট ব্যাপার—যথাসময়ে হইয়া গেল। ঠাকুরের ফটোও রাখা হইল, মায়ের কৃপায় মেজদা সুস্থ হইয়া দেশে আসিলেন। আমার কাকা, বড়দা ইঁহারা কালী-দর্শনের কথা বলায় এইরূপ মতপ্রকাশ করেন—যে কালী

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে পূজা করিয়াছিলেন সেই কালী, তাঁর পা আমরা দর্শন করেছি, স্পর্শ করেছি ; আর কোথাও যেতে হবে না। আমিই মায়ের কাছে প্রথম গিয়াছিলাম। এখন মায়ের কৃপায় এই পরিবারের প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে শরণ নিয়াছে।

একদিন বিকালবেলা আমি মায়ের ওখানে আছি, এমন সময় একটি বিধবা মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন—গলায় তুলসীমালা, গায়ে নামাবলী। ওঁর আসিবার পূর্বেই মাতাঠাকুরাণী গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। মহিলাটি আসিয়া মাকে প্রণাম করিতে গেলেন। মা বলিলেন, "পায়ে হাত দিও না, মাটিতে প্রণাম কর।" কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না, পা ছুঁইয়াই প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের ফটো প্রভৃতি দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া আমাকে বলিলেন, "দেখেছ, কেমন সুন্দর!" মা বলিলেন, "ওকে কি দেখাবে? তুমি যাকে দেখাচ্ছ সে তাঁর পূজোই করে।" আমাকে দেখাইয়া বিধবাটি বলিলেন, "এটি কি আপনার মেয়ে?" মা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বাছা।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কয়টি ছেলেমেয়ে?" মা বলিলেন, "ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান।" মহিলাটি বলিলেন, "আপনার গর্ভজাত সন্তান ক'জন?" মা উত্তর দিলেন, "উনি ত্যাগী ছিলেন।" এই কথা বুঝিতে না

পারিয়া মহিলাটি মাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। আমি নিজেও আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না। মা আমাকে বলিলেন, "তুমি ওকে বুঝাও, আমি আর পারি না।" আমি তখন তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম, "তুমি দেখছি মায়ের সম্বন্ধে কিছুই জান না। তবে কি ভেবে মাকে দেখতে এসেছ? মাকে যারা দর্শন করতে আসে, তারা শুধু দর্শন ও প্রণাম-মাত্রই করে না। মায়ের সম্বন্ধে জানবার অনেক আছে। কত বই-এ মায়ের কথা রয়েছে; কত ভক্ত রয়েছেন, এঁদের কাছেই সব জানা যায়। মায়ের সম্বন্ধে যদি তুমি বিন্দুমাত্রও জানতে, তাহলে মাকে এত প্রশ্ন করার সাহস তোমার হত না। যা বলতে হয় আমাকে বল, মার সঙ্গে কথা বলো না।" তবু সে মহিলাটি বলিলেন, "আমার মেয়ে এখানে আসে। খুব বড় মূলো নিয়ে সেদিন এসেছিল।" মা উত্তর দিলেন, "কত লোক কত কিছু দেয়, সে সবের কি আমি খবর রাখি? তোমার মেয়েকে আমি জানি না।" ইহার পর বিধবাটি চলিয়া গেলেন। মা আমাকে বলিলেন, "বৌমা, একটু জল এনে আমার পা ধুইয়ে দাও এবং একটু বাতাস কর।" আমি তাহাই করিলাম।

আমার একটি খুড়তুতো ভাইয়ের নেত্রনালী হইয়াছে। ইহা অপারেশন করার জন্য আমাদের পরিবারের অনেকের

সহিত তাহার মা ও বাবা তাহাকে লইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। অপারেশনের পূর্বে তাহাকে লইয়া মায়ের কাছে যাই। পূর্বেই এই অপারেশনের কথা মাকে বলিয়াছিলাম। মায়ের কাছে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়াই বলিলাম (ছেলেটিকে দেখাইয়া), "মা, এরই চোখের অপারেশন করা হবে।" মা বলিলেন, "দেখি কেমন চোখ।" দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, এখন হরেক রকম রোগও হয়েছে যেমন,.ডাক্তার বা চিকিৎসকও হয়েছে তেমন! আগে এত রোগও হত না, এত চিকিৎসাও লোকে জান্‌ত না। এই রাধুরই কত রকম রোগ, আর কত বা চিকিৎসা! আর কত দেবতারই বা মানত করলাম, কিন্তু সে আর কিছুতেই ভাল থাকে না। ঠাকুরের যে কি ইচ্ছা তিনিই জানেন।" মায়ের কথা শুনিয়া আমি একটু হাসিলাম; ভাবিলাম, তুমি কিছুই জান না! কথায় মনে হয় রাধুই যেন তাঁহার সর্বস্ব। মা নিজেকে অত্যন্ত চাপা রাখিতেন, তাঁহার চালচলন দেখিয়া কাহারও শক্তি নাই যে তাঁহাকে চিনিতে পারে। তিনি নিজে যাহাকে ধরা দিয়াছেন, একমাত্র তিনিই মাকে চিনিয়াছেন। মা ছেলেটির চোখ দেখিয়া কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। চোখ-অপারেশন ভালভাবেই হইল। পরে দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে আমার খুড়ীমা তাঁহার ছেলেমেয়েদের

লইয়া একদিন সকালবেলা মাকে দর্শন করিতে গেলেন। তখন মা পা মেলিয়া বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য ফল কাটিতেছেন। তাঁহারা যাইয়াই মাকে প্রণাম করিলেন। মা খুড়ীমাকে বলিলেন, "এই সব ছেলেমেয়েই কি তোমার?" তিনি বলিলেন, "হাঁ মা, আমারই সব।" মা বলিলেন, "বেশ বেশ। দেখেছ এদের ভক্তি কত! সবগুলি ছেলেমেয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছে। বৌমা এখানকার সব জানে, তবুও সকালবেলা তোমাদের নিয়ে এসেছে; এখন ঠাকুর-পূজোর সময়, তোমার সঙ্গে একটু কথাও বলতে পারব না।" খুড়ীমা বলিলেন, "সে এখন আসতে বাধা দিয়েছিল। আমাদের আর সময় নেই, সেজন্যই এখন এসেছি। মা, আমরা দেশে যাওয়ার সময় ক্ষীরোদকে কিছুদিনের জন্য দেশে নিয়ে যেতে চাই। এতে আপনার কি মত জানতে ইচ্ছা।" মা বলিলেন, "দেশে নিয়ে যাবে, এতে দোষ কি আছে? তবে রাস্তাখরচটি দিয়ে আবার পাঠিয়ে দিলেই হয়।" তা হবে, বলিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহারা গাড়ীতে উঠিলেন।

আমার পরিচিতা একটি মেয়ে শ্রীশ্রীমাকে কখনও দেখে নাই, তাহার স্বামী ওসব খুব পছন্দও করেন না। মেয়েটি আমাকে একদিন জোর করিয়া ধরিল, তাহার স্বামী আফিসে চলিয়া গিয়াছেন, বাসায় ফিরিবার পূর্বে যেন

তাহাকে লইয়া মাকে দর্শন করাইয়া আসি। বলিলাম, "এসময় মা বিশ্রাম করেন, এখন গেলে দেখা পাবে না।" সে বলিল, "চল না, পরে যা হয় হবে।" তাহাকে লইয়া মায়ের বাড়ীতে ঢুকিয়াই দেখি গোলাপ-মা প্রসাদ খাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাছেই গেলাম। ভাবিলাম, মা যখন জাগিবেন তখন দর্শন হইবে। গোলাপ-মা আমাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "তোর যত সব কাণ্ড! এখন একে নিয়ে কেন এলি? জানিস না, এখন মায়ের বিশ্রামের সময়?" বলিলাম, "কেন বক্ছেন? মা-ঠাক্রুণ না জাগলে আমি তাঁর কাছে যাব, আমি কি এতই পাগল?" একটু পরেই শুনিলাম মা আমাকে ডাকিতেছেন, "বৌমা, এদিকে এস।" মায়ের কাছে গিয়া দেখি, মা তক্তাপোষের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বলিলেন, "ঐ মেয়েটি কে, মা? এখন এসেছে বলে গোলাপ বুঝি তোমাদের মন্দ বলেছে? এ যে ঠাকুরের রাজ্য। এখানে কোন আইন-কানুন নেই। এখানে সকলেরই অবারিত দ্বার। যখন যার সময় ও সুযোগ হবে, তখনই আসবে। তুমি কিছু মনে করো না, মা।" আমরা মাকে প্রণাম করিয়াই চলিয়া আসিলাম। গোলাপ-মাকে বলিলাম, "দেখলেন? মানুষ কতখানি আর্ত্তি নিয়ে মাকে দর্শন করতে আসে! শুধু মা কেন, আপনাদেরও দর্শন করতে চায়। কিন্তু আপনারা মায়ের

দ্বারী কিনা, মানুষকে ঠেলে বিদায় করতে চান। মা যে আমার এক-দু জনের মা নন, তিনি সকলের মা।” গোলাপ-মা হাসিয়া বলিলেন, “যা যা, তোরই জিত হয়েছে।” গোলাপ-মা, যোগীন-মা, গৌরীমা, লক্ষ্মী দিদি প্রভৃতি আমাদের যেরূপ স্নেহ করিতেন তাহা অতুলনীয়।

কলিকাতার লেডি ডাক্তার শ্রীমতী প্রমদা দত্তের বাড়ী আমাদের দেশে। তিনি আমাদেরই আত্মীয়া। তাঁহার স্বামীও ছিলেন ডাক্তার। তাঁহারা ব্রাহ্ম। শ্রীমতী প্রমদা দত্ত একদিন মাকে দর্শন করিতে চাহিলেন, আমাকে লইয়া যাওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে ধরিলেন। একদিন প্রস্তুত হইলাম। তিনি ডাক্তারী পোষাক না পরিয়া একখানা লালপেড়ে কাপড় পরিলেন। পায়ে জুতাও দিলেন না। মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা লইয়া রওনা হইলেন। মায়ের বাড়ীতে ঢুকিয়া উপরে উঠিয়া সিঁড়ির পাশের ঘরটিতেই মায়ের ধ্যানস্থ একখানা ফটো থাকিত। ইহা দেখিয়াই প্রমদা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কার ফটো ?” বলিলাম, “মায়েরই।” অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, “ইনিই স্বয়ং রাধা।” আমার হাসি পাইল, ব্রাহ্ম হইয়া এসব কি বলেন! উপরে যাইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। কতক্ষণ পরে সরলাদিকে মা বলিলেন, “ঐ খোকাকে এনে এঁকে দেখাও ত।” খোকাটি যে কাহার, সেকথা আমার মনে

নাই। মা এই কথা বলিতে প্রমদা দেবী আমাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কি করে জানলেন যে, আমি ডাক্তার?" পরে ছেলেটিকে দেখানো হইল। বিকাল চারটায় ঠাকুরকে মিষ্টিভোগ দেওয়া হইয়াছে। মা সকলকে প্রসাদ খাইতে দিলেন, কিন্তু প্রমদা দেবীকে দিলেন না। আমার যেন একটু লজ্জাই করিতে লাগিল। এদিকে শ্রীমতী প্রমদা কেবলই আমাকে বলিতেছেন, "সকলকে প্রসাদ দিলেন, আমাকে কেন দিলেন না?" আমি বলিলাম, "তুমি মাকে বল না?" আমার হাতে প্রসাদ যাহা আছে, তাহাও তাঁহাকে দিতে আমার সাহস হয় নাই। পরে প্রমদা দেবী মাকে বলিলেন, "মা, সকলকে প্রসাদ দিলেন, আমাকে দিলেন না কেন?" মা বলিলেন, "তুমি যে, বাছা, ব্রাহ্ম; তুমি ইচ্ছা করে না নিলে কি করে দিই?" তিনি বলিলেন, "আমাকে একটু প্রসাদ দিন।" মাও ঠিক একটি রসগোল্লা রাখিয়া দিয়াছিলেন। উহা তাঁহার হাতে দিলেন। প্রমদা দেবী প্রসাদ আঁচলে বাঁধিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলেন। তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "দেখ, আজ আমি যেখানে গিয়াছিলাম তা স্বর্গ; যাঁকে দর্শন ও স্পর্শ করে এসেছি তিনি স্বয়ং রাধা। তোমার জন্য একটু প্রসাদ এনেছি, তুমি যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে নাও তবে দেব।" তিনি বলিলেন, "আমার মত নগণ্য

একজন মায়ের প্রসাদ না খেলে বিশ্বজননীর কি এসে যায় ?” এই বলিয়া প্রসাদ হাতে করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া খাইলেন। প্রমদা দেবীও সব বর্ণনা করিয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন, “আজ বৃন্দাবনে গিয়ে রাধারাণীর পাদ-পদ্ম দর্শন করে এসেছি, ধন্য হয়ে এসেছি।”

খুড়ীমা প্রভৃতির দেশে আসাকালীন আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাই নাই। দেশে আসিয়া আমার কাকা আমাকে একখানা পত্র দিলেন। লিখিলেন, “মা, তুমি আস নাই বলিয়া বড়ই দুঃখ হইতেছে। তুমি জগন্মাতার পাদপদ্মে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়াছ, ইহা ভাবিলে আনন্দের অবধি থাকে না। যদি কোন দিন দেশে আস, তবে যত দোষের গোড়া মনটাকে মায়ের পায়ে বলি দিয়া আসিও। তবেই আর কোন ভাবনা থাকিবে না।” আমি মাকে সেই পত্র-খানা পাঠ করিয়া শুনাইলাম। মা শুনিয়া বলিলেন, “মন কি শুধু দোষেরই গোড়া ? ব্রহ্মপদলাভ করার জন্য ছুটেছ, এখন মনকেও সঙ্গে নিতে হবে। সেখানে পৌঁছুলে তখন এরা কেউ থাকবে না। এখন মনের সহায়তারই বেশী দরকার। শুদ্ধ মনই তো মানুষকে পথ দেখিয়ে নেয়।” আমি সে কথা আমার কাকাকে লিখিলাম। শ্রীশ্রীমা আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, “দুষ্ট মনকে যদি মোড় ফিরিয়ে দাও, তবে সে-ই ইষ্টকে ধরতে পারে। তা

তোমাদের ভাবনার কোনই কারণ নেই। ঠাকুর তোমাদের হাতে ধরেই আছেন। যে-কোন অবস্থায় তিনি সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছেন।” মায়ের ওসব কথায় যে কত শক্তি রহিয়াছে, ইহা জীবনে অনেক অনুভব করিয়াছি।

একদিন বিকালবেলায় কয়েক জন স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। একজন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, অনেকেই বলে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাকি অবতার নন। এ কি সত্য?” মা বলিলেন, “তা তারা বলতে পারে, কারণ দেহধারী একজন মানুষকে অবতার বলে ধরে নেওয়া সহজ নহে। এক কথায়, সকলেই যদি অবতার বলে ধরে নিতে পারতো তবে আর তাঁকে মার খেয়ে প্রেম বিলাতে হত না।” বলিতে বলিতে মায়ের চোখ দিয়া শতধারে জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন, “অবতার-পুরুষকে সকলে কি ধরতে পারে? দু-এক জনে চিনতে পারে মাত্র। তাঁরা জীব-উদ্ধারের জন্য কত যাতনাই না সহ্য করেন! ঠাকুরের গলা দিয়া রক্ত বের হত, তবুও কথার বিরাম নেই, কিসে জীবের মঙ্গল হয়।” তাহার পর মা ‘মাগুরমাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল’—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই কথাটি কি ভাবে বলা হইয়াছিল, কি ভাবে লোকে বুঝিয়াছিল, ইহার প্রকৃত অর্থ

কি, সব বলিয়া সর্ব্বশেষে বলিলেন, "অবতার দিয়ে তোমাদের কাজ কি? যার যার গুরুই তার কাছে অবতারের চেয়ে অনেক বড় জিনিস—এই মনে করে বসে থাক।"

বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার নিকট যে মেয়েরা থাকিত, তাহাদের চালচলন মা খুব লক্ষ্য করিতেন। একটি ঘটি বা বাটি জোরে ফেলিলেও মা খুবই বিরক্তি-প্রকাশ করিতেন, বিনা কারণে কাহারও সঙ্গে কথা বলিবারও আদেশ ছিল না। একদিন রাধারাণী উপর হইতে খুব জোরে নামিতেছে, তাহার পায়ে মল ছিল, উহার শব্দ শুনিয়া মা এমনিভাবে উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, দেখিয়া ভয় হইতে লাগিল। রাধু আসিতেই মা বলিতে লাগিলেন, "রাধি, তোর লজ্জা নেই? নীচে সব সন্ন্যাসী ছেলেরা রয়েছে, আর তুই মল পায়ে পরে উপর থেকে দৌড়ে নাব্‌ছিস, ছেলেরা কি ভাব্‌বে বল্‌তো? তুই পায়ের মল এখুনি খুলে ফেল্। এখানে ছেলে মেয়ে যারাই আছে, তারা তামাসা করার জন্যে আসে নি, সকলেই ভজন-সাধন করছে। এদের ভজনের ব্যাঘাত ঘটলে কি হবে জানিস্?" এই সব বলিতেই রাধু পায়ের মলগুলি খুলিয়া মায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার ভয় নাই, কিন্তু আমরা সকলে ভয়ে অস্থির হইলাম। আর একদিন রাধু

স্নানের পর চিরুনি দ্বারা মাথা আঁচড়াইয়া একখানা গামছার চাপ দিয়া চুলের পাতা নামাইতেছে। ইহা দেখিয়া মা বলিতেছেন, "ওসব কি করছিস্? ওসব করলে তোরা ভাবিস্ খুবই সুন্দর দেখা যায়; তা নয়, আমার কাছে ও বিশ্রীই লাগে। আমি তো জীবনে চুলই বাঁধি নি। গৌরদাসী এসে আমাকে কখনো কখনো চুল বেঁধে দিত, তাও আমি বেশী সময় রাখতে পারতুম না, খুলে ফেলতুম। এখন তোদেরই দেখ্ছি অন্য রকম।" গোলাপ-মা কাছে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যে মা মুক্তকেশী, তাই চুল খোলা রাখবে না তো কি করবে?"

একদিন এক মুন্সেফের স্ত্রী মায়ের ওখানে আছেন। তখন মহাযুদ্ধের আলোচনা হইতেছে। ঐ মেয়েটি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সকলেই বলে এই যুদ্ধ নাকি এখানে পর্যন্ত এসে পৌঁছুবে। তা হ'লে আমাদের দশা কি হবে, মা?" মা বলিলেন, "ওসব কিছু না, এখানে কি করতে আস্বে? সেখানেই যেমনটি হওয়া দরকার তেমনটি হয় নি, আবার এখানে আসবে কেন?" ইহার পর অনেকেই এ বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। মা যেন একটু স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

দেশে খুব দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোককে অনেক সাহায্য করা হইতেছে।

একদিন মা এমনভাবে দুর্ভিক্ষের কথা বলিতে লাগিলেন—কোথায় কত দুরবস্থা, মিশন হইতে কত টাকা ঐ কার্য্যের জন্য দেওয়া হইতেছে, ছেলেরা কত খাটিতেছে ইত্যাদি—যেন মনে হইল, জগতের সব দুঃখ তিনি আপন প্রাণে অনুভব করিতেছেন।

আমি মাঝে মাঝে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে লক্ষ্মীদিদির ওখানে যাইতাম। লক্ষীদিদি আমাকে গোপনে প্রায়ই বলিতেন, "মাকে বলিস্ আমি এখানে থাক্‌ব না। এই যে আমার ভাই-এর মেয়েরা আমার সেবা-যত্নের জন্যে রয়েছে, এরা কোন ভক্তের আসা পছন্দ করে না। যেখানে ভক্ত নেই সেখানে আমি থাকতে পারবো না। মাকে বলিস্ আমি বৃন্দাবনে চলে যাব, তোকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।" আমি সব কথা মাকে বলিলাম। মা বলিলেন, "দেখ বৌমা, ভক্ত দেখলেই লক্ষ্মী একেবারে পাগল হয়ে যায়। সেইজন্যই ঐ মেয়ে দুটি ভক্ত এলে বিরক্ত হয়; তাদের দোষ নেই, বাছা। লক্ষ্মীকে বলো, আমি একদিন যাব। আর তোমাকে তার সঙ্গে কোথাও যেতে হবে না। সে রাস্তায় যদি কোন ভক্ত দেখে, তবে সেখানেই সাত দিন থেকে যাবে। তাকে রক্ষা করার জন্য সর্ব্বদা সঙ্গে লোক থাক্‌তে হয়। সে বৃন্দাবনে থাকতে চায়; ওখানে যেরূপ বানরের উপদ্রব, ও কি থাক্‌তে পার্‌বে?"

আমি সকল কথা লক্ষ্মীদিদিকে বলিলাম। আরও বলিলাম, "তোমার যা অবস্থা তাতে অন্যত্র তোমাকে পাঠাতে হলে বিশেষ বন্দোবস্ত করে পাঠাতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের যা হ'ত তোমারও নাকি তাই হয়।" বলিতেই লক্ষ্মীদিদি আমাকে বকিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ঠাকুরের যা হ'ত তা কি মানুষের হয়? আমার কি এক ব্যাধি হয়েছে, আমি তাই কোথাও যেতে পারি না!" লক্ষ্মীদিদি নিতান্ত ছেলেমানুষের মত হইয়া গিয়াছিলেন।

একদিন কম্বল বিক্রি করিবার জন্য একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছে। নলিনদিদি কম্বল রাখিবার জন্য দর করিতেছে। কম্বলওয়ালী দাম ১।০ আনা চাহিতেছে। নলিনদি ১৲ টাকা বলিতেছে। মা দূর হইতে শুনিয়া নলিনদিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এর সঙ্গে কি নিয়ে দামকসাকসি করছ?" সে বলিল, "আমি কম্বলের দাম এত বলি, সে এত বলে।" অমনি মা একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি চার আনা পয়সার জন্য তার সঙ্গে এতক্ষণ যাবৎ খ্যাঁচ্ম্যাচ্ করছ? ছিঃ, সে দু'পয়সা পাওয়ার জন্যই মাথায় করে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। আর তুমি কিনা সামান্য পয়সার জন্য এতখানি সময় ওকে আটকে রেখেছ। বিশেষ, তোমার কম্বলের দরকারই বা

কি ? সবই তো তোমার আছে, তবু কিনতে গিয়েছ। (আমাকে দেখাইয়া) বরং বৌমাকে একখানা দিলে ভাল হ'ত। ও কম্বল ছাড়া অন্য জিনিস ব্যবহার করে না, তাও একখানা মাত্র কম্বল। এত শীতে সে এই নিয়ে থাকে, তবু করুর কাছে চায় না। দুখানা কাপড়ের বেশী বোধ হয় জীবনে তিনখানা কাপড় পরে নি। তবু এতেই বেশ আনন্দে আছে। লোকের ভাল জিনিসটি তোদের চোখে পড়ে না।" আমি শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম, কম্বলের কথা বা কাপড়ের কথা একদিনও তো মাকে বলি নাই, মা এতটা খবর রাখেন! আমাদের মা যে সত্যিকার মা, ইহা কতবারই না তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন! স্থূল-দেহের অন্তরালে গিয়া মা আমার এখন আরও বেশী করুণা বিতরণ করিতেছেন। মাকে এখন যাহারা ডাকে, অন্তর্যামিনী তাহাদের কাছে উপস্থিত হইয়া সকল গোল মিটাইয়া দেন। আগে মার কাছে যাইতে হইলে কত যোগাযোগের দরকার হইত—এখন মনপ্রাণ ঢালিয়া ডাকিলে এক জায়গায় বসিয়াই পাওয়া যায়। মায়ের সন্তান যাঁহারা, তাঁহারা বিপদে পড়িলে তাঁহাকে না ডাকিলেও তিনি যেন নিজের দরকারেই আসিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন—এইরূপও কত ঘটনা শুনিতে পাইয়াছি।

একবার দেশ হইতে ঠিক সপ্তমীপূজার দিনে কলিকাতায়

আসিয়াছিলাম। আমার শরীর তখন নিতান্ত খারাপ, জ্বর হইতেছিল; সেই জ্বর লইয়াই মাকে পূজা করিব, সেই ভরসায় মনোমত কয়েকটি ফুলসহ মায়ের কাছে গিয়াছি। কিছুদিন আগে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের দেহ গিয়াছে। সেবার মঠে দুর্গাপূজা হইবে না। ৺কাশীর মঠে পূজা হইবে। আমি মায়ের কাছে যাইয়া মাকে পূজা করিলাম। মা আমাকে দেখিয়াই অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা, বাছা আমার কেমন হয়ে গেছে!" প্রেমানন্দ মহারাজের জন্যও দুঃখ করিলেন। বলিলেন, "আজ রাত্রেই তুমি কাশীতে রওনা হও। এখানের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী কয়েক জনও কাশী যাবে। তোমার শরীর নিতান্ত খারাপ হয়ে গেছে; কাশীতে মাস খানেক থাকিও।" বলিলাম, "সেখানে যেয়ে কি হবে? আমার এখানে থাকতে ভাল লাগে।" মা বলিলেন, "বল কি? সেটা হ'ল ৺বিশ্বনাথের ধাম।" বলিলাম, "এটাও অন্নপূর্ণার ধাম।" মা হাসিয়া বলিলেন, "তা হলেও কিছুদিন সেখানে থাকলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।" আমি কিছু তেঁতুলের আচার দেশ হইতে নিয়া গিয়াছিলাম। অনেক লোক দেখিয়া ভাবিলাম এত ভিড়ে আচারই বা কোথায় যাইবে, মায়ের সেবায় লাগিবে কি-না। অন্তর্যামিনী মা আমার গোলাপ-মাকে ডাকিয়া বলিলেন,

"এই আচারটুকু যত্ন করে রাখ, পরে খাওয়া যাবে ; বৌমাকে কিছু ফল রাস্তায় খাওয়ার জন্যে দিয়ে দাও।" উহা দেওয়া হইল। আমরা রওনা হইলাম। তখন কাশীতে ভীষণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। সেখানকার মহারাজগণ আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এখন যেরূপ ব্যাধির আক্রমণ কাশীতে দেখা দিয়েছে, এতে আপনি সুস্থ হবেন এতো দূরের কথা, না জানি এই রোগেই আবার কাতর হয়ে পড়েন।" মায়ের আদেশে আসিয়াছি, যাহা হইবার হইবে, ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সেবার নলিন দিদি প্রভৃতিও গিয়াছিলেন। তাঁহারা পূজার পরই অন্যত্র চলিয়া গেলেন, আমি কাশীতেই রহিলাম। আমি রাণামহলে থাকিতাম। কিছুদিন পরে আমার সেই ব্যাধি হইল। তখন মহারাজগণ ডাক্তার ও ঔষধ পাঠাইয়া আমাকে খুবই সাহায্য করিতে লাগিলেন। একদিন স্বপ্নে দেখি, মা আসিয়া বলিতেছেন, "কোন ভয় নেই, আমি আছি। আমি তোর যত্ন নেব।" পরদিন হইতেই ভালর দিকে চলিলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। একমাস পূর্ণ হইতেই পুনরায় কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। মা আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বাঁচা গেল বাবা। যা অসুখ তোমার হয়েছিল, ভালর জন্য পাঠিয়ে মন্দ হতে চলেছিল।"

—শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায়, সিলেট